ইসলাহী মাজালিস

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শাইখুল ইসলাম

মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনমূলক বয়ান সংকলন

ইসলাহী মাজালিস

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদীআরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদকমণ্ডলী
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দাওরা ও ইফ্‌তা : জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস : জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব : রাজারদেউরী জামে মসজিদ, ঢাকা

মাওলানা মুহাম্মাদ হেদায়েতুল্লাহ্
খতীব : পাটুয়াটুলী লেন জামে মসজিদ, ঢাকা

মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান
খতীব : লেকসার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা
মুদাররিস : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

মুমতায লাইব্রেরী
মাকতাবাতুল আশরাফ-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলাহী মাজালিস

মূল ঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদকমণ্ডলী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাওলানা মুহাম্মাদ হেদায়েতুল্লাহ্

মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মুমতায লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী

২য় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0012-4

মূল্য ঃ তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইনতেসাব

আমার দু'জন মুরুব্বী। দু'জন মানুষ গড়ার কারিগর।
শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম
[সভাপতি, বেফাকুল মাদারিস পাকিস্তান ও মুহাতামিম, জামিয়া ফারুকিয়া করাচী]
আড়ম্বরহীন সাদা এ মানুষটি, ইলম, আমল ও মারেফাতের নূরে আলোকিত যার হৃদয়, যার সোহবত দ্বীনের জন্য সবকিছু কুরবান করতে বিশেষত ইলমে দ্বীনের খেদমতে সর্বস্ব ত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সটান মিনারের মতো অটল-অবিচল থেকে দ্বীনী দায়িত্ব পালনে এবং দৃঢ়পদে মনযিল পানে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম
[খলীফাঃ হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. ও হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব রহ.]
ইখলাস, বিনয়, যুহদ ও তাকওয়ার আলোকে উদ্ভাসিত এ মানুষটি, যার প্রতিটি উচ্চারণ ও আচরণ থেকে দরদ ও মহব্বত বিচ্ছুরিত হয়, যার সোহবত হৃদয়ে আখেরাতের আকর্ষণ বাড়ায় ও দুনিয়ার সর্বস্ব ত্যাগে উৎসাহিত করে। যাকে কাছ থেকে দেখে, মুখ থেকে অনিচ্ছায়ও বেরিয়ে যায়, আয় আল্লাহ! মানুষ এত ভালো হয় কি করে?

ইয়া আল্লাহ! আমার এ দু'জন মুরুব্বীকে তুমি হায়াতে তাইয়্যেবা দান করো। তাদের রূহানী, জিসমানী শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দাও। আমাদেরকে তাদের ফয়েয ও বরকত নসীব করো।
আমীন - ইয়া রাব্বাল আলামীন।

- অনুবাদক ও প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

তালিবুল ইলমীর এবতেদায়ী কয়েক বছর নূরিয়া মাদরাসায় পড়ার সুবাদে এদেশের সর্বজন স্বীকৃত বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর সোহবতে থাকার এবং তাঁকে কাছ থেকে দেখার ও তাঁর কথা শোনার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে। সে সময়েই সর্ব প্রথম সম্ভবত হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর মুখ থেকে, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর নাম শুনি। বার বার হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর মুখে হযরত থানভী রহ.-এর নামের ভক্তিপূর্ণ উল্লেখ, আমার বাল্য হৃদয়ে তাঁর জন্য অতি শ্রদ্ধার আসন তৈরী করে। না বুঝেই তাঁকে সর্বাধিক মহব্বত ও ভক্তি করতে আরম্ভ করি।

পরবর্তীতে কিতাবখানায় পড়াকালীন যখন করাচীর জামিয়া ফারুকিয়ায় ভর্তি হয়ে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের নিকট 'মেশকাত শরীফ' ও 'বুখারী শরীফ' পড়ার সৌভাগ্য হলো, তখনতো প্রায় প্রতিদিনের সবকে ও প্রতি সপ্তাহের (সোমবার ও শুক্রবারের) ইসলাহী মাজালিসে - হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর অসাধারণ প্রজ্ঞা, ইলমী, রূহানী খেদমত ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড, তাঁর সহস্রাধিক রচনা ও মাওয়ায়েয যার প্রতিটি ছত্রেই মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন কুসংস্কার, শিরক, বিদআত, দুর্বলতা ও ভ্রান্তির প্রতিকার বর্ণিত হওয়ার কথা - এতবার শুনেছি যে, বাল্যের সেই অবুঝ মহব্বত ও শ্রদ্ধার সাথে বুঝ ও বিবেক যুক্ত হয়ে তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। সে সময় থেকে হযরত থানভী রহ.-এর মাওয়ায়েয, মালফূযাত ও রচনাবলীর প্রতি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি, যেখানে যা পাই সংগ্রহ করতে থাকি এবং সামর্থানুপাতে তা থেকে উপকৃত হতে

থাকি। পরবর্তিতে যখন হযরত থানভী রহ.-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ-এর খেদমতে সামান্য কয়েক দিন থাকার এবং তারপর হযরত থানভী রহ.-এর সর্বশেষ খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ.-এর হাতে বাই'আত হওয়ার সৌভাগ্য হলো, তখন মনে হলো, হযরত থানভী রহ.-এর রেখে যাওয়া এ সকল ইলমী মিরাছ এদেশের সর্ব সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলে, এদেশের মানুষ দ্বীনী দিক দিয়ে খুবই উপকৃত হবে এবং সমাজে ছড়িয়ে থাকা অনেক ভ্রান্তির নিরসন হবে, ইনশাআল্লাহ। এ চিন্তা থেকেই 'মাকতাবাতুল আশরাফ' শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশনী হতে হযরত থানভী রহ.-এর যে সকল কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর বাইরে যে কিতাবটি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভূত হচ্ছিল, সেটি হলো হযরত থানভী রহ.-এর তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কিত নির্বাচিত বাণী সংকলন 'আনফাসে ঈসা'। কিন্তু কিতাবটি বার বার পড়ার চেষ্টা করেও অনেক কষ্টে অনেক সময় ব্যয় করে কয়েক পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারিনি। কিতাবের প্রশংসা শুনে আবার শুরু করেছি। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে অগ্রসর হতে পারিনি। এভাবেই চলছিলো। একবার ধরি, আবার ছাড়ি।

ইতোমধ্যে স্নেহের ছোট ভাই, মাওলানা মুসলেহুদ্দীন (রুমী) তার কাংক্ষিত কোর্স 'তাখাসসুস ফিল ফিকহ' ও 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়া ওয়ালএরশাদ' সমাপ্ত করে করাচী থেকে বিশাল কুতুবখানা নিয়ে দেশে ফিরে আসলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, শিপিং কোম্পানি অথবা ডাক বিভাগের অবহেলায় তার প্রায় সকল কিতাবই ভিজে নষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু সেসকল কিতাবের মধ্যে একটি কিতাবের মাঝখানের একটি খণ্ড (সম্ভবত ৫ম খণ্ড) অক্ষত পাওয়া গেলো, যার নাম 'ইসলাহী মাজালিস'। কিতাবটির ভূমিকা পড়ে জানতে পারলাম এটি শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম প্রতি রমযানে হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.-এর মালফুযাত সংকলন 'আনফাসে ঈসা'কে কেন্দ্র করে যে আলোচনা

করে থাকেন, এটি তারই মুদ্রিত রূপ। কিতাবটি অপূর্ব। পরবর্তিতে বন্ধুবর শামছুল আরেফীন এ কিতাবের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মূল উর্দু কিতাব সংগ্রহ করে অনুবাদ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আমি কিতাব সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হই। ইতোমধ্যে বন্ধুবর মাওলানা জালালুদ্দীন ছাহেব জানালেন, 'আমি মাওলানা মুসলেহুদ্দীন রুমীর নিকট হতে 'ইসলাহী মাজালিস'-এর পঞ্চম খণ্ডটি পড়ার জন্য নিয়েছিলাম। পড়তে গিয়ে কিতাবটি অপূর্ব মনে হওয়ায় মাঝখান থেকেই তার অনুবাদ শুরু করেছি। এদিকে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে দারুল উলূম করাচীর ফাযেল স্নেহের ছোট ভাই মাওলানা সালমান জানালো, 'আমি ব্যবসার কাজে পাকিস্তান যাচ্ছি, সম্ভবত এক-দু'দিন করাচীও থাকবো'। আমি বললাম, আমার প্রয়োজনীয় কয়েকটি কিতাব না আনলে তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। সে ওয়াদা করলো, কিতাব এনে দিবে। আলহামদুলিল্লাহ। তার মাধ্যমে অন্যান্য কিতাবের সাথে 'ইসলাহী মাজালিস'-এর পূর্ণ সেট হস্তগত হলো।

এদিকে গত ২০০৮ ঈসায়ীর ডিসেম্বরে যখন জানতে পারলাম শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ীতে 'বাংলাদেশ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা'-এর দাস্তারবন্দি মাহফিলে আসবেন, তখন মনে হলো এই অল্প সময়ে যদি হযরতের কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশ করতে পারতাম, তাহলে হযরতের দু'আ লাভের একটি সুযোগ হতো। এ চিন্তা করে কিতাবের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ নিজেই শুরু করলাম। অনুবাদ করতে গিয়ে যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে কিতাবের কিছু অংশ পড়লাম তখন আমি বিস্মিত হলাম যে, হযরত থানভী রহ.-এর যে কিতাব আমি বার বার পাঠ করে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি, সেই কঠিন কিতাবটির কি অপূর্ব সহজ-সরল ব্যাখ্যা হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে কেবলমাত্র ঐ কিতাবই নয় বরং তাসাওউফ ও তার জটিল বিষয়সমূহ একেবারেই সহজবোধ্য হয়ে

গেছে। সাথে সাথে তাসাওউফের নামে যে সকল ভ্রান্তি সমাজে ছড়িয়ে আছে তার অসারতাও সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস এ কিতাবটি তাসাওউফপন্থি ও তাসাওউফ বিরোধী সকলের জন্যই অবশ্য পাঠ্য। এতে সকলেই ধারণাতীত উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

আমরা কিতাবের ছয় খণ্ডকে দুই দুই খণ্ড একত্র করে তিন খণ্ডে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। অনুবাদের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য তরুন আলেমদের ছয়জনের একটি জামাতকে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁরা তাদের সামর্থানুপাতে অনুবাদকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহপাক তাদেরকে উপযুক্ত জাযা দান করুন। আমীন।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোন ত্রুটি বা অসংগতি কারো দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে আমরা পরবর্তিতে শুধরে নিবো, ইনশাআল্লাহ।

কিতাব সংগ্রহ, অনুবাদসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহপাক তাদের সবাইকে উত্তম বদলা দিন।

কিতাবটিকে আমাদের সকলের জন্য আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনের উসীলা বানান আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

তারিখ ঃ ৯ সফর ১৪৩০ হিজরী
৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ ঈসায়ী

সংক্ষিপ্ত সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

প্রথম মজলিস
তাসাওউফ ও সুলূকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় মজলিস
আত্মার মন্দ স্বভাবসমূহের সংশোধন

তৃতীয় মজলিস

রিয়াযত ও মুজাহাদা

চতুর্থ মজলিস

ইসলাহ ও সংশোধনের পদ্ধতি ও পন্থা

পঞ্চম মজলিস

বদনজর ও তার চিকিৎসা

ষষ্ঠ মজলিস

গীবত ও তার চিকিৎসা

সপ্তম মজলিস

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

অষ্টম মজলিস

অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া

নবম মজলিস

গীবতের গোনাহ্ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

দশম মজলিস

দোষ বর্ণনার জায়েয ক্ষেত্র

এগারতম মজলিস

অন্যের প্রতি কুধারণা এবং অন্যের দোষ অন্বেষণ

বারতম মজলিস

অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা ও অন্যের দোষ অন্বেষণের চিকিৎসা

তেরতম মজলিস

অহংকার ও তার প্রতিকার

চৌদ্দতম মজলিস

অহংকারের প্রকারসমূহ ও তার চিকিৎসা

পনেরতম মজলিস

অহংকারের আরেকটি চিকিৎসা

ষোলতম মজলিস

গোনাহগারকে তুচ্ছ মনে করবেন না

দ্বিতীয় খণ্ড

সতেরতম মজলিস

মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়

আঠারতম মজলিস

অন্যকে তুচ্ছ ও হীন মনে করা ও তার চিকিৎসা

উনিশতম মজলিস

বিশেষ ধরনের পোষাক ব্যবহার করা অহংকার

বিশতম মজলিস

ছোটদের উপর অত্যাচার করে ফেললে কিভাবে ক্ষমা চাবে?

একুশতম মজলিস

অহংকারের একটি চিকিৎসা— নফসকে অপদস্থ করা

বাইশতম মজলিস

রামযানের জন্য নেক আমলকে বিলম্বিত করা

তেইশতম মজলিস

মুজাহাদার হাকীকত

চব্বিশতম মজলিস

মুস্তাহাব মুজাহাদা এবং চার জিনিষে স্বল্পতা

পচিশতম মজলিস

ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক মুজাহাদার পার্থক্য

ছাব্বিশতম মজলিস

আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার পথ

সাতাশতম মজলিস

তাসাররুফের হাকীকত

আঠাশতম মজলিস

স্বভাবজাত মন্দ প্রবণতার সংশোধন

উনত্রিশতম মজলিস

শাইখের প্রয়োজনীয়তা এবং শাইখের দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ-এর হাকীকত

ত্রিশতম মজলিস

হিম্মত এবং ইখলাস

একত্রিশতম মজলিস

আমলের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করুন

বত্রিশতম মজলিস

নিস্‌বত হাসিল করার পদ্ধতি

ইসলাহী মাজালিস

প্রথম খণ্ড

প্রথম মজলিস

তাসাওউফ ও সুলূকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّابَعْدُ.

প্রথম কথা

বিগত কয়েক বছর যাবত রমযানুল মুবারকে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মালফুযাত শুনিয়ে আসছি। এর উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মধ্যে যেন আত্মশুদ্ধির চিন্তা জাগ্রত হয়। রমযানুল মুবারক বিশেষভাবে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের জন্য আল্লাহপাকের একটি নেয়ামত। মানুষ যদি এ মাসের কদর করে, এবং গুরুত্ব দিয়ে এ মাসে নিজের সংশোধনের ফিকির করে তাহলে দ্রুত মনজিলে মাকসুদের নিকটে পৌঁছে যেতে পারে। এজন্যই কয়েক বছর যাবত রমাযানুল মুবারকে হযরত থানভী রহ.-এর (আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনমূলক) বাণীসমূহ শোনাতে শুরু করেছি।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ.-এর পরিচিতি

এখন আমার সামনে যে কিতাবখানা আছে তার নাম হলো انفاس عیسی ('আনফাসে ঈসা') এটি হযরত থানভী রহ.-এর আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনমূলক বাণী সংকলন। এ কিতাব মূলত হযরতের তারবিয়্যাতী হেদায়াত এবং আত্মার চিকিৎসার পরিচ্ছন্ন ও পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্রসমূহের সারাংশ। এটি হযরতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. সংকলন করেছেন। হযরত থানভী রহ.-এর খলীফা অনেক। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী হযরত থেকে ফয়েয হাসিল করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই আমাদের জন্য (হেদায়াতের) সূর্য এবং চন্দ্র তুল্য। কিন্তু হযরতের প্রত্যেক খলীফারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এমন ছিলো, যা তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা সাহেব

রহ. হযরতের প্রথম দিকের খলীফাদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত থানভী রহ.-এর সঙ্গে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে তার কোন নজির ছিলো না। বাহ্যিক আকার-আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা, মোটকথা! সকল বিষয়েই হযরত থানভী রহ.-এর সাথে তার চমৎকার মিল ছিলো। এমন কি কণ্ঠস্বরেও এমন বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিলো যে, তিনি যখন কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন তখন বাহির থেকে যারা শোনতেন তাঁরা অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতেন যে, হযরত থানভী রহ. তেলাওয়াত করছেন? নাকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব তেলাওয়াত করছেন? বাহ্যিকভাবেই যখন এমন মিল, তাহলে আধ্যাত্মিকভাবে তিনি কত বেশী ফয়েয লাভ করেছেন? তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

যখন কোন ব্যক্তির তার শাইখের সঙ্গে এ পর্যায়ের গভীর মুহব্বত হয়ে যায় এবং পূর্ণরূপে মুনাসিবাত হয়, সাথে সাথে দীর্ঘ দিন তার সোহবত ও সান্নিধ্য লাভ হয়, গভীর মনোযোগ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সাথে ফয়েয হাসিল করে, তখন কোন কোন সময় বাহ্যিক আচার আচরণ ও অভ্যাসের ক্ষেত্রেও অপূর্ব সাদৃশ্য তৈরী হয়।

হযরত সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

كَانَ اَشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর সাদৃশ্য আচার-আচরণ, চলা-ফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে যেমন ছিলো, তেমনটি অন্য কারো ছিলো না। সুতরাং মানুষেরা তাঁকে দেখে এভাবেই নয়ন জুড়াতো যেমনটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে জুড়াতো।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপার তো একেবারেই স্বতন্ত্র। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা উম্মতের মধ্যেও পাওয়া যায়। এরই একটি নমুনা ছিলো হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. ও

তাঁর শায়খ হযরত থানভী রহ.। যে ব্যক্তির স্বীয় শায়খের সাথে বাহ্যিকভাবে এমন মিল হয় তার সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে, সে নিজ শায়খের রুচী ও অভ্যাস এবং ইলম ও ফয়েয নিজের মধ্যে টেনে ভরে নিয়েছেন এবং তা পরিপূর্ণ আত্মস্থও করেছেন।

'আনফাসে ঈসা'- নামক কিতাব প্রসঙ্গ

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. হযরত থানভী রহ.-এর খেদমত ও সোহবতে থাকাকালীন হযরত থেকে যে সকল অমূল্য বাণী শ্রবণ করেছেন এবং হযরত থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছেন, তার সারাংশ আমাদের জন্য **'আনফাসে ঈসা'** নামক এ কিতাবে সংকলন করে দিয়েছেন। এ কিতাব মূলত হযরত থানভী রহ.-এর অন্যান্য মালফুযাতের কিতাবের মতো নয়। অন্যান্য সাধারণ মালফুযাতের কিতাবে দেখা যায়, হযরত থানভী রহ. কোন একটি বিষয়ে একটি কথা বলেছেন, কিছুক্ষণ পর আবার ভিন্ন কোন বিষয়ে ভিন্ন কোন কথা বলেছেন। অতঃপর আবার তৃতীয় কোন বিষয়ে তৃতীয় কোন কথা বলেছেন। লোকেরা সে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বাণীকেই (একত্রে একই কিতাবে) সংকলন করেছেন।

কিন্তু এ কিতাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. এমনটি করেননি। বরং তিনি হযরত থানবী রহ. খেদমতে থাকাকালীন 'তাসাওউফ' ও 'তরীকত' সম্পর্কে যা কিছু শুনেছেন এবং এ বিষয়ে যা কিছু শিখেছেন, প্রথমে তা আত্মস্থ করেছেন, অতঃপর তার সংক্ষিপ্ত সার এমনভাবে গুছিয়ে লিখেছেন যে, এতে অধিকাংশ শব্দও হুবুহু হযরত থানভী রহ.-এর শব্দ। এভাবে তিনি হযরত থানভী রহ.-এর শিক্ষার সারাংশ আমাদের জন্য এ কিতাবে সংকলন করে দিয়েছেন। 'আনফাসে ঈসা' নামক এ কিতাব আমাদের জন্য অপূর্ব এক নেয়ামত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাসাওউফ ও সুলূকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'তাসাওউফ', 'তরীকত', 'সুলূক' ও 'ইহসান' একই অর্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন শিরোনাম।

যারা মনে করে তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পাকের যিকির এবং আমরা যখন কোন শায়খের (পীরের) নিকট বাইআত হবো, তখন তিনি আমাদেরকে কেবলমাত্র বিভিন্ন 'অজীফা' বাতলে দিবেন, তাদের এ ধারণা যেমন সঠিক নয়। তেমনি কারো কারো এই ধারণা যে, তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য হলো, তাবীজ-কবজ ও ঝাড়-ফুঁক এবং পীর সাহেব আমাদেরকে তাবীজ-কবজ, ঝাড়-ফুঁকের কিছু পদ্ধতি শিখিয়ে দিবেন তাদের এ ধারণাও ঠিক নয়।

একথা ভালোমতো বুঝে নেওয়া দরকার যে, উপরোক্ত বিষয়সমূহের সাথে তাসাওউফের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি যিকিরও তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং যিকির হলো, আসল উদ্দেশ্য অর্জনের একটি মাধ্যম মাত্র। এমনিভাবে কোন কোন লোক মনে করে তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য হলো, 'মুরাকাবা'। তারা মনে করে যে কোন একটি সময় নির্জনে বসে ধ্যান করবে এবং (পীর সাহেবের খানকায়) চিল্লা দিবে, সাধনা করবে। অথচ এগুলোও তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য নয় বরং এগুলো হলো আসল উদ্দেশ্য অর্জনের বিভিন্ন পথ ও পন্থা।

এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য কি? তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, (سورة الشمس) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (যে আত্মশুদ্ধি করলো, সেই সফল হলো।) অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধি, যাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

[তাদেরকে আপনার কিতাব তেলাওয়াত করে শোনায়, তাদেরকে কিতাব ও হেমকত শিক্ষা দেয়, এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করে।] (সূরা বাকারা-১২৯)

এ আয়াতে তেলাওয়াতে কিতাব এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়া, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করার পর 'তাযকিয়া' তথা আত্মশুদ্ধিকে ভিন্নভাবে তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

'তাযকিয়া'র শাব্দিক অর্থ হলো, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা। পরিভাষায় 'তাযকিয়া' বলা হয়, মানুষের জন্য যেমনিভাবে বাহ্যিক ও প্রকাশ্য আমল আছে এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ আছে; যেমন, নামায আদায় করো, রোযা রাখো, যাকাত দাও, হজ্জ আদায় করো, ইত্যাদি। এগুলোকে "اوامر" তথা করণীয় বিধান বলে। এবং মিথ্যা বলো না, গীবত করো না, মদপান করো না, চুরি করো না, ডাকাতী করো না, ইত্যাদি, এগুলোকে "نواهى" তথা বর্জনীয় বিষয় বলা হয়। এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ শরীয়ত দিয়েছে।

ঠিক তেমনি মানুষের অভ্যন্তর তথা কলব ও আত্মার কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা অত্যাবশ্যক করে দেয়া হয়েছে যেগুলো اوامر। তথা করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এসকল গুণাবলী অর্জন করা ওয়াজিব। অর্জন না করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া যাবে না। আর কিছু বিষয় এমন আছে যা বর্জন করা ওয়াজিব। সেগুলো نواهى তথা নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি অপ্রিয় কিছু ঘটে, তাহলে সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। তেমনি আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুল করা ওয়াজিব। তাওয়াযু তথা বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে করা ওয়াজিব। ইখলাস, (তথা যে কোন কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য করাকে ইখলাস বলে।) এ ইখলাস অর্জন করা ওয়াজিব। ইখলাস ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহ পাকের

নিকট কবুল হয় না। সুতরাং এ সকল গুণাবলী অর্থাৎ, শোকর, সবর, তাওয়াক্কুল, তাওয়াযু, ইত্যাদি অর্জন করাকে 'ফাযায়েল' বা 'আখলাকে ফাযেলাহ' বলে। এসকল গুণ অর্জন করা ওয়াজিব।

তদ্রূপ মানুষের অন্তরে কিছু মন্দ স্বভাব তথা দোষ আছে যা হারাম ও না-জায়েয। এ সকল দোষ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এগুলোকে رذائل বা اخلاق رذيله তথা মন্দ স্বভাব বলা হয়। এগুলো যদি কারো মধ্যে থাকে তাহলে তা দমন করতে ও মিটিয়ে ফেলতে হবে। যাতে এসব অসৎ স্বভাব মানুষকে গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করতে না পারে। মন্দ স্বভাব হলো, তাকাব্বুর [(অহংকার) অর্থাৎ, নিজেকে বড় মনে করা।] হাসাদ-হিংসা, রিয়া, (লৌকিকতা) অর্থাৎ, যে কোন দীনী কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে, মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং মানুষকে দেখানোর জন্য করা। এই অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ ও রিয়া সবই হারাম। তেমনি অধৈর্য হওয়া তথা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট না থাকা বরং এ ব্যাপারে আপত্তি করাও হারাম। এগুলোকেই رذائل (মন্দ স্বভাব) বলে। এসকল দোষ মানুষের অন্তরে থাকে। এমনিভাবে ক্রোধকে যদি অপাত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাও দোষ বলে গণ্য হবে।

মোটকথা! মানুষের অন্তরে এমন কিছু সৎ স্বভাব আছে, যা অর্জন করা জরুরী। এবং বেশ কিছু মন্দ স্বভাব আছে যা থেকে বেঁচে থাকা ও জরুরী। হযরত পীর-মাশায়েখ এবং সূফীয়ায়ে কেরামের কাজও এটাই। তারা তাঁদের মুরীদ অথবা শাগরিদদের অন্তরে সৎ স্বভাবসমূহের বিকাশ ঘটান এবং মন্দ স্বভাব দমন করেন, যাতে তা দলিত মথিত হয়ে এক সময় বিলুপ্ত হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। যে পর্যায়কে হযরত থানভী রহ. পারিভাষিক শিরোনামে এভাবে আখ্যায়িত করেছেন। "اماله بدرجه ازاله" অর্থাৎ, অন্তরে যে সকল মন্দ স্বভাব আছে সেগুলোকে এমনভাবে দলিত মথিত করো যে, এরপরও কিছু কিছু থাকবে বটে কিন্তু তা না থাকার মতোই হয়ে যাবে। সারকথা, **তাসাওউফ বলা হয়, মন্দ স্বভাবকে দমন করা এবং সৎ স্বভাব তথা সৎগুণাবলীর বিকাশ ঘটানোকে। এটাকে 'তাযকিয়া' বলে এবং এটাই তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য।**

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু সাধারণত এ গুণ কোন শায়খের সান্নিধ্যে থাকা ব্যতীত এবং শায়খের সামনে নিজেকে মিটানো ব্যতীত অর্জিত হয় না। এর কারণ হলো, "لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ" অর্থাৎ যে কোন বিষয় অর্জন করার জন্য সে বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। যদি ফিক্‌হের কোন মাসআলা জানতে হয় তাহলে কোন মুফতীর শরণাপন্ন হতে হবে। কারণ সে এ ব্যাপারে পারদর্শী। সে জানে, কোন প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে।

মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং এটা বুঝতে পারা যে, এই ব্যক্তির অন্তরে এ আধ্যাত্মিক ব্যাধী আছে কি না? এটা সকলের কাজ নয়। কারণ আধ্যাত্মিক রোগ অত্যন্ত গোপন এবং সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। অন্তরের কিছু বিষয় খুবই উত্তম। এর পাশাপাশি কিছু বিষয় আছে যা অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু এ দুটির মাঝে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন। যেমন অহংকার করা হারাম। অহংকার থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ এ অহংকারই হলো সকল রোগের মূল। কিন্তু অপর একটি বিষয় হলো "عـزت نفس" (আত্মসম্মানবোধ)। এটা অর্জন করা ওয়াজিব। কারণ আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া জায়েয নেই। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কোন্ ক্ষেত্রে অহংকার হচ্ছে আর কোন্ ক্ষেত্রে আত্মসম্মান রক্ষা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, আমি যে কাজ করছি, তা কি অহংকারের দরুন করছি, নাকি আত্মসম্মান রক্ষার জন্য করছি? এ দুটির মাঝে কে পার্থক্য রেখা এঁকে দিবে? কে বুঝবে এটা অহংকার আর এটা আত্মসম্মানবোধ। এটা সকলের আয়ত্বাধীন বিষয় নয়। বিশেষত মানুষের নিজের মধ্যেই যদি ঐ রোগ থাকে, তাহলে তা অনুধাবন করা আরো কঠিন হয়ে যায়।

তদ্রূপ আত্মার আরেকটি রোগ হলো, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা যে, আমি এমন, আমি তেমন, আমার মধ্যে এই গুণ আছে, আমার এই বৈশিষ্ট্য আছে। এটা হারাম। এটাকেই তাসাওউফের পরিভাষায় "تـعـلى" বা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি বলা হয়। এর বিপরিত আরেকটি বিষয় হলো, تـحـديث نـعـمـت অর্থাৎ, বান্দার উপর আল্লাহপাকের যে সকল নেয়ামত রয়েছে, তার

প্রকাশ ঘটানো। যার নির্দেশ আল্লাহপাক কুরআনে কারীমের এই আয়াতে দিয়েছেন,

وَاَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

[অর্থ: এবং আপনার রবের নেয়ামতসমূহের আলোচনা করুন-সূরা : যূহা]

এখন এ দু'টির মাঝে কে পার্থক্য করবে? আমি যে নিজের ভাল দিক নিয়ে আলোচনা করছি এটা تعلى তথা নিজ শ্রেষ্ঠত্বের অনুভুতি? নাকি تحديث نعمت তথা, আল্লাহ প্রদত্ব নেয়ামতের আলোচনা ?।

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

আমার শায়খ হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. থেকে শোনা, হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা-স্মরণ হলো। একবার হযরত থানভী রহ. দিল্লীর এক মসজিদের মেম্বারে বসে ওয়াজ করছিলেন। অনেক লোকের সমাবেশ ঘটেছিলো। হযরত থানভী রহ. ওয়াজের মধ্যে বললেন, আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটি কথা শোনাবো, যা শুধুমাত্র আমার নিকট হতে শোনতে পারবেন। অন্য কারো থেকে শোনবেন না। আমি এটা (আমার প্রতি) আল্লাহপাকের অনুগ্রহের বর্ণনা হিসেবে বলছি। এ জ্ঞান আল্লাহ পাক আমাকেই দান করেছেন। একথা বলার পর হযরত থানভী রহ. কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্! আস্তাগফিরুল্লাহ্!!আস্তাগফিরুল্লাহ্!!! আমি এটা কেমন কথা বললাম যে, একথা আপনারা শুধু আমার নিকট হতেই শোনবেন, অন্য কারো নিকট হতে শোনতে পাবেন না। এটাতো একটা (মারাত্মক) দাবী। এবং নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছি, অথচ এটাকেই আমি تحديث نعمت তথা আমার প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের বর্ণনা নাম দিয়েছি। কাজেই এজন্য আমি আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি– আস্তাগফিরুল্লাহ! প্রথম আমি নিজের বড়ত্বের বর্ণনা করেছি অতপর নিজের বড়ত্বের সেই বর্ণনাকে تحديث نعمت (আল্লাহ্‌র নেয়ামতের বর্ণনা)-এর আবরণে লুকাতে চেষ্টা করেছি। আর শরীয়তের বিধান হলো– تَوْبَةُ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ অর্থাৎ, গোপন গোনাহের তাওবা গোপনে

করতে হয়, আর প্রকাশ্য গোনাহের তাওবা ও প্রকাশ্যে করতে হয় যেহেতু আমি এ গোনাহ্ প্রকাশ্যে করেছি তাই এর তাওবাও প্রকাশ্যে করছি। এটা আমার ভুল হয়েছে। এ ভুলের জন্য তাওবা করছি। আস্তগফিরুল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ্।

হযরত থানভী রহ. এই তাওবা ওয়াজের মধ্যেই করেছেন। এমনটি অন্য কেউ করে দেখাক। এমনটি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজকে মিটিয়েছে। নিজেকে ফানা করে দিয়েছে। যে নফসের সূক্ষাতিসূক্ষ ধোঁকা সম্পর্কে সচেতন এবং যে সর্বক্ষণ স্বীয় নফসের নেগরানী করে থাকেন, নফসের প্রতিটি কাজের হিসেব নিয়ে থাকেন।

মোটকথা! লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি যা বলছি তা কি নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য বলছি ? নাকি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের প্রকাশ হিসেবে বলছি? এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন। এবং এটা বুঝতে পারাও সকলের সাধ্যের কাজ নয়।

বিনয় ও আত্মলাঞ্ছনার মধ্যে পার্থক্য

তদ্রূপ তাওয়াযু (বিনয়) অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উচ্চ পর্যায়ের গুণ। এগুণটি শরীয়তে কাম্য। এর বিপরিত আরেকটি বিষয় আছে, ذلت نفس (আত্মলাঞ্ছনা) অর্থাৎ, অন্যের সামনে নিজের নফসকে অপদস্ত করা। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আল্লাহ্ পাক আত্মসম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব করেছেন। নফসকে অপদস্ত করা যাবে না। কিন্তু এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যে, কোন্ কাজ বিনয়ের জন্য করা হচ্ছে, আর কোন্ কাজে আত্মলাঞ্ছনা হয়, এর মধ্যে পার্থক্য করা সকলের সাধ্যের কাজ নয়।

একটি ঘটনা

এ পার্থক্যকরণ সম্পর্কে হযরত থানভী রহ. নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

'আমি একবার রেলগাড়ীতে সফর করছিলাম। সে সময় আমার পাশে কয়েকজন গ্রাম্য লোকও ছিলো। যখন খাবারের

সময় হলো, তখন তারা নিজেদের সাথে নিয়ে আসা রুটি ও তরকারী বের করে সামনে রেখে আমাকেও তাদের সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিতে গিয়ে বললো, হযরতজী! কিছু গু-মুত (পেশাব-পায়খানা) আমাদের সাথে আপনিও খেয়ে নিন। তারা ঐ খাবারকে বিনয় প্রকাশের জন্য গু-মুত বলে ফেলেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো এটা তাদের বিনয় ছিল। কিন্তু বাস্তবে এটা আল্লাহ্ পাকের দেয়া রিযিকের অবমাননা ও অবমূল্যায়ন। আল্লাহ্ পাকের দেয়া রিযিককে গু-মুত বলে আখ্যায়িত করে অন্যকে তা খাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে। এটা বিনয় নয়, বরং আল্লাহ্‌র নেয়ামতের না শোকরী ও অবমূল্যায়ন।'

কোন কোন সময় বিনয়ের সীমা ذلت نفس তথা "আত্মলাঞ্ছনা-এর সঙ্গে মিলে যায়। আবার কখনো অকৃতজ্ঞতা (নাশোকরী)-এর সঙ্গে মিলে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, কোন্ সীমা পর্যন্ত বিনয় অবলম্বন করতে হবে আর কোন্ পর্যায়ে বিনয় অবলম্বন করা যাবে না? এবং কোন্‌টাকে বিনয় আর কোন্‌টাকে অকৃতজ্ঞতা বলা হবে। আর কোন্‌টা বিনয় এবং কোন্‌টা 'আত্মলাঞ্ছনা' এ সবের মাঝে পার্থক্য করতে পারা সকলের কাজ নয় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তা বোঝা সম্ভবও নয় যতক্ষণ না কোন শায়খের নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করবে।

এ বিষয়টা শুধু পড়া-শোনার মাধ্যমেও অর্জন করা যায় না। যেমন, কেউ কোন কিতাব পাঠ করে কোন জিনিসের পরিপূর্ণ সীমারেখা জেনে নিলো, তারপর বাস্তব ক্ষেত্রেও সে নিজেই তা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়ে গেল, এটা এমন বিষয় নয়, বরং এটা প্রত্যক্ষ দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। যখন কোন মানুষ কোন শায়খকে বরাবর প্রত্যক্ষ করতে থাকে এবং তার কার্যপদ্ধতি অবলোকন করতে থাকে, সাথে সাথে তাঁকে নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিয়ে নিজের জন্য পথনির্দেশ গ্রহণ করতে থাকে, তখনই কেবল এ পর্যায়ের অনুভব শক্তি অর্জন করতে পারে যে, আমল বা আখলাকের এই বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা আমার জন্য গ্রহণীয়, আর এটা আমার জন্য বর্জনীয়।

একটি দৃষ্টান্ত

আমি এ বিষয়টি বুঝার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। মনে করুন একটি গোলাব ফুল যার বিশেষ ধরনের ঘ্রাণ আছে। এখন যদি আপনি বড় থেকে বড় কোন দার্শনিক কিংবা যুক্তিবাদীকে বলেন যে, আপনি গোলাব ফুলের ঘ্রাণের এমন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বাতলে দিন যার মাধ্যমে গোলাপের ঘ্রাণ ও চামেলী ফুলের ঘ্রাণের পার্থক্য বুঝা যাবে। গোলাব ফুল থেকেও ঘ্রাণ পাওয়া যায় আবার চামেলী ফুলেরও ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এ দু'টির পার্থক্য বর্ণনার জন্য যদি বড় থেকে বড় সাহিত্যিক কিংবা ভাষাবিদকে ডাকা হয় তবুও তারা এ দুয়ের পার্থক্য কখনো বর্ণনা করতে পারবে না। কারণ এ পার্থক্য বুঝার একটিই মাত্র পন্থা। আর তাহলো গোলাব ফুলের ঘ্রাণ নিবে এবং চামেলী ফুলের ঘ্রাণ নিবে। ঘ্রাণ নেওয়ার পরই দুই ফুলের ঘ্রাণের পাথর্ক্য বুঝতে পারবে। এভাবে ঘ্রাণ নেওয়া ব্যতীত দুই ফুলের ঘ্রাণের পাথর্ক্য বুঝার আর ভিন্ন কোন উপায় নেই।

আরেকটি দৃষ্টান্ত

আরেকটি উপমা দিচ্ছি! আপনারা জানেন, আমও মিষ্টি, আবার গুড়ও মিষ্টি। কিন্তু দুটি মিষ্টির পার্থক্য যদি কোন বড় থেকে বড় দার্শনিককে কিংবা যুক্তিবিদকে বর্ণনা করতে বলেন, তাহলে তারা কস্মিনকালেও উভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে না। কারণ এ দু'টির মিষ্টতার মধ্যে যে পার্থক্য তা মুখের ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যে ব্যাক্তি এ দু'টির পার্থক্য জানতে চায়, তাকে বলতে হবে, আপনি গুড় খান এবং আমও খান, তাহলেই জানতে পারবেন গুড় কেমন মিষ্টি, আর আম কেমন মিষ্টি।

তদ্রূপ মানুষের জন্য অর্জন করার মতো যে সকল আভ্যন্তরীণ গুণ রয়েছে। যেমন, বিনয়-নম্রতা। এখন যদি কেউ 'বিনয়' এর সংজ্ঞা শব্দ দিয়ে বর্ণনা করতে চায় তাহলে এটা খুবই মুশকিল বিষয় হবে। কিন্তু যখন তুমি কোন বিনয়ী ব্যক্তিকে দেখবে এবং তার কার্য-কলাপ প্রত্যক্ষ করবে এবং তার সান্নিধ্যে থাকবে তখন এ নম্রতা ও বিনয়ের বৈশিষ্ট্য তোমার মধ্যেও আসতে শুরু করবে। এজন্য তাসাওউফ ও সুলূকের পথে চলার জন্য শায়খের সোহবতে থাকা এবং তার শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হয় সবচেয়ে

বেশী। এ বিষয়টি শুধু আলোচনার দ্বারা অর্জন করা যায় না। বরং কোন শায়খের নিকট নিজেকে মিটানোর মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক দয়া করেন এবং এ বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়।

আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য

যদিও পীর বা শায়খের নিকট বাই'আত হওয়া কোন অপরিহার্য বিষয় নয়, কিন্তু নিজের আত্মার সংশোধন করানো আবশ্যক। আর যখন কোন ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য স্বীয় শায়খের শরণাপন্ন হয়, তখন তার আসল উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, আত্মার জন্য অর্জন করার মতো গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করবে। আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্ত হবে এবং এ সকল দোষকে নিশ্চিহ্ন প্রায় করে ফেলবে, যাতে এসবের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। এটাই হলো, তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে বিভিন্ন দু'আ-দুরূদ, যিকির-আযকার ও অজীফা সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু সকলের জন্যই এসকল যিকির-আযকার দু'আ-দুরূদ ও অজীফার পরিমাণ নির্ধারণ করা, এবং সময় ও অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা নির্ধারণ করা এবং শায়খের পথ-নির্দেশ ও পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক। এভাবে যিকির ও অজীফা পাঠ করলেই উপকার হয়। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় এসকল যিকির-আযকার এ পর্যায়ের মৌলিক কোন উদ্দেশ্যও নয়, বরং আসল উদ্দেশ্য হলো, নিজ চরিত্র সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি। আর নিজ চরিত্রের সংশোধন ও আত্মার পরিশুদ্ধি লাভের জন্যই নিজের শায়খকে নিজের অবস্থা জানাতে হয় এবং তার পথ নির্দেশ গ্রহণ করতে থাকতে হয়। সারা জীবনই একাজ করতে হবে। শায়খের শরণাপন্ন হওয়ার আসল উদ্দেশ্যও এটাই।

এ কিতাবে ('আনফাসে ঈসা') হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. رذائل তথা আত্মার রোগ এবং فضائل তথা আত্মার গুণাবলী সম্পর্কে হযরত থানভী রহ.-এর যেসকল বাণী সংকলন করেছেন, আমি প্রয়োজনানুপাতে তার সামান্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করে দিচ্ছি। আল্লাহপাক নিজ অনুগ্রহে তা বুঝার এবং তার মাধ্যমে নিজের সংশোধন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

দ্বিতীয় মজলিস

আত্মার মন্দ স্বভাবসমূহের সংশোধন

আত্মার মন্দ স্বভাবসমূহের সংশোধন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ.

আত্মার মন্দ স্বভাবসমূহের সংশোধনের সীমা

মানুষের মধ্যে যেসব মন্দ স্বভাব ও প্রবণতা থাকে সেগুলোকে رذائل বলে। এ শিরোনামের অধীনে হযরত থানভী রহ. বলেন,

> সালেক (তাযকিয়া ও তাসাওউফের পথের পথিক)-এর জন্য উচিত নিজের আভ্যন্তরীণ মন্দ স্বভাবগুলোর এক এক করে নিজ শায়খের মাধ্যমে সংশোধন করিয়ে নেয়া। যখন একটি মন্দ স্বভাব পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে এবং সে মন্দ প্রবণতা একেবারে মৃত্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন অন্য আরেকটির চিকিৎসা শুরু করবে। পূর্বে যে মন্দ স্বভাবের চিকিৎসা করিয়েছে সেটা পরিপূর্ণ বিনাশের অপেক্ষা কখনো করবে না। কারণ এটা অসম্ভব। বরং সে প্রবণতা বিদ্যমান থাকাতেও হাজারো হেকমত আছে। (আনফাসে ঈসা ১৩৭ পৃ:)

'সালেক' শব্দের অর্থ হলো, চলাচলকারী, পথ অতিক্রমকারী। তাসাওউফের পরিভাষায় 'সালেক' বলে যে নিজের সংশোধনের জন্য কোন শায়খের নিকট যায়। অর্থাৎ, যেন সে রাস্তায় চলছে। তাসাওউফকে 'তরীক' বা রাস্তা বলে। আর 'সালেক' হলো সে রাস্তায় চলাচলকারী। আর শায়খ হলেন পথ প্রদর্শকের মতো, যে পথিককে পথ বাতলে দেয় যে, এভাবে চলো, এভাবে কাজ করো। হযরত থানভী রহ. বলেছেন, 'সালেকের' উচিত শায়খের মাধ্যমে এক এক করে মন্দ প্রবণতাগুলোর সংশোধন করা। যেমন তার মধ্যে ক্রোধ আছে। যা একটি মন্দ স্বভাব। কাজেই এর সংশোধন

করাতে হবে। কারণ ক্রোধের (প্রচণ্ডতার) কারণে সে কখনো কাউকে প্রহার করে। আবার কখনো কাউকে ধমক দেয়। ক্রোধের ফলে সে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কাজেই শায়খের নিকট খুলে বলতে হবে যে, আমার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ আছে। এ ধরনের প্রচণ্ড ক্রোধের ফলে অনেক সময় আমার দ্বারা অনেক অন্যায়ও হয়ে যায়। এ কথা শোনার পর শায়খ তার এ রোগের চিকিৎসা করবেন। শায়খ এমন কোন চিকিৎসা করবেন না যে তার মধ্যে আর কখনো ক্রোধের ভাব হবে না। বরং চিকিৎসার পরও তার ক্রোধ হবে। কারণ ক্রোধ মানুষের সহজাত প্রবণতা। এটা সকল মানুষের মধ্যেই আছে। তবে শায়খের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোর ফলে তার ক্রোধ শরীয়তের অনুকূলে এবং তার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।

এমনিভাবে মানুষের মধ্যে যত মন্দ প্রবণতা আছে, চাই সেটা ক্রোধ হোক, কামভাব হোক, বা কৃপণতা হোক, এ সবই মানুষের সহজাত প্রবণতা। এ সকল স্বভাব আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে এজন্য দিয়েছেন যে, মানুষ যেন এগুলো উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। যদি মানুষের মধ্যে ক্রোধ না থাকে, তাহলে সে আত্মরক্ষা কিভাবে করবে? নিজের স্ত্রী-সন্তান-সন্তুতিকে কিভাবে রক্ষা করবে? তার মধ্যে যদি ক্রোধের সঞ্চার না হয় তাহলে এর ফল এই হবে যে, যদি কেউ তার উপর কিংবা তার পরিবারের উপর আক্রমণ করে, তাহলে সে তার প্রতিপক্ষের অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিরোধ করার জন্য নিজের মধ্যে কোন আগ্রহই বোধ করবে না। নিজের ক্ষতি রোধ করার কোন চেষ্টাই সে করবে না।

এক নবাবের ঘটনা

আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ. একটি ঘটনা বলতেন যে, এক নবাব সাহেব ছিলেন যিনি সকল কাজ রুটিন অনুযায়ী করতেন। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি কোন কাজ রুটিনের বাহিরে করতেন না। তার নির্ধারিত রুটিন ছিলো যে, এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত অমুক কাজ। এতটা থেকে এতটা অমুক কাজ। অমুক সময় খাবার খাবো। অমুক সময় ঘুমাবো। অমুক সময় উঠবো। সে যে কাজের জন্য যে

সময় নির্ধারিত করে রেখেছিলো, সে সম্পর্কে সে বলতো, আমি তো রুটিন মতো এখন একাজ করছি, যদিও বাস্তবে সে সে সময় ঐ কাজ করছে না। যেমন, সে ঘুমানোর জন্য ছয় ঘণ্টা নির্ধারণ করে রেখেছিলো যে, সকালে ছয়টার সময় সে ঘুম থেকে জাগ্রত হবে। এখন যদি তার পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলেও সে ছয়টা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। কারণ সে সময় যদিও সে বাস্তবে ঘুমাচ্ছে না কিন্তু রুটিন অনুযায়ী ঘুমাচ্ছে।

একদিনের ঘটনা। আজও নবাব ছাহেবের ঘুম থেকে উঠার সময় ছয়টা নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু পাঁচটার সময় তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কিন্তু রুটিন মতো তিনি শুয়ে থাকলেন। এ সময় তার ঘরে একটি বানর প্রবেশ করে নবাব সাহেবের কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেলো। একটু পর আবার এসে খাবার নিয়ে চলে গেলো। একটু পর আবার এসে আরো কিছু জিনিস নিয়ে গেলো। কিন্তু নবাব সাহেব শুয়ে শুয়ে সব কিছু দেখলেন, কিন্তু বানরকে কিছুই বললেন না। কিন্তু যখন ছয়টা বাজলো তখন লাফিয়ে উঠে চিৎকার শুরু করলেন, আরে ভাই! কেউ কি দেখার নেই? বানর সব জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। সবাই কি মরে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, জনাব আপনি নিজে কি বানরকে এগুলো নিতে দেখেছেন। উত্তরে নবাব সাহেব বললেন, হ্যাঁ! আমি নিজে সব নিয়ে যেতে দেখেছি। লোকেরা বললো, আপনি নিজেই বানরকে বাধা দিতেন! নবাব সাহেব বললেন, আরে ভাই! আমি তো সে সময় আমার নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী ঘুমুচ্ছিলাম।

এ ঘটনায় আপনারা লক্ষ্য করেছেন, নবাব সাহেব তার রুটিনকে নিজের উপর এমনভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে, মানুষের মধ্যে নিজের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার সহজাত যে প্রবণতা থাকে নিজ (মস্তিষ্ক প্রসূত) রুটিন রক্ষা করতে গিয়ে সেটাও কুরবান হয়ে গেলো।

ক্রোধকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে

আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে ক্রোধ এবং আত্মসম্মানবোধ এজন্য দিয়েছেন যে, যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার জান, মাল, স্ত্রী-পুত্র অথবা আত্মীয়-স্বজনের উপর আক্রমণ করে তাহলে যেন সে তার ক্রোধ ও আত্মসম্মানবোধকে কাজে

লাগিয়ে তার প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু সীমাতিরিক্ত ক্রোধ দোষণীয়। আর সীমাতিরিক্ত ক্রোধ হলো, যেটা ক্রোধের ক্ষেত্র নয় সেখানেও ক্রোধ প্রকাশ করা। যেখানে শরীয়ত ক্রোধ প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে সেখানেও যদি মানুষ রাগ করে, ধমকা-ধমকী করে, মার-পিট করে, তাহলে এটাও ক্রোধের অপব্যবহার হবে, এবং তা না জায়েয হবে। মোটকথা! ক্রোধের কিছু বৈধ ক্ষেত্র আছে। আবার কিছু অবৈধ ক্ষেত্রও আছে। বৈধ ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করা দোষণীয় নয়, বরং এটাই শরীয়তে কাম্য। যেমন কোন পিতা, স্বীয় পুত্রকে কোন অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করলো, ধমক দিলো। অথবা কোন শিক্ষক, ছাত্রকে তিরস্কার করলো। বা কোন পীর, মুরীদকে ধমক দিলো, তিরস্কার করলো। যাতে তার মধ্য হতে মন্দ স্বভাব দূর হয়ে যায়। এটা শরীয়তে একান্তভাবে কাম্য। বরং এমন সব ক্ষেত্রে ক্রোধান্বিত না হওয়াই অসুস্থতা। কিন্তু যদি সে ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যায়, যেমন, এক ব্যক্তি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো আর আপনি তাকে ধমকাতে শুরু করলেন। অথচ আগত ব্যক্তি হলো আপনার মেহমান। মেহমানকে সম্মান করতে হয়। মেহমানকে আদর-আপ্যায়ন করতে হয়। কিন্তু আপনি তাকে বকতে শুরু করলেন। তিরস্কার শুরু করলেন। এটা ভুল, নিন্দনীয় এবং সংশোধনযোগ্য।

মোটকথা! ক্রোধকে বৈধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং অবৈধ ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখাই হলো শায়খের কাজ। সুতরাং যখন তোমার মধ্যে ক্রোধ আছে এবং তোমার একথা জানা নেই যে, তুমি সেই ক্রোধকে অবৈধভাবে ব্যবহার করছো? নাকি সঠিকভাবে? এখন তোমার কাজ হলো, শায়খকে নিজের অবস্থা ও আচরণ সম্পর্কে জানানো। শায়খ নিজেই এর ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিবেন, সহীহ ও ভুলকে চিহ্নিত করে দিবেন। আর যদি তোমার নিজেরই ধারণা থাকে যে, তুমি অপাত্রে অবৈধ ক্ষেত্রে ক্রোধের প্রকাশ ঘটাচ্ছ, তাহলে এ সকল ঘটনা এবং নিজের মধ্যে ক্রোধের আধিক্যের কথা শায়খকে জানিয়ে দাও যে, আমার মধ্যে সীমাতিরিক্ত ক্রোধ আছে। শায়খ এখন ধীরে ধীরে তোমার ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায়

বাতলে দিবেন। কিভাবে তুমি ক্রোধকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে সেটাও বলে দিবেন। তোমার কাজ হলো, তার কথার উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা।

বিদ্বেষের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা

অথবা কারো মধ্যে বিদ্বেষ আছে। তাহলে তার জন্য নিয়ম হল, সে নিজের শায়খকে বলবে, আমার মধ্যে 'বিদ্বেষ' আছে। কারণ আমার অমুক সহপাঠি যখন পরীক্ষায় আমার চেয়ে বেশী নম্বর পায়, আর আমি তার চেয়ে কম নম্বর পাই, তখন আমার অন্তরে এক ধরনের জ্বলন ও দহন হতে থাকে, আমার মন চায় যেন তার নম্বর আমার চেয়ে কম হয়। এখন নিজ শায়খের নিকট জিজ্ঞেস করবে, আমার অন্তরের এ অবস্থাটা 'বিদ্বেষ' কি না? যদি এটাই বিদ্বেষ হয়ে থাকে, তাহলে এর চিকিৎসা কিভাবে করবো? এটা দূর করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করবো?

খাহেশ বা অতিরিক্ত কামভাবের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা

অথবা কারো মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত কামভাব আছে, তাহলে তার উচিত নিজ শায়খকে জানানো যে, আমার এ রোগ আছে। এর চিকিৎসা কি? অথবা অন্য কেউ তাকে একথা বলার দ্বারা সে বুঝতে পারলো যে, আমার মধ্যে বড়ত্বের ভাব এবং অহংকার আছে। কিন্তু অহংকার এমন আধ্যাত্মিক রোগ যে, মানুষ সাধারণত বুঝতেই পারে না যে, আমার মধ্যে এ রোগ আছে। কারণ কখনো কোন অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে অহংকারী মনে করে না এবং নিজেকে অহংকারী বলেও না। অন্য কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসাও করে যে, আপনি কি অহংকার করেন? তাহলে সে উত্তর দিবে, না, আমি তো অহংকার করি না। কিন্তু অন্য মানুষ বুঝতে পারে যে তার মধ্যে অহংকার আছে। এজন্য শায়খকে বলতে হবে যে, লোকেরা বলে, আমার মধ্যে অহংকার আছে। অথবা শায়খকে বলবে, অমুক কাজ বা আচরণ দ্বারা আমি অনুভব করছি, সম্ভবত আমার মধ্যে অহংকার আছে। এখন এর চিকিৎসা পদ্ধতি বাতলে দিন। এরোগের চিকিৎসা কিভাবে করবো।

সুতরাং শায়খের নিকট যাওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তার নিকট হতে শুধুমাত্র অজীফা আর যিকির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো যে, কোন্ যিকির কি পরিমাণে করবো? তাসবীহ কতটুকু পড়বো? কি কি আমল করবো? কারণ যিকির-আযকার, ওজীফা ও তাসবীহ্ এপথের সহায়ক মাত্র। এগুলো আসল উদ্দেশ্য নয়। এপথের (অর্থাৎ তাসাওউফ ও মারেফাতের) আসল উদ্দেশ্য হলো, সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের সকল কর্ম-কাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে দেখবে, আমি যে অমুক কাজ করলাম তার মধ্যে অহংকার তো শামিল হয়নি? অমুক কাজে ক্রোধের অবৈধ ব্যবহার তো হয়নি? আমি অমুক কাজটি লোভে পড়ে তো করিনি? অথবা আমার মধ্যে সম্পদের লোভ এবং পদলিপ্সা নেই তো? এ সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে এবং শায়খকে জানাতে থাকবে এবং এ সকল আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা করাতে থাকবে। শায়খ এ সকল রোগের যে চিকিৎসা বলবেন তার উপর আমল করতে থাকবে। যদি শায়খের বাতলে দেয়া আমল করার ক্ষেত্রে গাফলতী হয়ে যায় বা এ আমল করতে অসুবিধা হয় তাহলে সেটাও শায়খকে জানাবে। মোটকথা! নিজের অবস্থা সংশোধনের জন্য নিজের সকল অবস্থা শায়খকে জানাবে।

অবগতি ও অনুসরণ

উপরোক্ত কথাটিকে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এভাবে বলতেন, কোন শায়খের সাথে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক করলে দু'টি কাজ করবে- (১) অবগতি (২) অনুসরণ। অবগতির অর্থ হলো, নিজের সকল অবস্থা শায়খকে অবগত করবে। আর অনুসরণের অর্থ হলো, শায়খ যা কিছু নির্দেশ করবেন তাঁর সে নির্দেশের অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। তার উপর আমল করবে। এভাবেই মানুষের সংশোধন হয়।

বর্তমানে আমরা তাসাওউফ ও তরীকতকে একটি প্রচলিত প্রথা বানিয়ে নিয়েছি। আমরা বলে থাকি, 'আমি তো অমুক পীর সাহেবের নিকট বাইআত হয়েছি।' ব্যাস! এরপর আর কিছুর প্রয়োজন নেই। বেশী থেকে বেশী পীর সাহেব যে সকল বিশেষ আমল ও বিশেষ যিকির বাতলে দিয়েছেন, যেগুলো বিভিন্ন নির্ধারিত সময়ে পড়তে বলেছেন, সেগুলো পড়ে নিলাম, ব্যাস।

এরপর আর কোন কিছুই করি না। অথচ আমার সম্মানিত পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন, মন্দ স্বভাবের সংশোধন করা ব্যতীত এসকল যিকির ও অজীফা কোন কোন সময় ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত হলো, কোন মানুষ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে অসুস্থ অবস্থায় তাকে শারীরিক শক্তিবর্দ্ধক ভিটামিন দেয়া হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি মারাত্মক সর্দি-কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত, তাহলে ডাক্তার প্রথমে তার সর্দি-কাশি ও জ্বরের চিকিৎসা করেন। সর্দি-কাশি ও জ্বর থাকা অবস্থায় ভিটামিন দেয় না। কেননা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম হলো, যখন কোন মানুষের শরীরে কোন একটি পদার্থ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তখন মানুষ যা কিছু খায় তাই ঐ রোগ-স্বভাব ও জীবানুর সহায়ক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন, কারো যদি কফ বেশী হয়, তাহলে এ অবস্থায় সে যা কিছুই খাবে, তাই তার কফে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথমে তার এ রোগ ও জীবানুর চিকিৎসা করতে হবে। তারপর শক্তিবর্ধক ভিটামিন দিলে তার কাজ হবে।

তদ্রূপ কারো অন্তরে যদি অহংকার আমিত্ব ও বড়ত্বের প্রতিমূর্তি থাকে, এ অবস্থায়ই যদি সে যিকির করে, তাহলে নিজের এ আমলের দরুণ তার অন্তরে থাকা অহংকারের এই মারাত্মক রোগ কোন কোন সময় আরো বেড়ে যায়। ফলে সে নিজেকে অনেক বড় আল্লাহওয়ালা মনে করে এবং ভাবে আমি কত যিকির করছি। যে সকল আমল বড় বড় সুফীয়ায়ে কেরাম করছেন আমিও তাই করছি। এভাবে ঐ যিকির করার দ্বারা তার উপকারের পরিবর্তে অহংকারের এই রোগ আরো বেড়ে যায়, শক্তিশালী হয়। এজন্য অধিকাংশ সময় প্রয়োজন হয় প্রথমে আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা করার এরপর যিকির ও অজীফা পাঠ করার।

মন্দ স্বভাবসমূহ জন্মগত বৈশিষ্ট

হযরত থানভী রহ. বলেন,

'মন্দ স্বভাব ও প্রবণতা জন্মগত হওয়ার প্রমাণ এই যে, আমরা দেখি শিশুরাও রাগ করে। বিজ্ঞজনদের বক্তব্য হলো, ক্রোধ অহংকার থেকেই জন্ম নেয়। তারপর ক্রোধ থেকে গীবত সৃষ্টি

হয়। শিশুদের মধ্যে যেহেতু ক্রোধ আছে, তাই বুঝা যায় যে, শিশুদের মধ্যে অহংকারও আছে। শিশুদের মধ্যে এসকল মন্দ স্বভাব বিদ্যমান থাকাটা একথা প্রমাণ করে যে, এ সকল দোষ জন্মগত স্বভাব।'

হযরতের উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, মন্দ প্রবণতা স্বভাবগত। স্বভাবগত হওয়ার কারণে একথা মনে করা যাবে না যে, এসকল দোষ কোন এক সময় একেবারে শেষ হয়ে যাবে। না, এ সকল মন্দ প্রবণতা কখনো একেবারে শেষ হবে না। ক্রোধও শেষ হবে না। অহংকারের মূলও উৎপাটিত হবে না। অবশ্য এ সকল মন্দ প্রবণতাকে দূর্বল ও শক্তিহীন করা যাবে। এগুলোকে দলিত-মথিত ও নিস্পেষিত করা যাবে। এগুলোকে দমন করতে করতে এ পর্যায়ে এসে যাবে যে, এগুলোর মধ্য হতে ঐ বিষ শেষ হয়ে যাবে, যা মানুষের জন্য প্রাণ সংহারক। এর ব্যাখ্যা একটু পরে হযরত নিজেই করছেন।

মন্দ স্বভাব দূরিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তা দুর্বল করা

মন্দ স্বভাব দূর করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাকে দুর্বল করা। দুর্বল করার অর্থ হল, এজন্য নিয়ম মতো সাধনা করার পর মন্দ স্বভাবের প্রতিরোধে আর পূর্বের মত কষ্ট না হওয়া।

(আনফাসে ঈসা-১৩৭ পৃ:)

অর্থাৎ, এ সকল মন্দ স্বভাব পুরোপুরি শেষ হয় না। বরং তা দূর্বল ও শক্তিহীন হয়ে যায়, ফলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা আগে যেমন কষ্টকর হত, এখন আর তেমন কষ্টকর হয় না। দুনিয়ার সকল কাজের অবস্থাই এমন। দীনের কাজের মধ্যেও একই নিয়ম। অনুশীলনের আগে যা কষ্টকর মনে হয়, অনুশীলনের ফলে সেটা সহজ হয়ে যায়। যেমন, যে ব্যক্তির পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার অভ্যাস নেই, তার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং নিয়মিত নামায আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে থাকে। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন সে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার কষ্ট কমে যায়। কষ্টতো একেবারে শেষ হয় না। কিছু না কিছু কষ্ট সব সময়ই হবে।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এ কষ্ট কম হয়। নামায আদায় করলে যে সওয়াব হয় সেটা মূলত এ কষ্টেরই পুরস্কার। কষ্ট যদি একেবারেই না হয় তাহলে সওয়াব কোন জিনিসের? তাই নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট ও পরিশ্রম সর্বাবস্থায়ই হয়ে থাকে।

মন্দ প্রবণতার ব্যাপারটিও এমনই। যেমন, ক্রোধ। আগের অবস্থা হয়তো এমন ছিলো যে, ক্রোধের কারণে নাকের উপর মাছিও বসতে দিতো না। সামান্য কিছুও যদি মনের বিরোধী হতো, তাহলেই মাথা গরম হয়ে যেতো। অন্যকে গাল-মন্দ করতে আরম্ভ করে দিতো। ধমকা-ধমকী আর মার-পিট শুরু করে দিতো। পরে যখন আত্মশুদ্ধির মানসে তাসাওউফ ও তরীকতের পথে চলতে শুরু করলো, তখন জানতে পারলো যে, ক্রোধ খুবই খারাপ জিনিস। ক্রোধকে অপাত্রে প্রয়োগ করা গোনাহের কাজ। সুতরাং সে ক্রোধকে দমন করতে এবং হজম করতে শুরু করলো। কখনো হয়তো কোন কারণে মন চায় যে, অমুককে জোরে থাপ্পড় লাগাই, তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলি। কিন্তু নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য ও কষ্টকর হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে যখন ক্রোধ দমন করতে থাকে, তখন শেষে এ অবস্থা হয় যে, ক্রোধের উদ্রেক তো হয় কিন্তু তা দমন করতে আগের মত কষ্ট হয় না।

কামভাব নিয়ন্ত্রণ

কামভাব একটি মন্দ প্রবণতা। মানুষ যদি এটাকে অপ্রাত্রে ব্যবহার করে তাহলে (আল্লাহ রক্ষা করুন) এটা মারাত্মক বিষয়। এ (তাসাওউফের) পথে এটা খুবই ধ্বংসাত্মক জিনিস। যেমন, কামভাবের (প্রাবল্যে) কোন অবৈধ ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা। উপভোগের জন্য পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া। প্রবৃত্তি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, তারপর যখন আত্মশুদ্ধির জন্য তাসাওউফ ও সুলূকের পথে পা রাখলো, তখন সে জানতে পারলো যে, পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং অবৈধ উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করা জঘন্য অন্যায় ও মারাত্মক গোনাহের কাজ। এ গোনাহ্ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এ চিন্তার পর পরবর্তিতে যখনই পরনারী বা অবৈধ দৃশ্য সামনে আসে তখনই

মনের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ হয় যে, মনভরে ঐ নিষিদ্ধ দৃশ্য উপভোগ করে নেই, যেমন আগে করেছি। কিন্তু সাথে সাথে তার একথা স্মরণ হয় যে, এখনতো আমি আত্মশুদ্ধির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কাজেই আমার দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। এ কথা স্মরণ হতেই দৃষ্টি ঐ অবৈধ দৃশ্য হতে হটিয়ে নেয়। এটা তার জন্য কিয়ামতসম কষ্টকর হয়। দিলের উপর করাত চালানোর মতো কষ্টদায়ক হয়। কারণ সে এতদিন পর্যন্ত অবৈধ ক্ষেত্রে (ও পাত্রে) দৃষ্টিপাতে অভ্যস্ত ছিলো। এখন সেসব জায়গা (ও দৃশ্য) হতে দৃষ্টি সরানো প্রবৃত্তির (নফসের) জন্য খুবই কষ্টকর হয়। কিন্তু যেহেতু সে একবার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে যে, দিলের উপর করাত চলুক বা কিয়ামত সংঘটিত হোক এবং যত কষ্টই হোক না কেন, আমি এই নিষিদ্ধ কর্ম আর করবো না।

ارزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

স্বপ্ন-সাধ ধুলিস্যাত হোক, হোক আশা-আকাংখা বরবাদ

এখনতো আমি গড়বো হৃদয়কে তোমার যোগ্য সৌধ।

একথা চিন্তা করে সে তার দৃষ্টিকে অবৈধ ক্ষেত্র হতে সরিয়ে নেয়। একাজে প্রথমবার যেমন কষ্ট হতো, দ্বিতীয়বার যখন আবার এমন ঘটনা ঘটবে, তখন প্রথমবারের তুলনায় কষ্ট কিছুটা কম হবে। তৃতীয়বার যখন ঘটবে, তখন কষ্ট আরো কমে যাবে। চতুর্থবার আরো কম হবে। এভাবে একষ্টের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাবে। পরিশেষে যখন স্বভাব ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় এসে যাবে, তারপরে যখন দৃষ্টি অবৈধ স্থানে পতিত হবে তখন যদিও দৃষ্টিপাত করার চাহিদা দুর্বল হলেও থাকবে, কিন্তু ঐ চাহিদা সত্ত্বেও সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া এত কষ্টকর ও কঠিন হবে না। কারণ বার বার দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার কারণে দৃষ্টিপাতের চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে। (তাসাওউফের পরিভাষায়) এটাকে اضمحلال বলে। এর অর্থ হলো, সাধনা ও মুজাহাদা করার পর মন্দ প্রবণতার বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষেত্রে আগের মত কষ্ট না হওয়া।

সামান্য কষ্ট সাধনা করার পরও হবে। মানুষ যত বেশি সাধনাই করুক না কেন এবং সাধনা করে করে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাক না কেন! কামভাব একেবারে মূল হতে শেষ হবে না। ক্রোধও একেবারে শেষ হবে না। গোনাহের চাহিদাও পূর্ণরূপে শেষ হবে না। গোনাহের আকর্ষণ এরপরও অন্তরে সৃষ্টি হবে। গোনাহের আগ্রহ এরপরও জাগ্রত হবে। তবে পার্থক্য হলো, পূর্বে এ আকর্ষণ ও চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যন্ত কষ্টকর হতো, এখন (সাধনার পর) কষ্ট কম হবে।

একথাটি হযরত থানভী রহ. এভাবে বলেছেন যে,

'মুজাহাদার (ও সাধনার) দ্বারা লোভী ব্যক্তির লোভ শেষ হয় না। কৃপণ ব্যক্তির কৃপণতাও শেষ হয় না। অহংকারী ব্যক্তির অহংকারও শেষ হয় না। হ্যাঁ, তবে (এসকল মন্দ প্রবণতা) দূর্বল হয়ে যায়।'

অর্থাৎ, মানব-স্বভাবে লোভের যে মৌলিক উপাদান আছে তা শেষ হয় না। স্বভাবে যে কৃপণতার মৌলিক উপাদান থাকে তা শেষ হয় না। স্বভাবে অহংকারের যে উপাদান থাকে তাও শেষ হয় না। কিন্তু এ সকল উপাদান দূর্বল হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, এ সকল উপাদান ও এ সকল জিনিস মানুষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে ঠিকই, কিন্তু মুজাহাদা ও সাধনার ফলে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, এখন আর এ মন্দ প্রবণতা মানুষকে মন্দ কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে পারে না এবং মানুষ এ সকল প্রবণতার অবৈধ চাহিদা অনুপাতে আমলও করে না।

লোভের চিকিৎসা

তদ্রূপ মানুষের মধ্যে সম্পদের লোভ আছে। স্বয়ং আল্লাহপাক কুরআন শরীফে বলেছেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ (ال عمران)

[মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে কাম্য বস্তুর ভালবাসা; রমনী হোক, সন্তান-সন্ততি হোক। -আলে ইমরান-১৪]

কিন্তু যদি এই 'লোভ' উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটা এত নিকৃষ্টও নয়। যতটুকু সম্পদ নিজ জীবন ও নিজ স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনের

হক আদায়ের জন্য প্রয়োজন হয়, ততটুকু সম্পদের লোভ থাকা দোষণীয় নয় বরং এতটুকু লোভ থাকার প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু যে পর্যায়ের সম্পদের লোভ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মানুষ যদি একটি বিস্তৃত বিশাল উপত্যকা ভরা স্বর্ণও পায়, তাহলে দ্বিতীয়টির লোভ করবে। দ্বিতীয়টির অধিকারী হলে সে তৃতীয়টির লোভ করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু পূর্ণ করতে পারবে না। এ পর্যায়ের লোভ হারাম। কারণ এ পর্যায়ের লোভ যখন মানুষের মধ্যে প্রবল হয় তখন তা মানুষকে বৈধ-অবৈধ সকল পন্থায় অর্থ উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করে।

লোভের বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম স্তর ঃ লোভের বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথম স্তর এমন যা মানুষকে প্রকাশ্য না জায়েয ও হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন করতে উৎসাহিত করে থাকে। এ লোভ তাকে কখনো চুরি করতে উৎসাহিত করে এবং বলে, চুরি করে সম্পদ অর্জন করো। কখনো ডাকাতী করতে উৎসাহিত করে; বলে, ডাকাতী করে সম্পদ অর্জন করো। আবার কখনো ধোঁকা-প্রতারণার প্রতি উৎসাহিত করে; বলে, ধোঁকাবাজী করে সম্পদ হাতিয়ে নাও। এটা লোভের সবচেয়ে মারাত্মক পর্যায়। আল্লাহপাক সবাইকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ লোভের দ্বিতীয় স্তরটি যদিও মানুষকে সম্পদ উপার্জনের জন্য প্রকাশ্য হারাম পন্থা অবলম্বনে উৎসাহিত করে না, কিন্তু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সম্পদ হস্তগত করার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। আর লোভের এ স্তরটা সাধারণত মৌলবী সাহেবদের মধ্যে বেশী থাকে। আমার সম্মানিত পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন, মৌলবী সাহেবদের পিছনে যে শয়তান লেগে থাকে সেও মৌলবী হয়ে থাকে। সে শয়তান মৌলবী সাহেবের নিকট এসে বিভিন্ন প্রকার (অবৈধ কর্মকে বৈধ করার জন্য) বিভিন্ন প্রকার দলীল ও বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা শোনাতে থাকে। সে বলে, দেখো এটা তোমার পাওনা। এটা তুমি আদায় করে নাও। অথচ বাস্তবে সেটা তার পাওনা নয়। কিন্তু এ লোভই এ অপব্যাখ্যায় প্ররোচিত করে। এ ধরনের অপব্যাখ্যা করে সে অর্থ উপার্জন করে। লোভের এ স্তরটিও হারাম।

তৃতীয় স্তর ঃ লোভের তৃতীয় স্তর হলো, অর্থ-কড়ি খুবই ভাল লাগে এবং অন্তরে এ আকাঙ্খা হয় যে, অধিক হতে অধিকতর অর্থের যেন মালিক

হতে পারি। কিন্তু লোভের বশে সে কোন স্পষ্ট হারামেও লিপ্ত হয় না এবং সম্পদ হস্তগত করার অবৈধ উপায়ও সে অবলম্বন করে না। সে সম্পদ উপার্জনের জন্য কোন অপব্যাখ্যার আশ্রয়ও নেয় না। যতটুকু সম্পদ হালাল ও বৈধ পথে আল্লাহপাক তাকে দান করেন সেটুকু সে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে এবং আরো বেশি পাওয়ার জন্য সে চেষ্টা করে। লোভের এ স্তরটা নিন্দনীয় নয়। কারণ এ লোভ তার কোন ক্ষতি করে না এবং সে লোভে পড়ে কোন নাজায়েয কাজও করে না।

কৃপণতা একটি আধ্যাত্মিক রোগ

কৃপণতাও লোভেরই মতো একটি আধ্যাত্মিক রোগ। কুরআন শরীফে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন,

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

(অর্থ : লালসার সাথে আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মিল থাকাই স্বাভাবিক)

(সূরা নিসা-২৮)

অর্থাৎ, আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে কৃপণতার স্বভাব রেখেছেন। এ কারণে মানুষের মধ্যে অর্থের প্রতি কিছু না কিছু আকর্ষণ থাকে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এ কৃপণতা কোন ফরয আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা না হবে এবং এ কৃপণতার দরুন এমন কোন কাজে জড়িত না হবে যেটা হারাম, মাকরূহ অথবা ভদ্রতা পরিপন্থি, তাহলে এতটুকু কৃপণতা নিন্দনীয় নয়। অবশ্য এ ব্যক্তি যদি কৃপণতার দরুন যাকাত আদায় না করে। স্ত্রী-সন্তান-সন্তুতি ও পরিবার-পরিজনের যে পরিমাণ খরচ দেয়া ওয়াজিব, সেটা না দেয়। অথবা কৃপণতার দরুন আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করে, অথবা কৃপণতার দরুন (সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও) ফকীরের মতো থাকে, অথচ আল্লাহপাক তাকে সম্পদ দান করেছেন, অর্থ-বিত্ত দিয়েছেন। আল্লাহ্র দেয়া এ (সচ্ছলতার) নেয়ামতের দাবি ছিলো সে (চলা-ফেরা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে) তা এমনভাবে ব্যবহার করবে যে, লোকেরা যেন দেখলে বুঝতে পারে এ কোন ফকীর-মিসকীন বা ভিখারী নয়। হাদীস শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَرٰى أَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় যে, তিনি তার বান্দাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তার চিহ্ন যেন ঐ ব্যক্তির বেশ-ভূষায় প্রকাশ পায়। সুতরাং আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রকাশ ঘটাতে হবে। এমন যেন না হয় যে, সে লাখপতি হওয়া সত্ত্বেও ছেড়া-ফাটা কাপড় পরে ঘোরা-ফেরা করে। কেননা এটাও খোদাপ্রদত্ব নেয়ামতের এক প্রকারের নাশোকরী। আল্লাহ্পাক যখন নেয়ামত দিয়েছেন, তখন তা ব্যবহার করে সে নেয়ামতের প্রকাশ ঘটাতে হবে। খোদাপ্রদত্ব এ সম্পদকে এভাবে ব্যবহার করবে যে, লোকেরা যেন বুঝতে পারে, আল্লাহ্পাক তাকে এ নেয়ামত দান করেছেন।

কৃপণতার একটি রূপ

কৃপণতার একটি রূপ হলো, সে তার উপর অর্পিত আর্থিক দায়িত্ব পালন করছে ঠিক, কিন্তু সে এভাবে আদায় করছে যে, (সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও) প্রতিদিন তার বাড়ীতে ডাল-ভাত রান্না হচ্ছে। অথচ তার পরিবারের জন্য উন্নত ও সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করার মতো অবকাশ তার আছে। এটাও কৃপণতার অন্তর্ভুক্ত। যদিও এটা হারাম নয়। কিন্তু অবশ্যই এটা ভদ্রতা পরিপন্থি।

কিন্তু যদি কৃপণতার দরুন তার কোন ওয়াজিব হক অনাদায়ী না থাকে, বরং সে উদারতা ও সচ্ছলতার সাথে স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি ও পরিবার-পরিজনের হক আদায় করছে। অবশ্য অর্থ ব্যয় করতে তার মনের উপর কিছুটা বেদনা অনুভূত হচ্ছে, মনে কিছুটা ব্যাথা হচ্ছে, এটা যদিও কৃপণতারই একটি রূপ, এতদসত্ত্বেও এতে কোন দোষ নেই। কারণ হলো, এতে কৃপণতার চাহিদা অনুযায়ী আমল হচ্ছে না এবং এ কৃপণতা তাকে কোন গর্হিত কাজে উৎসাহিত করছে না। এজন্য এ ধরনের কৃপণতা ক্ষতিকর নয়। সুতরাং সাধনার পরও এ পর্যায়ের কৃপণতা দূর হয় না। লোভও (একেবারে) শেষ হয় না। কিন্তু এসকল মন্দ প্রবণতার অশুভ প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। কারণ সাধনা ও মুজাহাদা করার পর এসকল মন্দ প্রবণতার চাহিদা অনুপাতে আমল করা হয় না।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মন্দ প্রবণতা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তৃতীয় মজলিস

রিয়াযত ও মুজাহাদা

রিয়াযত ও মুজাহাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ،وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

রিয়াযত ও মুজাহাদার একটি পার্থক্য

হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'একটি স্তর হল গোনাহের চাহিদা। এই চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করার চেষ্টা হল 'মুজাহাদা'। আরেকটি বিষয় হল এই খারাপ চাহিদার উৎস, যা মানুষের আত্মা ও অন্তরের একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বা মন্দ স্বভাব। আর এই স্বভাবকে দমন বা দুর্বল করে রাখার সাধনা হল 'রিয়াযত'।

তাসাওউফ ও সুলূকের কিতাবে অনেক সময়ই 'রিয়াযত' ও 'মুজাহাদা' এ দু'টি পরিভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এই মুজাহাদা বা রিয়াযত কাকে বলে? এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্যই বা কী? হযরত থানভী (রহ.) তার এ বাণীতে শব্দ দু'টির অর্থ ও উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করেছেন।

হযরত বলেন, নফসে যখন কোন গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হয় যে আমি একাজ করব। তখন জোর করে নফসকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখার নাম 'মুজাহাদা'।

আর এই গোনাহের চাহিদা যে উৎস থেকে সৃষ্টি হল, বার বার মুজাহাদার ফলে সেই উৎসে যে আঘাত লাগে এবং এই আঘাতের ফলে ধীরে ধীরে নফস দূর্বল ও নিস্তেজ হতে থাকে এটাকে বলে 'রিয়াযত'।

জায়েয বিষয় পরিহার করা

গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় মানুষকে কিছু জায়েয বিষয়ও পরিহার করে চলতে হয়। একটি কাজ জায়েয। কিন্তু এ জায়েয কাজটিও

পরিহার করতে হয় যখন এ আশঙ্কা হয় যে, এ জায়েয কাজটি অন্য একটি নাজায়েয কাজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যেমন সুফিয়ায়ে কেরাম কখনো কখনো বলেন, খাবার ক্ষুধার চেয়ে কিছু কম খাও। এখন বলুন ক্ষুধার পরিমাণে খাবার খাওয়া কি কোন গোনাহের কাজ? এটা কখনো গোনাহ নয়। তারপরও তারা বলেন কম খাও। কারণ এই কম খাওয়ার ফলে নফসের মুজাহাদা হবে। এবং এতে নফস চাহিদার খেলাফ কাজে অভ্যস্ত হবে, যা গোনাহের বিরুদ্ধাচারণের ক্ষেত্রে কাজে আসবে।

কম খাওয়ার মুজাহাদা

উদাহরণ হিসাবে আমি কম খাওয়ার মুজাহাদার কথা উল্লেখ করেছি। তবে এ যমানায় বিশেষভাবে কম খাওয়ার মুজাহাদার ব্যাপারে হযরত থানভী রহ. বলেন, কম খাওয়ার যে মুজাহাদা আগেকার সুফিয়ায়ে কেরাম করাতেন আজকালের জন্য তা উপকারী নয়। আগেকার মানুষের শরীর সাস্থ্য মজবুত হত এবং খাবারের পরিমাণও অনেক বেশি হত। খাবারে কিছু কমিয়ে দিলে তা সাস্থ্যের কোন ক্ষতি করত না। বরং নফসকে আয়ত্ত্বে রাখার মাধ্যম হিসাবে কাজ করত। আর এই কমের পরিমাণও তাদের হিসাবেই ছিল। 'এহইয়াউল উলূম' কিতাবে ইমাম গাযযালী রহ. কম খাওয়ার যে পরিমাণ লিখেছেন তা আজকাল আমার মত দুই জনের খাবার হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, আজকাল কম খাওয়ার পরিমাণ হল, প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খাওয়া। আর এই পরিমাণ বোঝার উপায় হল খাবারের এক পর্যায়ে গিয়ে মানুষ একটি দ্বিধায় পড়ে যায় যে, আর খাব কি খাব না। যখন এই অবস্থা হবে তখন খানা বন্ধ করে দিবে। আজকাল কম খাওয়ার মুজাহাদার জন্য এতটুকুই করে নাও। এবার বলুন, এখন যদি কেউ এ পর্যায়ে পৌছার পরও আরো দু এক লোকমা খেয়ে নেয় তাহলে কি সে গোনাহাগার হবে? বা এটা কি তার জন্য না জায়েয হবে? না, তা হবে না। কিন্তু তারপরও তাকে এটা থেকে বারণ করা হচ্ছে শুধু মুজাহাদার জন্য।

মোট কথা! সুফিয়ায়ে কেরাম অনেক সময় জায়েয বিষয় থেকেও বিরত থাকার কথা শুধু এজন্য বলে থাকেন যাতে নফসকে মুজাহাদায় অভ্যস্ত করে

তোলা যায়। একবার হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী রহ.কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হযরত সুফিয়ায়ে কেরাম এমন অনেক কিছু থেকে নিষেধ করে থাকেন যা আল্লাহ্ হালাল রেখেছেন। তারা হালালকে এভাবে হারাম করেন কেন? যেমন, আল্লাহ্ খাবার হালাল করেছেন, আর সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, খেয়ো না। আল্লাহ্ ঘুমানো হালাল করেছেন, কিন্তু সুফিয়ায়ে কেরাম বলছেন, ঘুমিও না। মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা কথা বার্তা বলা আল্লাহ্ হালাল করেছেন, অথচ সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, কম কথা বল। এর কারণ কি?

মানুষের নফসের দৃষ্টান্ত

হযরত নানুতভী রহ. একটি কাগজ নিয়ে বললেন এটা মোড়াও। তারপর বললেন এবার এটা সোজা কর। কিন্তু বার বার সোজা করা সত্ত্বেও তা সোজা হচ্ছে না। কারণ তাতে যে ভাজ পড়েছে সেদিকেই তা মুড়ে যাচ্ছে। এখন এটা সোজা করার উপায় হল উল্টা দিকে মুড়ে দেয়া। তাহলেই তা সোজা হবে।

এরপর হযরত বললেন, মানুষের নফসও গোনাহের দিকে এভাবে মোড়ানো থাকে। তাকে সোজা করতে চাইলে সোজা হয় না। এজন্য প্রথমে তাকে উল্টো দিকে মোড়াও এবং হালাল ও জায়েয কাজ থেকে (সামাজিকভাবে) ফিরিয়ে রাখ। তাহলে এক সময় এটা সোজা হবে এবং একটা মাঝামাঝি অবস্থায় চলে আসবে। এবং তখন আল্লাহর নাফরমানী থেকেও ফিরে থাকবে। আমাদের নফস গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নাউযুবিল্লাহ। আমাদের দৃষ্টি বদনজরে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নাজায়েয বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা থেকে স্বাদ ভোগ করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। (সূরা

মনে কর তুমি যদি বাজারে যাওয়ার পথে এদিক সেদিক দেখতে থাক তাহলে এটা নাজায়েয নয়। কারণ সামনে যখন এমনসব জিনিস নজরে পড়বে

যেগুলো দেখা জায়েয, যেমন বিল্ডিং, রাস্তা, গাড়ী ইত্যাদি তাহলে এদিক সেদিক দেখা নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি যেহেতু গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই গোনাহের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে, যখন বাজারে হাঁটবে তখনও দৃষ্টি অবনত রাখবে। কারণ তুমি যখন জায়েয বস্তুর দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখতে থাকবে তখন এক সময় হারাম জিনিসের উপরও তোমার দৃষ্টি পড়ে যাবে। কারণ তোমার মন, তোমার হিম্মত খুব দুর্বল যার ফলে তুমি গোনাহে পতিত হয়ে যাবে। আর যদি দৃষ্টি অবনত রাখ তাহলে গোনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকবে।

দৃষ্টি হেফাজত করার পন্থা

হযরত থানভী রহ. বলেন আল্লাহ্ যখন শয়তানকে বিতাড়িত করলেন তখন শয়তান কসম করে বলল, আপনি আমাকে আপনার দরবার থেকে বিতাড়িত করলেন। আমি মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তার ডান দিক থেকে আসব, বাঁ দিক থেকে আসব, সামনের দিক থেকে আসব পিছনের দিক থেকে আসব। শয়তান এখানে চারদিক থেকে আসার কথা বলেছে; বাকি দুই দিকের কথা ভুলে গেছে। উপরের দিক এবং নিচের দিক। এর অর্থ হল, উপরের দিক এবং নিচের দিক শয়তান থেকে নিরাপদ। তুমি যদি ডান দিকে দৃষ্টি দাও, তাহলে শয়তান ধোঁকা দিতে পারে, বাঁ দিকে দৃষ্টি দিলেও ধোঁকা দিতে পারে, সামনে বা পিছনে তাকালেও ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু তুমি যদি উপরের দিকে বা নিচের দিকে দৃষ্টি রাখ তাহলে শয়তান ধোঁকা দিতে পারবে না। তবে উপরে তাকিয়ে তো আর হাঁটা যায় না। তাই একটা পথই শুধু বাকি থাকল। অর্থাৎ, দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে হাঁট। তাহলে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

এটা হবে মুজাহাদা। এই মুজাহাদার উদ্দেশ্য হল বেগানার প্রতি ভোগের দৃষ্টি দেয়া থেকে বাঁচা। এখানে যেন প্রথমে প্রহরী বসানো হয়েছে যে, তুমি শুধু নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁট। ডানে বামে তাকিও না। এটা হল তোমার জন্য মুজাহাদা। এই মুজাহাদা করতে করতে যখন তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে, এখন আর বেগানার উপর তোমার দৃষ্টি পড়ে না বা পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে

তা ফিরিয়ে নাও, তাহলে এখন আর তোমার জন্য ডানে বামে তাকাতে কোন সমস্যা নেই। এখন তুমি সব দেখ। আল্লাহ যত কিছু দেখা হালাল করেছেন সবই তোমার জন্য দেখা জায়েয। সার কথা হল, অনেক সময় হারাম থেকে বাঁচার জন্য হালাল জিনিসও বর্জন করতে হয়। এর নামই মুজাহাদা।

মুজাহাদার সুফল

এসব মুজাহাদার ফলাফল এই হয় যে, মানুষের অভ্যন্তরে যে খারাপ স্বভাব থাকে তা দুরস্ত হয়ে যায়। যেমন সম্পদের মোহ আছে। মুজাহাদার দ্বারা তা দুরস্ত হয়ে যাবে। দুনিয়ার মোহ আছে মুজাহাদার বদৌলতে তা ঠিক হয়ে যাবে। কাম ও বিপুর অস্বাভাবিক তাড়না ছিল, অস্বাভাবিক ক্রোধ ছিল সব মুজাহাদার দ্বারা ঠিক হয়ে যাবে। মুজাহাদার দ্বারা এভাবে স্বভাব দুরস্ত হয়ে যাওয়ার নাম হল রিয়াযত।

তবে এই মন্দ স্বভাবগুলো ঠিক হওয়ার পরও সবসময় সেগুলোর দেখা শোনা ও তত্ত্বাবধান জরুরী। এমন নয় যে, একবার দুরস্ত করার পর আর কোন চিন্তা নেই ছুটি হয়ে গেল। আমরণ এই চিন্তা থেকে কখনো পূর্ণ মুক্ত হওয়ার উপায় নেই। আমার মুহতারাম আব্বাজান বলতেন, এগুলো হল জনমরোগ। সবসময় মানুষকে খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন ভুল কাজ বা কোথাও কোন অনিয়ম হচ্ছে কি না? কারণ মুজাহাদার দ্বারা এই স্বভাবগুলো সমূলে নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং তা দূর্বল হয়ে থেকে যায়। কখনো যদি তা প্রাণ পেয়ে যায় তাহলেই মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে দেয়। এজন্য সার্বক্ষণিকভাবে সতর্ক থাকতে হয়। মাওলানা রুমী রহ. বলেন–

اندریں راہ می تراش و می خراش
تادم آخر دمے فارغ مباش

এই পথে তুমি আজীবন সাধনা চালিয়ে যাও
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও বিরতি দিয়ো না।

চিকিৎসার নবায়ন

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'কোন জিনিসের মূল যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন নতুন করে চিকিৎসা করতে হয়। আর এসব রোগের মূলেৎপাটনের কোন উপায় নেই।' (আনফাসে ঈসা-১৩৮)

যদি কোন জিনিস সমূলে শেষ না হয় তাহলে তা যে কোন সময় ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠতে পারে। এজন্য নতুন নতুন করে বার বার চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। এমন মনে করো না যে, আমি শায়খের কাছে গেলাম এবং শায়খ মুজাহাদা করিয়ে সংশোধন করে দিলেন, যার ফলে আল্লাহর মেহেরবানীতে অবস্থা এখন ভাল হয়ে গেছে। গোনাহের তেমন আগ্রহ সৃষ্টি হয় না এবং গোনাহ থেকে বাঁচার গুরুত্বও অন্তরে বসেছে। সুতরাং এখন আমি আর গোনাহের দিকে যাব না। বিষয়টি এমন নয়; বরং যেকোন সময় পুনরায় গোনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন হতে পারে। যেমন থানভী রহ. বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন।

'মৌসুমী জ্বরের ঔষধ সেবনের পর সুস্থ হলে কি আগামী মৌসুমে এ জ্বর আর আসবে না এমন কোন নিশ্চয়তা আছে? এমন কি চিকিৎসা আছে যার ফলে আর কখনো এ জ্বর আসবেনা? অর্থাৎ, তোমার যখন মৌসুমি জ্বর হল এবং তুমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছ, ডাক্তার তোমার চিকিৎসা দিলেন। চিকিৎসা গ্রহণ করে তুমি সুস্থ হয়েছ। কিন্তু এখানে কি একথার কোন নিশ্চয়তা আছে যে, তোমার আর এ জ্বর আসবে না? কোন ডাক্তার বা কোন হাকীম এ গ্যারান্টি দিতে পারে যে এ অসুখ দ্বিতীয়বার আর হবে না? ডাক্তার তো শুধু এই মুহূর্তে তোমার যে জ্বর ছিল তার চিকিৎসা করে দিয়েছেন। এখন সামনে যেন কখনো জ্বর না আসে সে জন্য তোমাকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এবং তোমার সতর্কতা সত্ত্বেও সম্ভাবনা আছে যে, আবার তোমার জ্বর এসে যাবে। কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার জ্বর আসবে তখন তুমি আবার ডাক্তারের কাছে চলে যাবে এবং ডাক্তার ঔষধ দিবেন। ঔষধ সেবন করে তুমি আবার সুস্থ হবে।'

ঠিক একইভাবে তুমি যখন শায়খের কাছে নিজের কোন মন্দ স্বভাবের চিকিৎসা করে তা থেকে সুস্থ হয়ে যাবে তখন এমন মনে করো না যে, তুমি তা থেকে চিরতরে নিরাপদ হয়ে গেছ; তা আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না। বিষয়টি এমন নয়। যে কোন সময় তা আবার দেখা দিতে পারে। পুনরায় আবার দেখা দিলে তোমার কর্তব্য আবার শায়খের কাছে যাও এবং পুনরায় চিকিৎসা করাও।

মন্দ স্বভাবগুলো বার বার পরিচ্ছন্ন করতে থাক

একবার হযরত থানভী রহ.-এর কাছে কেউ আরয করল। হযরত এটা কি আশ্চর্য ব্যাপার যে, যতক্ষণ আপনার খেদমতে এবং আপনার সাহচর্যে থাকি ততক্ষণ অন্তরে খুব পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অনুভব করি। এবং মনে হয় যে মন্দ স্বভাবগুলো সব নিষ্পেষিত হয়ে গেছে। গোনাহের প্রতি ঘৃনা এবং নেকের প্রতি আগ্রহ অনুভূত হয়। কিন্তু যখন ঘরে ফিরে যাই তখন আবার গোনাহের চাহিদা ও রিপুর কামনা বাসনাগুলো জেগে ওঠে। এটার কি সমাধান? উত্তরে হযরত বললেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে! আমি তো হলাম ধোপা। যখন তোমাদের কাপড় ময়লা হয়ে যাবে এখানে নিয়ে আসবে আমি ধুয়ে দিব। তবে কোন ধোপা কাপড় ধোয়ার পর এই গ্যারান্টি দেয় না যে, এই কাপড় আর ময়লা হবে না। ধোপা কাপড় ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তোমাকে দিয়ে দিল। এবার তুমি তা পরিধান করতে করতে ময়লা হয়ে গেল। তো আবার ধোপাকে দিয়ে দাও সে ধুয়ে দিবে।

সুতরাং এমন মনে করো না যে, একবার চিকিৎসা করলে তা চিরজীবনের জন্য হয়ে গেল। বরং মাঝে মধ্যে চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিবে। বার বার শায়খের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর যত মাশায়েখ আছেন এবং যাদেরকে বাইআত করানোর অনুমতি দেয়া হয় তাদের ব্যাপারেও এমন মনে করো না যে, তারা এমন কামেল হয়ে গেছেন যে, এখন আর তাদের কোন গোনাহ হবে না। তারা গোনাহ থেকে 'মা'সূম' (নিরাপদ) হয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে আর গোনাহের কোন চাহিদা সৃষ্টি হয় না। বরং তাদে মধ্যেও গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং তাদেরও ভুল হয়।

কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে এমন একটা যোগ্যতা হয়ে গেছে এবং তাদের স্বভাব ও আখলাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যান। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদেরও চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। স্বয়ং হযরত থানভী রহ. বলেন, আমি যখন আমার মধ্যে এমন কোন রোগ দেখি তখন আমি নিজে আমার চিকিৎসা করি।

তবে তাঁদের মেজায স্বভাব ও আখলাক যেহেতু পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত হয়ে গেছে তাই তারা নিজের রোগ নিজেই ধরতে পারেন এবং নিজেই তার চিকিৎসাও করতে পারেন। পক্ষান্তরে আমাদের মত সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। এবং তাদেরকে নিজের অবস্থা জানিয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। আর এ চিকিৎসা আমরণ চলতে থাকে। এমনকি বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদেরও একই অবস্থা হয়।

তুমি মানুষ, ফেরেশতা নও

মানুষের মধ্যে যদি গোনাহের চাহিদা ও আগ্রহ না জাগত তাহলে তার মাঝে আর ফেরেশতার মাঝে কোন পার্থক্যই থাকত না। ফেরেশতাদের মধ্যে এসব চাহিদা নেই। তাদের মধ্যে রাগ নেই, কামভাব নেই, নফসের কোন প্রকার কামনা-বাসনা নেই, ক্ষুধা-পিপাসা কিছুই নেই। এখন যদি মানুষ থেকেও এগুলো শেষ হয়ে যায়, তাহলে তো সেও ফেরেশতা হয়ে যাবে। ফেরেশতার উপর তখন মানুষের কোন ফযীলতও থাকবে না। কারণ মানুষের ফযীলত এজন্যই যে, তার মধ্যে ভালোর সঙ্গে মন্দ স্বভাবও রাখা হয়েছে। আর এই মন্দস্বভাবের বিরুদ্ধাচণ করেই সে ফেরেশতার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়।

معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں

خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں

আমি নিষ্পাপ ছিলাম না, আজীবন সেজদা বা দোয়ায় মগ্নও ছিলাম না। আমার গুণ শুধু একটিই ছিল, তাহল গোনাহ করার যোগ্যতা।

ফেরেশতারা নিষ্পাপ এবং আজীবন দোয়া ও সেজদায় রত। পক্ষান্তরে মানুষের গুণ শুধু এতটুকুই যে, তার স্বভাবে গোনাহের চাহিদা গচ্ছিত। তবুও সে এই চাহিদার মোকাবেলা করে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য যা নিজেই একথা দাবী করে যে, তার শেষ উপাদানটুকু হলেও মানুষের মধ্যে থেকে যাবে। এবং তার সঙ্গে মানুষের সংঘাতও বাকি থাকবে। তবে প্রথমে এই সংঘাত অনেক শক্তিশালী হবে। কিন্তু মুজাহাদার পর তা অনেক দূর্বল ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে এই সংঘাত মৃত্যু পর্যন্ত বাকি থাকবে। সুতরাং তার কারণে যেমন ঘাবড়ানো বা নিরাশ হওয়া যাবে না তেমনি তা থেকে গাফেল হয়েও বসে থাকা যাবে না।

সার কথা হল, মুজাহাদার মাধ্যমে নফসকে দলিত এবং মথিত করতে হবে। যাতে তা একটি ভারসাম্যপূর্ণ পর্যায়ে এসে যায় এবং নাজায়েয কাজের দিকে নিয়ে না যায়। এ কাজ মরণ পর্যন্ত করতে হবে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথমে তার সাথে বেশি সংঘাত হবে পরে তা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে আসবে।

সকল মন্দ স্বভাবের প্রতিকার ও চিকিৎসা

হযরত থানভী রহ. বলেন,

'সকল মন্দ স্বভাবের চিকিৎসা হল চিন্তাভাবনা ও সহনশীলতা। অর্থাৎ, যে কোন কাজ করার সময় চিন্তা-ভাবনা করবে যে, এটা শরীয়তসম্মত কি না? তাড়াহুড়া করবে না বরং গভীর চিন্তা-ভাবনা ও সহনশীলতা অবলম্বন করবে।'

এই বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, মানুষকে তার সকল মন্দ স্বভাবের চিকিৎসার জন্য দুটি কাজ করতে হবে। এক. চিন্তা-ভাবনা, দুই. সহনশীলতা অবলম্বন। চিন্তা-ভাবনার অর্থ হল, যে কাজই করবে আগে চিন্তা করবে যে, আমি যা করছি তা শরীয়তসম্মত কি না? আমি যা বলছি তা ঠিক কিনা? চিন্তা করে যদি দেখা গেল এটা ঠিক নয়; নাজায়েয, কিন্তু তা সত্ত্বেও নফস তা করতে চাচ্ছে তাহলে আমাকে ধৈর্য ও সহনশীলতার আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ, একাজ থেকে বিরত থাকতে যে কষ্ট হবে তা সহ্য করতে হবে। এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে। মানুষ যদি এই দু'টি কাজ করতে থাকে তাহলে সকল মন্দ স্বভাব আয়ত্বে এসে যাবে।

এ কাজ আমাদের সাধ্যের বাইরে নয়

এ বয়ান থেকে এমন কিছু বোঝা ঠিক হবে না যে, একাজ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ আল্লাহ্ আমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন তা কখনো আমাদের সাধ্যের বাইরে হতে পারে না। তাই গোনাহ্ থেকে বাঁচার চিন্তা-ভাবনা এবং চেষ্টা এখন থেকেই শুরু করে দাও। একাজ করতে গিয়ে কখনো পদস্খলন ঘটবে কখনো বা ভুল হবে। তোমার এবং তোমার নফসের মাঝে অনেক সংঘাত হবে। শয়তানের সঙ্গে তোমার কুস্তি চলতে থাকবে। কখনো নফস ও শয়তান তোমাকে ফেলে দিবে কখনো বা তুমি নফসকে ফেলে দিবে। যখন তুমি বিজয় লাভ করবে তখন আলহামদু লিল্লাহ্ বলে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করবে। আর যখন সে তোমাকে পরাস্ত করবে তখন আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলে ইস্তেগফার করবে। কিছুদিন পর এমন হবে যে, তুমিই তাকে অধিকাংশ সময় পরাস্ত করবে, আর সে তোমাকে মাঝে মধ্যে পরাস্ত করবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(আর যারা আমার পথে সাধনা করে আমি তাদের জন্য রাস্তাসমূহ খুলে দিব)- সূরা আনকাবুত। এ আয়াত থেকেও একথা বোঝা যায়।

শিশু কিভাবে বড় হয়?

আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, আপনি ছোট শিশুকে দেখেছেন কিভাবে বড় হয়? মোটেও আন্দাজ করা যায় না, সে কিভাবে বড় হয়। শিশু যদি দৈনিক নিজেকে মাপে যে, আমি কতটুকু বড় হলাম, তাহলে সে দেখবে মোটেও বড় হচ্ছে না। গতকাল যা ছিল আজও তাই আছে। আগামীকাল মাপলেও দেখবে আগের সমান। অথচ বাস্তব হল সে দৈনিক বড় হয়ে চলছে। তবে তার বড় হওয়া দেখা যাচ্ছে না। এভাবেই সে বড় হতে হতে বালেগ হয়, যুবক হয়, দাড়ি ওঠে এবং একপর্যায়ে সে শিশু পূর্ণ মানবে পরিণত হয়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষ যখন এই (তাসাওউফ

ও সুলূকের) পথে চলে– তবে শর্ত হল ইখলাসের সঙ্গে চলতে হবে এবং লেগে থাকতে হবে, ছাড়তে পারবে না এবং গাফেল হতে পারবে না– তখন ধীরে ধীরে তার উন্নতি হতে থাকে।

আর এভাবে আস্তে ধীরে উন্নতি হওয়াই ভাল। কারণ মানুষ যদি মুহূর্তেই নিজের মধ্যে এমন আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে, যার ফলে তার দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়; দেখ কি থেকে কি হয়ে গেছে! তাহলে এটা অনেক সময় ফেতনার কারণ হয় এবং একারণে সে নিজেও ফেতনায় পতিত হয়। এজন্য আস্তে ধীরে যে পরিবর্তন আসে তাই ভাল এবং তাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও বরকত হয়। সুতরাং হতাশ হয়ে বসে পড়ো না। লেগে থাক এবং এই পথে চলতে থাক। শয়তান ও নফসের সঙ্গে লড়াই করে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি পূর্ণ সফল হও। কারণ আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে–

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

'শেষ পরিণাম মত্তাকীদের জন্য।'

আল্লাহ আমাকে আপনাকে সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

চতুর্থ মজলিস

ইসলাহ ও সংশোধনের পদ্ধতি ও পন্থা

ইসলাহ্ ও সংশোধনের পদ্ধতি ও পন্থা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، أَمَّابَعْدُ.

ইসলাহে আমল ও ইসলাহে বাতেনের পদ্ধতি

হযরত থানভী রহ. বলেন,

'আমল ও বাতেনের ইসলাহ্ ও সংশোধনের পদ্ধতি হল, নফসের জযবা ও চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং নফসকে কষ্ট করতে অভ্যস্ত করা'।

আমলের ইসলাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাহ্যিক আমলের ইসলাহ্। অর্থাৎ ঐসব আমল যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পদিত হয়। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। আর বাতেনের ইসলাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐসব আমল যা মানুষের অন্তর দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেমন সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, তাওয়াযু ইত্যাদি। হযরত থানভী রহ. বলেন, চাই জাহেরী আমালের ইসলাহ হোক বা বাতেনী আমলের ইসলাহ্ হোক উভয়টির পদ্ধতিই হল, নফসের জযবা ও চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা। অন্তরে যেসব অন্যায় আগ্রহ ও চাহিদা জাগে জোর করে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে এবং নফসকে তার চাহিদা বিসর্জনের কষ্টে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

শায়খের সুদৃষ্টি

অনেক মানুষ মনে করে কেউ যখন কোন আল্লাহওয়ালার কাছে যায় এবং তার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করে, তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে, তখন তিনি এক দৃষ্টিতে তার কাজ সেরে দিবেন। এক নজরে তার অন্তর জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিবেন।

খুব ভাল করে বুঝে নাও। ইসলাহে নফসের জন্য এটা কোন করণীয় কাজ নয়। তাই এটা হবে না যে, কোন আল্লাহওয়ালা তোমার দিকে এক নজর দিলেন আর তোমার স্বভাব বদলে যাবে এবং তোমার অবস্থা নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। বরং যা করার তা তোমার নিজেকেই করতে হবে। হিম্মত করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এবং কষ্ট করতে হবে। শায়খের কাজ শুধু সতর্ক করা এবং রাস্তা দেখিয়ে দেয়া। এমন কোন পথ দেখিয়ে দেয়া, যাতে তুলনামূলক সহজে কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু সে কাজ করতে হবে এবং চলতে হবে তোমার। কেউ যদি মনে করে আমাকে যেন কিছু না করতে হয়; অন্য কেউ আমাকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, তাহলে তার বুঝে নেয়া উচিত যে, এটা কখনো হবার নয়। যদি এমন হত তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরামকে দীনের দাওয়াতের জন্য এত কষ্ট ও সাধনা করতে হত না। মানুষের উপর এক দৃষ্টি দিয়ে দিতেন আর সব মানুষ মুসলমান হয়ে যেত।

আল্লাহতা'য়ালা এমন করেননি। কারণ শাস্তি ও প্রতিদান প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ আমলের উপরই দেয়া হবে। সুতরাং আমলও তাকেই করতে হবে। আর আমলের জন্য মজবুত হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্প লাগে। আল্লাহর পথে যত কষ্টই হোক না কেন এ কাজ আমি করবই এবং এ পথে আমি চলবই। সুতরাং আমলের ইসলাহ ও বাতেনের ইসলাহের জন্য নিজেকেই হিম্মত করতে হবে এবং অন্তরে যে অন্যায় ইচ্ছা ও চাহিদা জাগবে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। নিজেকে এ জন্য যাবতীয় কষ্টে অভ্যস্ত করতে হবে।

তাসাওউফের সারকথা

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. হযরত থানভী রহ.-এর একটি বাণী খুব বেশি বেশি বলতেন। সত্য কথা হল তাঁর এই বাণী পুরো তাসাওউফ ও তরিকতের সারকথা। তিনি বলতেন–

> 'তাসাওউফের সারনির্যাস অথচ খুব সংক্ষিপ্ত কথা হল, কোন নেক কাজ করতে অলসতা লাগলে তার মোকাবেলা করে তা

আঞ্জাম দেয়া এবং নফস কোন গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতে ঢিলেমি করলে তার মোকাবেলা করে সেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এতটুকু দ্বারাই আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সম্পর্কের উন্নতি হয় এবং সম্পর্ক স্থায়ী হয়।'

এটি এমন এক মহান ব্যক্তির বাণী, যিনি তাসাওউফ ও তরীকতের একজন মহান সংস্কারক, যিনি এই বাগানের প্রতিটি গাছের প্রতিটি পাতায় পাতায় বিচরণ করেছেন এবং যিনি এই পথের প্রতিটি ধূলিকণা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন। তিনি বলছেন, সমস্ত তাসাওউফের সার কথা হল, অলসতার মোকাবেলা করা। যেমন নামায পড়তে অলসতা লাগছে, মন চাচ্ছে মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়ে নিতে বা নামায ছেড়ে দিতে তাহলে এর একমাত্র চিকিৎসা শরীর ও মনকে সতেজ করে 'হিম্মতের সঙ্গে' তার মোকাবেলা করা। তাই অলসতার মোকাবেলার জন্য আল্লাহ তোমাকে যে হিম্মত দান করেছেন তা কাজে লাগাও। যদি তা কাজে লাগাও তাহলে অলসতা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি হিম্মতকে কাজে না লাগাও তাহলে অলসতা তোমার উপর আরো চেপে বসবে। কারণ অলসতার চরিত্রই হল তুমি তার কাছে যত আত্মসমর্পণ করবে ততই সে তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। আজ তোমাকে একটি ফরয থেকে দূরে রাখবে তো আগামীকাল আরেকটি ফরয থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। আজ তোমাকে দিয়ে একটি গোনাহ করালে কাল আরেকটি করাবে। আর যদি তুমি হিম্মতের সঙ্গে কঠিনভাবে তার মোকাবেলা শুরু কর যে, এ কাজ আমাকে করতেই হবে, এ কাজ আমাকে ছাড়তেই হবে, তাহলে সে আস্তে আস্তে দুর্বল অকেজো হয়ে পড়বে।

মানুষের নফস শিশুর মত

আল্লামা বূ-সিরী রহ. কাসিদায়ে বুরদা'য় খুব চমৎকার বলেছেন–

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمْ

নফস হল শিশুর মত। যদি তাকে দুধ না ছাড়াও; পান করাতেই থাক তাহলে যুবক হয়েও সে দুধপানের অভ্যাস ছাড়বে না। আর যদি ছাড়িয়ে দাও

তাহলে ঠিকই ছেড়ে দিবে। যদিও বা তাতে সামান্য সময় একটু কষ্ট হবে এবং বাচ্চা কান্নাকাটি করবে। রাত জাগবে মাকেও ঘুমাতে দিবে না। তবুও শেষ পর্যন্ত সে দুধ ছেড়েই দিবে। আর যদি তুমি এই সামান্য কষ্টের কারণে ঘাবড়ে যাও এবং মনে কর বাচ্চাকে তো দুধ ছাড়ানো খুবই কঠিন ব্যাপার, সে নিজেও রাতে ঘুমাবে না মাকেও ঘুমাতে দিবে না। এই বলে তাকে দুধ পান করাতেই থাক তাহলে বড় হয়ে যাবে কিন্তু তার দুধ খাওয়ার অভ্যাস যাবে না।

তেমনি মানুষের নফসও বাচ্চাদের মত। গোনাহের সাথে তার নেশা লেগে আছে। অন্যায় ও নাফরমানিতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে নাফরমানি আর গোনাহ করেই শুধু মজা পায়। আনুগত্য ছেড়েই সে স্বস্তি বোধ করে। এখন যদি তুমি তাকে গোনাহে লাগিয়ে রাখ; মনে কর আচ্ছা ঠিক আছে তুমি গোনাহের দুধ পান করে যাও তাহলে এই নফস কস্মিনকালেও গোনাহ ছাড়বে না। আর যদি তাকে গোনাহ ছাড়াতে চাও তাহলে কিছু কষ্ট অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গোনাহ ছাড়তে রাজি হবে এবং গোনাহ ছেড়ে দিবে। শুধু নফসকে একটু কষ্ট দেয়া আর একটু অনুশীলন করানোর ব্যাপারমাত্র। এ হল আল্লামা বূসিরী রহ.-এর আশ্চর্য প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী। আর হযরত থানভী রহ.ও বলতেন, এটাই হল তাসাওউফের সারকথা। অর্থাৎ গাফলত ও অলসতার মোকাবেলা করে নেক কাজ কর এবং গোনাহের কাজ ছাড়।

হিম্মত বড় জিনিস

যেমনিভাবে আল্লাহ মানুষের মধ্যে গাফলত ও অলসতা দিয়েছেন তেমনি তার পাশাপাশি তাকে আরেকটি বিষয়ও দান করেছেন, তা হল হিম্মত। হিম্মত বড়ই আশ্চর্য বিষয়। হিম্মত হল রাবারের মত। রাবার যদি তুমি টানতে থাক তাহলে তা বড় হতে থাকে। মানুষের হিম্মতকেও আল্লাহ এমন বানিয়েছেন। হিম্মতকে তুমি যত টানতে থাকবে তা ততই বড় হতে থাকবে এবং ততই তুমি উচ্চ থেকে উচ্চতর মাকামে পৌঁছে যাবে। এই দুনিয়ায় যে কেউই কোন কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে সে এই হিম্মতের দ্বারাই আঞ্জাম দিয়েছে। চাই

দুনিয়ার কোন কাজ হোক বা আখেরাতের কাজ হোক, এমনকি কোন অনর্থক কাজই হোক না কেন। অনর্থ কীর্তিও এই হিম্মতের দ্বারাই সাধিত হয়।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত

আমেরিকায় প্রসিদ্ধ একটি জলপ্রপাত আছে 'নায়াগ্রা'। যা দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য জিনিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ঘটনাক্রমে একবার আমার সেখানে যাওয়া হল। এক ব্যক্তি নায়াগ্রা জলপ্রাপাতের ইতিহাস ঐতিহ্যের উপর আমাকে একটি পুস্তিকা এনে দিল। সেখানে কি কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে এবং মানুষ সেখানে কি কি অভিযান চালিয়েছে কি কি কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে এসব ঐতিহাসিক বিষয়াদি তাতে স্থান পেয়েছে। সেখানে পুরো নদির পানি একসঙ্গে খুব শক্তিশালীভাবে উপর থেকে নিচে পড়ে। পুস্তিকায় ঐসব লোকের ঘটনা লেখা হয়েছে যারা এ জলপ্রপাতের পানির সঙ্গে সঙ্গে একটি রবারের নৌকা করে উপর থেকে নিচে পড়েছে। সেখানে প্রতিযোগিতা হয়েছে যে, কে আগে পড়তে পারে। যাতে অনেক মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে। যেখানে শুধু এই রেকর্ড সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পানির সঙ্গে সঙ্গে নৌকা নিয়ে অবতরণ করেছি।

অনেক মানুষ সেখানে এই প্রতিযোগিতা করেছে যে, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের নিচে রশি বেঁধে রশির উপর দিয়ে জলপ্রপাত অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। তাতে নিচে পড়ে গিয়ে অনেকে টুকরো টুকরো হয়ে গেছি। কারণ যে গতিতে পানি উপর থেকে নিচে পড়ে তাতে যদি ঐ পানির নিচে কোন প্রাণী পড়ে যায় তাহলে তার হাড্ডিও খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কেউ কেউ সফলও হয়েছে। তারপর একজন বলল, অমুকে তো একা একা ঐ রশি অতিক্রম করেছে। আমি মাথার উপর আরেক জনকে বসিয়ে রশির উপর দিয়ে এই জলপ্রপাত অতিক্রম করতে পারব এবং সে একজন অন্ধ মানুষকে মাথায় নিয়ে এই জলপ্রপাত অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল। দুনিয়ার ইতিহাসে আজও তার নাম লেখা রয়েছে যে, অমুক ব্যক্তি এভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত অতিক্রম করেছে।

এখন বলুন! আপনি কি একাজ কখনো করতে পারবেন? নায়াগ্রা নয়, ছোট একটি খালের উপর রশি বেঁধে তা পার হওয়ার চেষ্টা করেই দেখুন?

আপনার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কিন্তু একজন যখন হিম্মত করল আমাকে একাজ করতেই হবে এবং সংকল্প করল আমি একাজ করবই। তখন ঠিকই সে করে ফেলেছে। আল্লাহ্ এই হিম্মতে এমন শক্তি দান করেছেন যে, কোন অমুসলিম কাফের, আল্লাহকে অমান্যকারীও যদি কোন কাজের হিম্মত ও সংকল্প করে তার হিম্মতেও আল্লাহ্ বরকত দিয়ে ওকে রশির উপর দিয়ে অতিক্রম করিয়ে রেকর্ড গড়ে দেন।

গোনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য হিম্মত কর

আল্লাহ্ যখন একজন কাফেরের হিম্মতেও এই বরকত দান করেন তাহলে একজন ঈমানদার যখন আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এবং তার নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য হিম্মত করবে তাতে আল্লাহ্ বরকত দিবেন না? হিম্মতের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা এমন শক্তি দান করেছেন যে, যারা হিম্মতকে কাজে লাগায় তারা বড় বড় যুদ্ধ ক্ষেত্রকেও পদাবনত করে ফেলে। শুধু সংকল্প করার ব্যাপারমাত্র।

আসলে কিছু না করতে পারার কারণ হল, মানুষ নিজের গাফলত ও অলসতার কাছে আত্মসর্মপণ করে ফেলে, আর মনে করে আমার তো একাজের সাধ্য নেই, অথচ কুরআনের বক্তব্য হল এসবের কিছুই তোমার অসাধ্য নয়।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(আল্লাহ্ কাউকে তার সমর্থের বাইরে কাজের নির্দেশ দেন না।)

সুতরাং তোমাকে যেসব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা তোমার সাধ্যের অনুকূলে। শুধু তোমার হিম্মত করার দেরি। এ জন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, সমস্ত তাসাওউফের সারকথা হল, হিম্মতের সঙ্গে গাফলত ও অলসতার মোকাবেলা করে নেক কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং গোনাহ থেকে বাঁচা। পুরো যিন্দেগী এভাবেই অতিবাহিত করতে হবে, কখনো পদস্খলন ঘটে গেলে পুনরায় নতুন করে হিম্মত করতে হবে।

শিশুরা কিভাবে হাঁটতে শিখে

হযরত থানভী রহ. বলতেন, আপনি শিশুদেরকে দেখেছেন তারা কিভাবে হাঁটতে শিখে? প্রথম যখন সে হাঁটতে চায় এক পা হেটে পড়ে যায়। এখন যদি ঐ শিশু একপা হেঁটেই হতাশ হয়ে বসে থাকে যে, হাঁটা আমার সাধ্যে নেই। তাহলে কখনো সে হাঁটতে পারবে না। কিন্তু সে পড়ে যাওয়ার পরও আবার হাঁটে, আবার পড়ে যায়, আবার হাঁটে আবার পড়ে যায়, এভাবে হাঁটতে থাকে আর পড়তে থাকে এবং একসময় সে হাঁটতে শিখে যায়। তাই হিম্মত করে নিজেকে আগে বাড়াও, পা ফেলে সামনে অগ্রসর হও। যদি পদস্খলন ঘটে যায় কোন পরোয়া না করে, আবার উঠে দাঁড়াও এবং আবার চল। আবার পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াও, আবার চলতে আরম্ভ কর। গতকাল দুই বার পড়ে গেলে আজ একবার পড়বে। আজ পুরোপুরি পড়ে গেলে আগামীকাল সামান্য পড়বে। এভাবে পূর্ণ হাঁটা তুমি শিখে ফেলবে। মোটকথা! হিম্মত দ্বারাই মানুষ অগ্রসর হয়। হিম্মত ছাড়া দুনিয়ায় কোন কাজই হয় না।

হাফেজ সিরাজী রহ.-এর ঘটনা

একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, অমুক বুযুর্গ এক নজর দিলেই জীবনে বিপ্লব ঘটে যায়। যেমন হাফেজ সিরাজী রহ.-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি প্রথমে এলোমেলো যিন্দেগী যাপন করতেন। তার পিতার এক শায়খ ছিলেন। পিতার তামান্না ছিল ছেলের এমন এলোমেলো জীবন! সে যদি তা ছেড়ে আমার শায়খের নিকট গিয়ে নিজের ইসলাহ করিয়ে নিত, তবে কতই না ভালো হত। ইতিমধ্যে একদিন শায়খ তার বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। তখন পিতা ছেলেকে ডেকে আনলেন। হাফেজ সিরাজী যেহেতু কবি ছিলেন তাই শায়খের কাছে এসে এই কবিতা পড়লেন–

آں را کہ خاک را بنظر کیمیا کنند ☆ آیا بود کہ گوشۂ چشم بما کنند

যাঁদের দৃষ্টিতে মাটিও সোনা হয়ে যায়। আমার ভাগ্যেও কি জুটবে তাঁর একটু দৃষ্টি।

অর্থাৎ, শায়খকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, আপনি তো এক নজরে মাটিকে সোনা বানিয়ে দেন। যদি আমার উপরও এমন একটু সুদৃষ্টি দান করতেন। সঙ্গে সঙ্গে শায়খ উত্তর দিলেন–

نظر کردم ، نظر کردم

হ্যাঁ দৃষ্টি দিয়েছি, দৃষ্টি দিয়েছি। বাস! তখন থেকেই হাফেজ সিরাজী রহ. হাফেজ সিরাজী হয়ে গেলেন এবং তার দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে এত মর্যাদা দান করলেন।

এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা আগেকার বুযুর্গদের জীবনে পাওয়া যায়। শায়খ এক নজর দিলেন আর তার দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেল।

এক নজরে 'তাসাররুফ' করার রহস্য ও তাৎপর্য

এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় বুঝার আছে। প্রথম কথা হল, এরকম দৃষ্টিকে 'তাসাররুফ' বলে। আর এই তাসাররুফের শক্তি সবার থাকে না এবং এটা না থাকা কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নয়। অর্থাৎ, কোন শায়খ ও বুযুর্গের দৃষ্টিতে যদি তাসাররুফশক্তি না থাকে তাহলে এটা দোষের কিছু নয়। তবে কারো যদি এ শক্তি অর্জিত হয়ে যায় তাহলে এটা আল্লাহর নেয়ামত।

আজকাল এক পীর সাহেব খুব প্রসিদ্ধি লাভ করছেন। তার কিতাবে লেখা দেখেছি 'যে পীর নিজের মুরিদকে বাইতুল্লায় নামায পড়াতে পারবে না সে পীর হওয়ার উপযুক্ত নয়।' মনে রাখবেন এটা গোমরাহ চিন্তা। দীনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাসাররুফশক্তি থাকা না থাকার কোন ধর্তব্য নেই। এই তাসাররুফশক্তি ফাসেক ফাজেরও অর্জন করতে পারে, এমনকি অমুসলিম কাফেরও এই শক্তির অধিকারী হতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল এই তাসাররুফশক্তির অধিকারী হওয়া আল্লাহর প্রিয় বা মুত্তাকী হওয়ার কোন আলামত নয় এবং তা না থাকাও কোন দোষ বা ত্রুটি নয়। বরং তা ভিন্ন কোন কারণে কারো অর্জিত হয় আবার কারো অর্জিত হয় না।

তাসাররুফ দ্বারা সাময়িক প্রফুল্লতা আসে

দ্বিতীয় কথা হল, তাসাররুফের সার কথা শুধু এতটুকু যে, তাসাররুফের ফলে যার উপর তাসাররুফ করা হয় তার মধ্যে সাময়িক কিছু প্রফুল্লতা আসে। এই প্রফুল্লতা একান্তই সাময়িক হয়ে থাকে বেশি সময় বাকি থাকে না। পরে তার নিজেকেই কাজ করতে হয়। এমন হয় না যে এই তাসাররুফের ফলেই সে সারা জীবন দীনী কাজের উপর পার করে দিতে পারে। এই তাসাররুফের দৃষ্টান্ত কিছুটা গাড়ী ধাক্কা দেয়ার মত। গাড়ী যখন চালু না হয় তখন তা ধাক্কা দিয়ে চালু করার চেষ্টা করা হয়। ঐ ধাক্কার ফলে গাড়ীতে সামান্য একটু চলার যোগ্যতা আসে। তবে এই ধাক্কার ফলে যখন গাড়ী চালু হয় তখন তাকে নিজের ইঞ্জিন ও পেট্রোলের শক্তিতেই চলতে হয়। কিন্তু যদি গাড়ীর ইঞ্জিন নষ্ট হয় বা তাতে পেট্রোল না থাকে, তাহলে হাজার ধাক্কা দিলেও গাড়ী চালু হবে না। ধাক্কা লাগানোর পর দুই চার হাত চলেই তা আবার বন্ধ হয়ে যাবে।

ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে যদি তাসাওউফের পথে; আল্লাহর পথে চলার হিম্মত ও শক্তি থাকে তাহলে কোন বুযুর্গের দৃষ্টি পড়লে তার মধ্যে চলার যোগ্যতা শানিত হয় এবং কিছু চাঞ্চল্য ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। এবং পরে সে নিজের শক্তিতে সামনে অগ্রসর হতে পারে। পক্ষান্তরে তার ভিতরে যদি শক্তিই না থাকে তাহলে তার প্রতি হাজার বার নজর পড়লেও হাজার বার তাসাররুফ করলেও তাতে কিছুই হয় না। হ্যাঁ সর্বোচ্চ সাময়িক কিছু নড়া চড়া সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই তা আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মোটকথা! এই দৃষ্টির প্রভাব দীর্ঘ সময়ও থাকার নয় আজীবনও থাকার নয় এবং সবার এ শক্তি অর্জিতও হয় না। আর এটা এমন কোন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যও নয় যা না থাকা দোষণীয়। এই দৃষ্টি দ্বারা যদি কারো কোন উপকার হয়েও যায় তবে তা হয় খুবই সাময়িক। অবশেষে কাজ নিজেকেই করতে হয় নিজের হিম্মতেই করতে হয়। তাই নিজের ইঞ্জিনকে শক্তিশালী করতেই হবে। নিজের ইঞ্জিন দিয়েই গাড়ী চালাতে হবে। ধাক্কা দিয়ে গাড়ী চালানো যাবে না। সুতরাং আসল কাজ হবে নিজের হিম্মতকে তাজা করা। এজন্যই হযরত থানভী রহ. বলেন–

'আমলের ইসলাহ ও নফসের ইসলাহের উপায় হল নফসের জযবা ও চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং এজন্য যে কষ্ট হবে তাতে নফসকে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করা। নফসকে যত বেশি কষ্টে অভ্যস্ত করবে ততই তা উন্নতি সাধন করতে থাকবে। তারপর এর মাধ্যমে বাহ্যিক আমলও দূরস্ত হতে থাকবে এবং বাতেনও ঠিক হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।'

উত্তম আখলাকেরও সীমা আছে

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন−

'ভিক্ষুককে যখন তিনবার তুমি ওজরের কথা বুঝিয়ে বলবে, কিন্তু তারপরও সে না যায়; বরং কিছু দেয়ার জন্য তোমাকে আকড়ে ধরে, যা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এবার তাকে ধমক দিতে পার। এ থেকে বুঝা গেল উত্তম আখলাকেরও একটা সীমা আছে। আর বান্দা এ সীমানা ছাড়িয়ে কষ্ট সহ্য করার জন্য আদিষ্ট নয়। (আনফাসে ঈসা-১৩৮)

একদিকে কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে−

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَاتَنْهَرْ

অর্থাৎ, ভিক্ষুককে ধমক দিওনা।

'যদি তাকে কিছু না দিতে পার তাহলে নম্রভাবে বলে দাও এবং বুঝিয়ে দাও যে, ভাই এখন ক্ষমা কর! তোমাকে দেয়ার মত কিছু নেই বা এই সমস্যার কারণে তোমাকে কিছু দিতে পারছি না। তাকে ধমক দিওনা। কিন্তু নম্রভাবে যখন তাকে একবার বলে দিলে ভাই ক্ষমা কর। তোমাকে দিতে পারছি না, কিন্তু সে আবারও চায়। তুমি দ্বিতীয়বারও বুঝিয়ে দিলে, কিন্তু সে তবুও চায় এবং তুমি তৃতীয়বারও নম্রভাবে বুঝিয়ে দিলে, তাহলে চতুর্থবার তুমি তার সাথে এমন উত্তম আচরণে বাধ্য নও। এবার তুমি তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পার। এটা তোমার জন্য নাজায়েয নয়। এবং উক্ত আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হযরত থানভী রহ. বলছেন এ থেকে বুঝা যায় মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণের যে নির্দেশ শরীয়ত দিয়েছে তারও একটা সীমা আছে। মানুষকে অসহনীয় কষ্টে ফেলার জন্য উত্তম আখলাকের নির্দেশ দেয়া হয়নি। একজন যত ইচ্ছা কষ্ট দিবে আর অন্যজন শুধু সহ্য করে যাবে এবং উত্তম আখলাক প্রদর্শন করবে এমন নয়। বরং একটি সীমানার পর বাহ্যত খারাপ আচরণের প্রয়োজন হলে তাতে কোন সমস্যা নেই। কারণ সব কিছুরই আল্লাহ একটা সীমা রেখেছেন। সেই সীমা পর্যন্ত তা কাম্য ও প্রশংসনীয়। তারপর বান্দা তা রক্ষা করতে আদিষ্ট নয়।

প্রথমে যথাস্থানেও রাগ করবে না

আমাদের মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহ. বলতেন, স্বাভাবিকভাবে তো ন্যায়সঙ্গত রাগ করা জায়েয এবং অন্যায় রাগ করা নাজায়েয, কিন্তু অন্যায় রাগ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে যথাস্থানেও রাগ না করার অনুশীলন করতে হয়। আর যারা ইসলাহ ও সংশোধনের পথে প্রাথমিক পর্যায়ের তাদের তো প্রথমে রাগ করার বিষয়টি একেবারে ছেড়েই দিতে হবে। হক না হক কোথাও তারা রাগ করতে পারবে না। যখন রাগ নিজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে তখন যথাস্থানে রাগ করতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ তা জায়েয এবং মন্দ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখন দেখার বিষয় হল কোন সীমা পর্যন্ত মানুষ রাগ পরিহার করে উত্তম আখলাক প্রদর্শন করবে? এটা এমন এক বিষয় যেখানে মানুষ ধোঁকা খেয়ে যায়। তাই কোথায় রাগ করবে আর কোথায় রাগ করবে না, তা বুযুর্গদের সাহচর্যে থেকে অর্জন করতে হয়। এটা অংকের হিসাব নিকাশের মত কোন বিষয় নয় যে, দুয়ে দুয়ে চার এরকম কোন সূত্র ধরিয়ে দিলে বুঝে ফেলবে, অমুক ক্ষেত্রে রাগ করা যাবে আর অমুক ক্ষেত্রে করা যাবে না। বরং বুযুর্গদের সাহচর্যে থাকার দ্বারা যখন একটা রুচি ও যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায় তখনই মানুষ বুঝতে পারে যে, এখানে রাগ করা ঠিক আর ওখানে রাগ করা ঠিক নয়। যার মধ্যে এই যোগ্যতা আছে তার সাহচর্য ছাড়া এ যোগ্যতা অর্জিত হয় না। তাকে বার বার দেখতে হবে সে কোথায় কিভাবে আমল করছে। এভাবে দেখতে দেখতে নিজের মধ্যে সে যোগ্যতা তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ।

রিয়াযতের মাধ্যমে আখলাকের ইসলাহ্ হওয়ার অর্থ

হাদীসে আছে, যদি শোন অমুক পাহাড় স্বস্থান থেকে সরে গেছে তবে তা বিশ্বাস কর। তবে যদি শোন অমুক ব্যক্তি তার স্বভাব থেকে সরে গেছে তা কিন্তু বিশ্বাস করো না। এখান থেকে জানা গেল রিয়াযত ও মুজাহাদা দ্বারা মানুষের জন্মগত স্বভাব দূর হয় না। তবে হ্যাঁ! তা দুর্বল হয়।

(আনফাসে ঈসা-১৩৯)

এটা প্রসিদ্ধ হাদীস যে, কেউ যদি বলে অমুক পাহাড় স্বস্থান থেকে সরে গেছে তাহলে তা বিশ্বাস করা যেতে পারে। কারণ তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কেউ যদি বলে অমুক ব্যক্তি তার জন্মগত স্বভাব থেকে সরে গেছে তাহলে তা বিশ্বাস করো না। অর্থাৎ, পাহাড়ও নিজের জায়গা থেকে সরে যেতে পারে কিন্তু মানুষের জন্মগত স্বভাব ও চরিত্র তার থেকে দূর হতে পারে না। যেমন ফার্সি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে–

زمیں جنبد زماں جنبد نہ جنبد گل محمد

অর্থাৎ,যমিন নড়তে পারে, যামানা নড়তে পারে, কিন্তু জন্মগত স্বভাব চরিত্র নড়তে পারে না।

এ হাদীস উল্লেখ করে তা থেকে হযরত থানভী রহ. একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, রিয়াযত ও মুজাহাদা দ্বারা মানুষের জন্মগত স্বভাব সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং তা দুর্বল হয়।

অর্থাৎ,হাদীসের উদ্দেশ্য হল, যদি কেউ বলে, অমুকের রাগ একেবারে শেষ হয়ে গেছে তাহলে তা বিশ্বাস করো না। কারণ রাগ নিঃশেষ হয় না। তবে রিয়াযত ও মুজাহাদা ও সাহচর্য দ্বারা রাগের স্বভাবটা দুর্বল হয়। ফলে তখন সব জায়গায় রাগ আসে না বরং যথাস্থানে রাগ আসে এবং তা সীমালঙ্ঘন করে না।

এই হাদীসটি এখানে আলোচনা করার উদ্দেশ্য, মূলত ঐসব লোকের কথা প্রত্যাখান করা, যারা বলতে চায় পাহাড় স্বস্থান থেকে নড়তে পারে তবে

মানুষের স্বভাবে কোন ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে না। এই কথা শুনে মানুষ নিরাশ হয়ে যায় যে, আখলাক যখন আমার পরিবর্তন হবে না তো ইসলাহ কিভাবে হবে? সুতরাং যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে দাও। হযরত এখানে হাদীসের সহীহ্ অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাদীসের উদ্দেশ্য হল, জন্মগত স্বভাব সমূলে নিঃশেষ হয় না। তবে হ্যাঁ সাধনা ও বুযুর্গদের সাহচর্যে তা দুর্বল হয়ে যায়। যার ফলে তার খারাপ কাজে উৎসাহিত করাও কমে যায় এবং বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এ হাদীস থেকে একথা বুঝার কোনই সুযোগ নেই যে, মানুষ তার মন্দ স্বভাব সংশোধনের চেষ্টাই করবে না। বরং চেষ্টা করতে হবে এবং তাতে তার মন্দ স্বভাব দুর্বল হয়ে আয়ত্ত্বে চলে আসবে।

পঞ্চম মজলিস

বদনজর ও তার চিকিৎসা

বদনজর ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّابَعْدُ.

এক ব্যক্তি তার অবস্থা লিখেছেন—

> 'অন্তরে সার্বক্ষণিক কামচিন্তা জাগ্রত থাকে। গায়রে মাহরামদের দিকে তাকাতে সামন্যতম দ্বিধা হয় না।'
>
> (আনফাসে ঈসা-১৪৩)

একথা জনৈক ব্যক্তি তার দিলের অবস্থা জানাবার জন্য হযরত থানভী রহ. কে লিখেছেন। নিয়ম হল কোন শায়খের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করলে, তাকে নিজের সার্বিক অবস্থা জানানো জরুরী। কারণ যদি সে নিজের অবস্থা বলতে লজ্জাবোধ করে এবং গোপন রাখে তাহলে চিকিৎসা কীভাবে হবে? যেমন ডাক্তারের কাছে রোগী তার রোগের কথা গোপন রাখে না। কারণ গোপন রাখলে তার চিকিৎসা হবে? না। এমনিভাবে কোন শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক করলেও নিজের সব অবস্থা শায়খকে জানানো জরুরী। চাই তা যত লজ্জাজনকই হোক না কেন। যাতে শায়খ তার চিকিৎসা করতে পারেন। একথা চিন্তা করবে না যে, আমি যদি শায়খকে একথা লিখি তাহলে তো তার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা কমে যাবে বা আমার প্রতি তার খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে। মুরিদের প্রতি শায়খের খারাপ ধারণা হওয়া তো মুরিদের জন্য ক্ষতিকর।

মনে রাখবেন, আল্লাহ্ যখন কারো দ্বারা ইসলাহের কাজ নেন, তখন তার অন্তরে তিনি মাখলুকের প্রতি মায়া মমতা ও দয়া দান করে দেন। কেউ যদি তার খারাপ থেকে খারাপ কোন বিষয়ও শায়খকে লিখে তবুও শায়খের অন্তরে তার প্রতি খারাপ ধারণা আসে না বরং করুণা ও সমবেদনা সৃষ্টি হয়। যেমন পিতা মাতাকে দেখা যায় তাদের কোন সন্তান যদি প্রতিবন্ধি হয় তখন

তার প্রতি তাদের দয়া মায়া এত বেশি হয়, যা অন্য কোন সুস্থ সন্তানের প্রতি হয় না। দুনিয়ার সবাই ঐ বাচ্চাকে ঘৃণা করে, কিন্তু পিতা-মাতা তার জন্য উৎসর্গ এবং দিন-রাত তার সেবায় নিয়োজিত। তার মলমূত্র নিয়ে ব্যস্ত। তাই শায়খকে নিজের খারাপ অবস্থার কথা লিখতে এটা ভাববেন না যে, আমার প্রতি তার ধারণা খারাপ হবে। আর শায়খের খারাপ ধারণা আমার জন্য ক্ষতিকর হবে। বরং এমন মুরিদের প্রতি শায়খের দৃষ্টি ও মায়া মমতা অন্যদের তুলনায় আরো অনেক বেশি হয়।

মুরব্বীর সামনে নিজের দোষ প্রকাশ করা

আহ্‌লে ইলমের মনে অনেক সময় একটা প্রশ্ন জাগে যে, হাদীস শরীফে আছে, কেউ যেন তার গোনাহ্ অন্যের কাছে প্রকাশ না করে। যেমন আমি অমুক সময় অমুক গোনাহ্ করেছিলাম বা আমি অমুক গোনাহে কিংবা অমুক বাতেনি রোগে আক্রান্ত ইত্যাদি। একথা যেন কাউকে না বলে। শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই বলবে, হে আল্লাহ্! আমি এই গোনাহে লিপ্ত। তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং তা থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হাদীসের এই বিধান মুরব্বী ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে। অর্থাৎ, নিজের গোনাহ্ ও নিজের আধ্যাত্মিক রোগের কথা যে কাউকে বলবে না। তবে যিনি তার শায়খ ও মুরব্বী, যার তারবিয়াত ও তত্ত্বাবধানে সে নিজেকে সোপর্দ করেছে তার কাছে অবশ্যই তা বলতে হবে এবং প্রকাশ করতে হবে। মুরব্বীর কাছে প্রকাশ করা এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞায় পড়ে না। যেমন কোন মানুষের সামনে সতর খোলা জায়েয নেই। কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনে সতরের কোন অংশ যদি ডাক্তারকে দেখাতে হয় তখন রোগীর জন্য তা দেখানো এবং ডাক্তারের জন্য দেখা জায়েয।

এমনিভাবে নিজের গোনাহ্ কারো কাছে প্রকাশ করা জায়েয নেই। বরং গোপন রাখাই চাই। কারণ এই গোনাহ্ পচা দুর্গন্ধময়। তাই তা ঢেকে রেখে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা ইস্তেগফার কর। অহেতুক তার প্রচার-প্রসার করো না। কিন্তু যিনি তোমার শায়খ তার কাছে তা প্রকাশ করা জরুরী, যাতে

তিনি তার চিকিৎসা করতে পারেন। এ জন্য যিনি তোমার মুরব্বী হবেন চাই তিনি তোমার নিয়মতান্ত্রিক বাইয়াত গ্রহণ করা শায়খ হোন বা না হোন, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার ইসলাহ ও সংশোধনের সম্পর্ক স্থাপন করেছ। এবার তিনি তোমার শায়খ, উস্তাদ বা পিতা যেই হোন না কেন; তার কাছে তোমার আধ্যাত্মিক সব রোগের কথা বলা জরুরী। এটা হাদীসের নিষেধাজ্ঞায় পড়বে না। এই নীতির ভিত্তিতেই একজন হযরত থানভী রহ. কে লিখেছেন– 'কামচিন্তা সার্বক্ষণিক অন্তরে জাগ্রত থাকে। গায়রে মাহরামের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাতে সামান্যতম দ্বিধা হয় না।' এই গোনাহের ব্যাপকতা যেহেতু অনেক বেশি তাই হযরতের জবাব ও অনেক বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ হয়েছে। আশা করি তা সকলের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

নজরের হেফাজতে হিম্মতের প্রয়োজনীয়তা

তার উত্তরে হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন–

> 'এই গোনাহ এতই জঘন্য ও মারাত্মক যে এর প্রভাব যাবতীয় নেক কাজের সকল নূর অন্ধকার করে দেয়। এ জন্য এই রোগের চিকিৎসা খুব গুরুত্ব সহকারে করা চাই। এটা স্বাভাবিক যে, এই রোগের যে মৌলিক উৎস ও উপাদান আছে তা আল্লাহর সৃষ্টি এবং তা খারাপ কিছু নয়। বরং তাতে মানুষের অনেক উপকার ও কল্যাণ রয়েছে। তবে তার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হল খারাপ, যা নিজের ইচ্ছাধীন বিষয়। ইচ্ছাধীন বিষয়ের মোকাবেলাও ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে। বুঝা গেল এই কাজ থেকে বিরত থাকাও ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এখানে কেউ অক্ষম নয়। সুতরাং হিম্মত কর, কাজ হবে। এটাই এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। প্রথমে কিছু কষ্ট হবে তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে এবং এক পর্যায়ে স্বাদ ও আনন্দ অনুভব হবে।'
>
> (আনফাসে ঈসা-১৪৩)

মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন প্রথমে তাকে রোগের অবস্থা, রোগের ভয়াবহতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হতে হয়। তাহলেই তার

চিকিৎসার চিন্তা আসে। রোগ সম্পর্কেই যদি তার কোন ধারণা না থাকে যে, আসলে আদৌ এটা কোন রোগ কি না? বা রোগ হলে এর ক্ষতি কি? তাহলে সে চিকিৎসা কী করবে? এই জন্য প্রথম বাক্যে হযরত থানভী রহ. এ রোগের ভয়াবহতা আলোচনা করেছেন। বলেছেন 'এই গোনাহ্ এতই জঘন্য ও মারাত্মক যে এর প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় যাবতীয় নেক কাজের সকল নূর অন্ধকার করে দেয়।'

বদনজরে নেক কাজের নূর নষ্ট হয়ে যায়

এ থেকে তুমি অনুমান করতে পার যে, এই গোনাহ্ কত মারাত্মক। তুমি নামায পড়েছ, তাহাজ্জুদ পড়েছ, তারাবীহ্ পড়েছ, যিকির করেছ, তাসবীহ্ পড়েছ, কিন্তু এইসব আমল ও ইবাদতে যে নূর এবং বরকত অর্জিত হল, তা সব এই এক বদ আমলের কারণে অন্ধকার হয়ে গেল। এবং সকল ইবাদতের উপকার, স্বাদ ও নূরানিয়াত সব ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাজত করুন। ইবাদতের ফায়দা হল, মানুষ একটি নেক কাজের ফলে আরেকটি নেক কাজের দিকে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় নেক কাজটি তাকে তৃতীয় আরেকটি নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়। এভাবে সে তার জীবনের উন্নতি করে চলে। কিন্তু ইবাদতে যখন নূর না থাকে তখন তা বিস্বাদ হয়ে যায় এবং তার উপকারিতা কমে যায়।

আসলে আমরা তো ইবাদতের নূর ও স্বাদ সম্পর্কেই অবগত নই। তাহলে তা নষ্ট হওয়ার অনুভূতি আমাদের হবে কোত্থেকে? যার একবার এই নূর ও স্বাদ অর্জিত হয়েছে সেই অনুভব করতে পারে যে, এখন আমার সেই নূর ও স্বাদ হারিয়ে গেছে। আমাদের স্বভাব ও রুচি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ইবাদতের নূর সম্পর্কেও আমাদের কোন ধারণা নেই। যারা আল্লাহ্ওয়ালা তারা তা অনুভব করেন। যেমন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতভী রহ.-এর একটি ঘটনা লিখা হয়েছে যে, তিনি একদিন কোন লোকের দাওয়াতে গিয়ে খানা খেয়ে ফেললেন। তাঁর জানা ছিল না, যার ঘরে দাওয়াত তার উপার্জন হারাম। একজন মুসলমান দাওয়াত করেছেন তাই সরল বিশ্বাসে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরে জানা গেল তার উপার্জন

সন্দেহযুক্ত। তিনি বলেন, এই দাওয়াতের এমন কুপ্রভাব ছিল যে, অনেকদিন পর্যন্ত তার অন্ধকার আমার অন্তরে অনুভূত হয়েছে। তা এভাবে হয়েছে যে, অনেকদিন পর্যন্ত অন্তরে বিভিন্ন খারাপ ও বাজে চিন্তা-ভাবনা আসতে থাকল এবং না জায়েয কাজের প্রতি মনের আকর্ষণ হতে থাকল। মোটকথা! যে আল্লাহ্ ওয়ালাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত তাদের অন্তরে সামান্য আঁচড় লাগলেও তাদের মনে হয় যেন কেয়ামত এসে গেল।

بردل سالک ہزاراں غم بود ☆ گر زباغ دل خلالے کم بود

সালেকের হৃদয় উদ্যান থেকে যদি একটি কণাও ঝরে পড়ে তবে তাদের হৃদয় আকাশে যেন বিপদ মহাবিপদের তুফান ছুটে।

যেহেতু আমাদের স্বভাব ও রুচি নষ্ট হয়ে গেছে, তাই না আমাদের ইবাদতের স্বাদ ও নূর অনুভূত হয়! না তা হারাবার কোন খোঁজ খবর হয়।

প্রথম কথা হল, যেদিন কোন মানুষ বদনজরের গোনাহে লিপ্ত হবে সেদিন তার ইবাদতে নূর থাকবে না। এবং ঐ ইবাদতের দুনিয়াবী কল্যাণও সে পাবে না। এজন্য হযরত বলছেন, এই রোগের চিকিৎসা খুব গুরুত্বসহকারে করা চাই।

এরোগের মূল উৎস খারাপ নয়

এরপর তার চিকিৎসার ব্যাপারে হযরত থানভী রহ. বলেছেন– 'একথা স্বাভাবিক যে, এরোগের উৎস আল্লাহর সৃষ্ট এবং তা মন্দ কিছু নয়'। অর্থাৎ মনে কামচিন্তা আসা ও সম্ভোগেচ্ছা জাগ্রত হওয়া মূলত খারাপ কিছু নয়। কারণ এটি মানুষের জন্মগত ও সহজাত বৈশিষ্ট্য। কোন মানুষ তা থেকে মুক্ত নয়। এ জন্যই তা না থাকা দোষণীয়। তাই এই স্বভাবটি মৌলিকভাবে দোষণীয় নয়। বরং তাতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কারণ তার উপর ভিত্তি করেই মানব বংশের অস্তিত্ব রক্ষা পায় এবং তার উপরই দুনিয়ার নেজাম পরিচালিত। এ বৈশিষ্ট্য যদি মানব জাতিতে না থাকে তাহলে সারা বিশ্বই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে এই স্বভাবের নাজায়েয চাহিদায় সাড়া দেয়া এবং নাজায়েয দাবী পূরণ করা অন্যায়। অর্থাৎ, মৌলিকভাবে বৈশিষ্ট্যটাও

খারাপ নয় এবং তাতে চাহিদা সৃষ্টি হওয়াও খারাপ নয়; বরং তার নাজায়েয চাহিদা পূরণ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা খারাপ ও অন্যায়। পক্ষান্তরে তার জায়েয চাহিদার উপর আমল করা শুধু জায়েযই নয় বরং তা সওয়াবের কাজও বটে।

এ স্বভাবগত চাহিদার জায়েয ব্যবহারে সওয়াব রয়েছে

হাদীস শরীফে এসেছে, কোন ব্যক্তি যদি ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীর প্রতি মুহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রতি মুহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং এ কারণে তাদেরকে সওয়াব দান করেন। তাই এই স্বভাবগত চাহিদার জায়েয ব্যবহারের উপর সওয়াব পাওয়া যায়। শুধু তার অন্যায় ব্যবহার বা অন্যায় চাহিদার উপর আমল করা খারাপ। আর তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা যেহেতু ইচ্ছাধীন তাই তার মোকাবেলা করা এবং অবৈধ চাহিদা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকাও ইচ্ছাধীন। এটা কারো ইচ্ছার বাইরে নয় এবং এতে কেউ অপারগও নয়। সুতরাং হিম্মত কর এবং কাজ আরম্ভ কর এটাই এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। প্রথমে কিছু কষ্ট হবে, তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে এবং স্বাদ পাবে, আনন্দ পাবে।

এই রোগের চিকিৎসা হলো হিম্মত করা

এই কথা বলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, এই গোনাহের এমন কোন ঔষধ নেই, পানি দিয়ে যা গিলে ফেললে চিকিৎসা হয়ে যাবে। তারপর অন্তরে কোন গোনাহের চাহিদা হবে না। এবং এমন কোন মন্ত্রও নেই যা পড়ে ফুঁক দিলে আর কোন গোনাহের বাসনা জাগবে না। এমন কিছুই নেই। প্রথমে বলেছেন, এই স্বভাব মৌলিকভাবে খারাপ বা দোষণীয় নয় এবং তার জায়েয চাহিদা পূরণ করাও অন্যায় বা খারাপ নয়। হাঁ! তার অন্যায় চাহিদা পূরণ করা গোনাহ। আর তার চাহিদা পূরণ করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। সুতরাং যে কাজ করা ইচ্ছাধীন এবং তা ত্যাগ করাও ইচ্ছাধীন। আর ইচ্ছাধীন কাজের জন্য হিম্মতের প্রয়োজন। হিম্মতকে ব্যবহার করতে হবে এবং হিম্মত করেই কাজ করতে হবে।

কখনো এমন মনে হয় যে, আমি যদি এই কাজ ছেড়ে দেই তবে তো আমার জান বের হয়ে যাবে। আমি কখনো এ কাজ ছাড়তে পারব না। যুক্তিতে যদিও বুঝে আসে যে, এটা ইচ্ছাধীন কিন্তু বাস্তবতার দিকে তাকালে মনে হয় তা অসম্ভব এবং ইচ্ছাশক্তির উর্ধ্বে। তা ছাড়লে মনে হয় যেন আমার উপর কেয়ামত এসে যাবে। পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। এ অবস্থায় কীভাবে বলা যায় এটা আমার ইচ্ছাধীন ব্যাপার?

অভ্যাস পরিত্যাগের কষ্ট আপেক্ষিক বিষয়

আসলে যতগুলো বিষয় মানুষের ইচ্ছাধীন সেগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও চাহিদা এবং সেগুলো পরিত্যাগ করার কষ্ট সম্পূর্ণ আপেক্ষিক বিষয়। এগুলোর বাস্তবসম্মত কোন অস্তিত্ব বা পরিমাণ নেই। এজন্য তাতে একজনের কষ্ট কম হয় অন্যজনের কষ্ট বেশি হয়। এক কাজ ছাড়তে একজনের অনেক কষ্ট হয়। আবার দ্বিতীয়জনের কষ্ট অনেক কম হয়, তৃতীয়জনের আরো কম এবং চতুর্থজনের আরো কম হয়। সুতরাং বুঝা গেল কোন কাজ ইচ্ছাধীন হওয়া না হওয়া তো সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত বিষয়, কিন্তু ইচ্ছাধীন একটা কাজ ছাড়তে যে কষ্ট হয় তা একেবারে আপেক্ষিক বিষয়, যা ব্যক্তির ব্যবধানে কম বেশি হয়। এজন্য কোন একটা কাজ পরিত্যাগ করাকে একজন নিজের জন্য অনেক কঠিন ব্যাপার মনে করে অপরজন তা খুব সহজ ব্যাপার মনে করে। যদি কোন কাজ তুমি বার বার করতে করতে নিজেকে তাতে অভ্যস্ত করে ফেল, তাহলে তা ছাড়া তোমার জন্য অনেক কষ্টকর হবে। যে কাজ ছাড়া মূলত কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু স্বেচ্ছায় তা বার বার করে নিজকে তাতে অভ্যস্ত করে ফেলার কারণে নিজের ক্ষেত্রে তুমি তা কঠিন করে ফেলেছ। নিজেই নিজের উপর কঠিন করে এখন বলছ তা আমার ইচ্ছাধীন নয়। আমি তা ছাড়তে অক্ষম। আরে ভাই! যেভাবে তুমি তা করতে করতে করাটাকে অভ্যাসে পরিণত করেছ সেভাবে ছাড়তে ছাড়তে ছাড়াটাও তোমার অভ্যাসে পরিণত করতে পার।

দেখ বিড়ি, সিগারেট, পান, গুল ইত্যাদি যদি তুমি প্রথম কাউকে খাওয়াও তো তার মাথা ঘোরাবে। বমি আসবে। তখন যদি তাকে বল! সাবধান

ভবিষ্যতে কখনো এগুলো স্পর্শ করবে না। সে বলবে, তাওবা তাওবা আমি আর জীবনে এগুলোর কাছেও যাব না। সঙ্গে সঙ্গেই সে তা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। বরং খাওয়ার পরিবর্তে ছেড়ে দেয়াই সে ভাল ও সহজ মনে করবে। কিন্তু তুমি যদি দ্বিতীয় দিন তাকে আবার খাওয়াও তাহলে প্রথম দিনের চেয়ে কষ্ট কম হবে। তৃতীয় দিন খাওয়ালে কষ্ট আরো কম হবে। এভাবে যদি খাওয়াতে থাক তাহলে এক পর্যায়ে তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এখন আর এটা তার থেকে ছাড়ানো যাবে না।

چھوٹی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی

এই অবাধ্য নফস কোনভাবেই কোন কথাই শুনছে না।

এক পর্যায়ে তা এমন অভ্যাসে পরিণত হবে যে, তখন তাকে তা ছাড়তে বললে যেন তার উপর কেয়ামত হয়ে যাবে। এবার বল, এই তামাক বা ধূম্র কি তার জীবনের এমন কোন অনুসঙ্গ ছিল যা পরিহার করা কোন কঠিন কাজ? কখনো এমন ছিল না। বরং সে নিজের ইচ্ছায়ই এমন অভ্যাস গড়েছে এবং সহজ বিষয়কে কঠিন বানিয়ে নিয়েছে। এমন অভ্যাস বানিয়েছে যে, তা যেন এখন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। যার ফলে এখন তা পরিহার করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কাজটা মূলত কঠিন কিছু ছিল না। বরং স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে সে নিজেই কঠিন বানিয়েছে। সুতরাং যেমনি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করে করে পরিহার করাকে কঠিন বানিয়েছ তেমনি এখন তা স্বেচ্ছায় পরিহার করে করে সহজও করতে পার। এবং এভাবে ধীরে ধীরে তা পরিহার করার অভ্যাস করলে এ অভ্যাস অবশ্যই ছুটেও যাবে।

আরবদের 'কাহওয়া'

আরবদর মধ্যে 'কাহওয়ার' (কফি জাতীয় পানীয় বিশেষ) খুব প্রচলন আছে। আমি যখন ছোট ছিলাম, দারুল উলূম নানকওয়ারায় কাফিয়া ও কুদুরী কিতাব পড়তাম। তখন কাতারের এক শায়খ করাছি আসলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কিছু ছাত্র যাচ্ছিল। আমিও তাদের সাথী হয়ে গেলাম।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম প্রথমে তিনি আমাদেরকে কাহ্ওয়া দিয়ে মেহমানদারী করলেন। এর আগে আমি কখনো কাহ্ওয়া খেয়েও দেখিনি চেখেও দেখিনি। যখন ছোট ছোট পেয়ালায় করে সবার সামনে কাহ্ওয়া রাখা হল, তখন মনে মনে ভাবছিলাম এ সম্ভবত খুব মিষ্টি এবং সুস্বাদু হবে। কিন্তু যখন তাতে মুখ লাগালাম তো এত তিতা লাগল যে, ঢোক গিলাই মুশকিল হয়ে পড়ল। আমার এখনো স্মরণ আছে তখন আমার মাথাব্যাথা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, মুখে দেয়া এক ঢোক কাহ্ওয়া কিভাবে সামাল দিব। চিন্তা হল, হে আল্লাহ্ আরবের লোকেরা এই কাহ্ওয়া সবসময় খেতে থাকে আর আমি কিনা এক ঢোকও গিলতে পারছি না! যাই হোক! তখনই প্রথমবারের মত কাহ্ওয়া পান করলাম। কিন্তু পরে যখন আরবদের সঙ্গে ওঠা বসা শুরু হল, আর সেখানে তো কাহ্ওয়া সব সময়ই চলতে থাকে আমিও সামান্য সামান্য পান করতে আরম্ভ করলাম। ফলে এখন সেই কাহ্ওয়া এতই মজাদার হয়ে গেল যে তার সব তিক্ততা যেন চলেই গেছে। এখন তাতে মজা ছাড়া আর কিছুই নেই।

যায়তুনের তিক্ততা

১৯৬৩ সালে বুঝ হওয়ার পর প্রথম যখন সউদী আরব গেলাম তখন জিদ্দায় এক বাজারে যাচ্ছিলাম। এক দোকানে দেখলাম প্লেটে যায়তুন রাখা এবং সেই যায়তুন থেকে তেলও বের হয়ে আছে। যায়তুনের নাম কুরআনে পড়েছি, কিন্তু কখনো তা খাইনি এবং দেখিওনি। প্রশংসা শুনেছি যে, যায়তুন খুব মজাদার ফল। মাথায় ছিল এই যায়তুন খুব মিষ্টি হবে দেখেও মনে হল সম্ভবত এটা খুব মিষ্টি হবে। তাই যায়তুন কিনলাম এবং মিষ্টি মনে করে মুখে দিলাম। কিন্তু মুখে দেয়ামাত্র এমন তিক্ত মনে হল যে, গিলাই মুশকিল হয়ে গেল। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেলো এবং এখন তো তা এত মাজাদার মনে হয় যার কোন হিসাব নিকাশ নেই।

যাইহোক! তো এই যে, আমরা বলি এই অভ্যাস ছেড়ে দেয়া যদিও যুক্তির দিক থেকে সম্ভব মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তা আমার ইচ্ছার বাইরে চলে

গেছে। এটা আসলে এজন্যই অসম্ভব মনে হয় যে, আমি নিজেই এমন একটি কাজ করতে করতে আমার অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছি যা বাস্তবায়ন করা এবং ত্যাগ করা উভয়ই আমার ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় মনে হয় এটা ত্যাগ করা খুবই কঠিন। তবে যখন তুমি একবার ছাড়ার ইচ্ছা করবে এবং পূর্ণ হিম্মত ও সংকল্পের সঙ্গে তা করে ফেলবে এবং এভাবে করতে থাকবে তখন দেখবে এ অভ্যাস এমনভাবে ছুটে যাবে যে, তোমার মনেও থাকবে না, কখনো তোমার এ অভ্যাস ছিল।

যে কোন কাজ পরিহার করা ইচ্ছাধীন বিষয়

এই জন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, এমন মনে করো না যে, এ কাজ পরিহার করা তোমার ইচ্ছার বাইরে, বরং তা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছাধীন বিষয়। শুধু হিম্মতের প্রয়োজন। হিম্মতের সঙ্গে কঠিন সংকল্প করে ফেল যে, আমাকে এটা ছাড়তেই হবে। চাই আমার অন্তরে করাত চলুক, চাই আমার উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ুক, তবুও আমি তা ছাড়বই। এভাবে চেষ্টা করলে প্রথমে কিছুদিন কষ্ট হবে, কঠিন হবে, যখন ধীরে ধীরে এ অভ্যাস শেষ হয়ে যাবে। তখন যদি অন্তরে কখনো সেই কাজের ইচ্ছা জাগে তবুও তা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন হবে না। বরং এক পর্যায়ে ঐ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এমন স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হবে যে, তার পরিবর্তে ঐ কাজ করার স্বাদ ও আনন্দ নিতান্তই তুচ্ছ ও ঘৃণ্য মনে হবে।

চর্মরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চুলকানোর মজা

হযরত থানভী রহ. এই গোনাহের মজার একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। কারো শরীরে যদি চর্মরোগ-খুজলি হয় তাহলে তার চুলকাতে খুব মজা লাগে। একটি প্রবাদ আছে দুনিয়াতে দু'টি কাজে মজা আছে। এক. খাজ মেঁ এক রাজ মেঁ অর্থাৎ, একটি মজার কাজ হল চুলকানো, আরেকটি হল, রাজত্ব করা। এই যে, এত মজার চুলকানি। কিন্তু তার পরিণাম হল যত চুলকাবে ততই তা যখম হবে। এবং খুজলি তত বেড়ে যাবে, রোগ তত বড় হয়ে যাবে। এবার ডাক্তার তাকে বলবে, শরীর চুলকাবে না, এতে তোমার রোগ বাড়বে। কিন্তু সে বলে, চুলকানো থেকে বিরত থাকা আমার সধ্যে

নেই। ডাক্তার বলেন, দেখ! তোমার রোগের চিকিৎসা চুলকানো বন্ধ করার উপর নির্ভর করে। এখন সে চুলকানো বন্ধ করে । তবে বন্ধ করতে তার অনেক কষ্ট হয় পেরেশানী হয়। চুলকানি ওঠে, মন চায় খুব চুলকায়, কিন্তু জবরদস্তি নিজেকে বিরত রাখে। এতে প্রথমে তার অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু নিয়মিত বিরত থাকতে থাকতে যখন অভ্যাস হয়ে যায়, তখন আর বিরত থাকা তার জন্য কষ্টকর হয় না। এক পর্যায়ে যখন তার চর্মরোগ শেষ হয়ে যায় তখন সে সুস্থ হয়ে যায়। আর এই সুস্থতার স্বাদ ও আনন্দের তুলনায় চুলকানির আনন্দ তার কাছে তুচ্ছ ও ধোঁকা মনে হয়। কারণ চর্মরোগে চুলকানোর মজা আসলেও মিথ্যা ও অবাস্তব ছিল। আর এখনকার সুস্থতার স্বাদ ও আনন্দ হল প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ। যাতে কোন ধোঁকা নেই।

বদনজরের মজা পরিহার কর

এমনিভাবে বদনজরে যে মজা পাওয়া যায় তা চর্মরোগের চুলকানির মত। তা ছাড়তে কষ্ট অবশ্যই হবে। কিন্তু কিছু সময় কষ্ট করার পর যখন অভ্যাস হয়ে যাবে এবং দৃষ্টি পবিত্র হয়ে যাবে; তাকওয়া তাহারাতের স্বাদ পেয়ে যাবে তখন তার কাছে সেই গোনাহের স্বাদ তুচ্ছ ও ঘৃণ্য হয়ে যাবে। কারণ তার কোন বাস্তবতা নেই। আর গোনাহ থেকে বাঁচার মধ্যে একদিকে সুস্থতার স্বাদ অন্যদিকে এই চিন্তা ও অনুভূতির আনন্দ যে নফসের একটি কামনা আমি আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদের জন্য কুরবান করেছি। কারো সঙ্গে যখন সত্যিকারের ভালোবাসা হয় তখন তার সামনে নিজের কামনা বাসনাকে পদদলিত করে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। কারণ তখন তার মানসিকতা থাকে—

جان دی دی ہوئی اس کی تھی ☆ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

প্রাণ দিয়েছি কিন্তু তা তো তাঁরই দান। সত্য কথা হল তাঁর হক আদায় হয়নি।

অন্য এক জায়গায় হযরত থানভী রহ. বলেন, এমন সময় মানুষের দু'টি কাজ করা চাই। প্রথমত নিজের হিম্মতকে কাজে লাগিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ

গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত হিম্মতে শক্তি সঞ্চারের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে হে আল্লাহ! আমার হিম্মত কম, আমি দুর্বল। আমি এখন থেকে সংকল্প করছি, আমার এ দৃষ্টি অন্যায় জায়গায় ফেলব না কিন্তু আমারই বা কি মূল্য আছে আর আমার হিম্মত ও সংকল্পেরই বা কি শক্তি আছে? হে আল্লাহ! আমার হিম্মত আমার সংকল্প সবই তো তোমার হাতে; তোমার কুদরতের কব্জায়। হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমার হিম্মতে শক্তি দাও এবং এই সংকল্পে আমাকে অবিচল থাকার তাওফীক দান কর। হে আল্লাহ! আমার মধ্য থেকে এই অনিষ্ঠতা দূর করে দাও। সাথে সাথে এই দোয়া করবে–

اِن لَّاتَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ

(হে আল্লাহ, তুমি যদি আমার থেকে তাদের (নারীদের) ফাঁদ সরিয়ে না নাও তবে তো আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাব এবং আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।-সূরা ইউসুফ..)

বান্দা যখন এই দোয়া করে তখন আল্লাহ তাকে হিম্মত ও শক্তি দান করেন এবং সে এই গোনাহ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে– مَنِ اسْتَعَفَّ يُعِفُّهُ اللّٰهُ যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত এবং তাওফীক দান করুন। আমীন।

হিম্মতে শক্তি সঞ্চারের উপায়

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ.কে লিখেছেন–

"হযরতের কথায় তো বুঝলাম যে, বদনজর মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ এবং তার চিকিৎসাও ইচ্ছাধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে ইচ্ছা প্রয়োগের হিম্মত হয় না। গোনাহ হয়ে যায়। হিম্মতে কোন শক্তি নেই।"(আনফাসে ঈসা-১৪৪)

এটা এমন একটা ব্যাপক অবস্থা কোন না কোন গোনাহের ব্যাপারে শতকরা নিরানব্বইজন যার সম্মুক্ষীন হয়ে থাকে। জানা আছে যে, এটা বর্জন

করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার, কিন্তু তবুও ছাড়ার হিম্মত হয় না এবং হিম্মতে শক্তি পাওয়া যায় না। যেমন কবি গালেব বলেন–

جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد ☆ پر طبیعت ادھر نہیں آتی

যুহুদ ও ইবাদতের সওয়াব জানি। তবুও মন সেদিকে এগোয় না যে!

অর্থাৎ, যৌক্তিকভাবে বুঝে আসে যে, এই রাস্তা ভাল, এই রাস্তা মন্দ। আর এতে বিশ্বাসও আছে। কিন্তু মন যে সেদিকে আগ্রহী হয় না। এর কী চিকিৎসা হবে?

হিম্মত প্রয়োগে শক্তি বৃদ্ধি পায়

তার উত্তরে হযরত বলেন–

'হিম্মত প্রয়োগে মাধ্যমেই শক্তি সঞ্চারিত হয়'।

আগে থেকেই একথা ভাবলে হবে না যে, হিম্মত যখন দুর্বল। তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি। বরং হিম্মতকে কাজে লাগাও। এবং তা যত কাজে লাগতে থাকবে ততই তাতে শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

দুনিয়ার অধিকাংশ জিনিস এমন যে, তা যত ব্যবহার করবে ততই ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। যে গাড়ী তুমি যত ব্যবহার করবে ততই তা দুর্বল হতে থাকবে। এক পর্যায়ে তা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যাবে। ঘর যত ব্যবহার করবে তত তা পুরাতন হতে থাকবে। কাপড় যত ব্যবহার করবে তত তা পুরাতন হতে থাকবে। কিন্তু কিছু জিনিস আল্লাহ এমন বানিয়েছেন যে, সেগুলো যত ব্যবহার করবে ততই শক্তিশালী হতে থাকবে। যেমন, স্মৃতিশক্তি। স্মৃতিশক্তিকে তুমি যত কাজে লাগাবে ততই তা শানিত ও শক্তিশালী হতে থাকবে। কেউ যেন এমন না ভাবে! যে আমি যদি পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে ফেলি তাহলে আর অন্য কিছু মুখস্থ করার সুযোগ থাকবে না। কারণ বিষয়টি এমন নয়। বরং এর দ্বারা তার মধ্যে স্মৃতিশক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। তেমনি হিম্মতও এমন জিনিস যা মানুষ যত কাজে লাগাবে ততই তা শক্তিশালী হবে। আল্লাহ তাতে আরো শক্তি দান করবেন।

সৌন্দর্য প্রিয়তার চিকিৎসা

এক ব্যক্তি হযরতকে লিখেছেন,

"আমার মধ্যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা এত বেশি যে, খুব সামান্য একটি জিনিসও অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে রাখি। আর সুন্দর চেহারার প্রতি সে কি এক অসীম আকর্ষণ।"

হযরত এই প্রশ্নের উত্তর আরবীতে লিখেছেন, যাতে বোঝা যায় প্রশ্নকারী আলেম ছিলেন। হযরত লিখেছেন–

بَعْضُهٗ خَيْرٌ فَاشْكُرُوْا عَلَيْهَا ، وَبَعْضُهٗ شَرٌّ فَاصْبِرُوْا عَنْهَا ، أَیْ غَضَّ الْبَصَرَ حَيْثُ أَمَرَالشَّارِعُ بِالْغَضِّ ، وَلَوْ بِتَكَلُّفٍ شَدِيْدٍ يَحْتَمِلُ زُهُوْقَ الرُّوحِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ غَيُوْرٌ يَشْتَدُّ غَيْرَتُهٗ مِنَ النَّظَرِ إِلٰى مَانَهَى اللّٰهُ أَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَنْ يَغِيْظَ الْمَحْبُوْبُ الاكْبَرُ

অর্থাৎ, তুমি যে অবস্থার কথা লিখেছ, তার কিছু অংশ ভালো। তা হল আল্লাহ্ তোমাকে ভালো জিনিসের প্রতি আকর্ষণ দান করেছেন। এতে তার হক আদায় করার তাওফীক হয়। সুতরাং এর উপর আল্লাহ্র শোকর আদায় কর। আর কিছু অংশ খারাপ। তা হ্ল সুন্দর চেহারার প্রতি আকর্ষণ, যা দেখা না জায়েয। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ কর এবং দৃষ্টি অবনত রাখ যদিও মনে হয় তাতে জান বেরিয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ্পাক অত্যন্ত গায়রতওয়ালা (আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন)। আর বান্দা যখন এমন জিনিসের দিকে তাকায় যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন তখন তার খুব গায়রত হয়। তোমার মধ্যে যখন সৌন্দর্যপ্রিয়তা আছে এবং সৌন্দর্য তোমার খুব ভালো লাগে তাহলে সকল সৌন্দর্যের আধার তো হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা। তিনিই তো সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে বড় প্রিয়তম, তিনিই তো তোমার সর্বেসর্বা ও সবকিছু। তাহলে এই দুনিয়ার তুচ্ছতম সৌন্দর্যের জন্য তাঁকে তুমি অসন্তুষ্ট করবে! এ কেমন কথা। তোমার কি সমান্যতম আত্মমর্যাদাবোধও নেই।

হারাম কাজের কুমন্ত্রণা ও তার চিকিৎসা

একজন লিখেছেন–

'শয়তান এভাবে বুঝায় যে, এই আকর্ষণীয় চেহারা সুরত যদি জায়েয ভাবে তোমার অধীনে আসে তখন তুমি কি করবে, সুতরাং সেই জায়েয অবস্থার কথা ভেবেই তার রূপ সৌন্দর্য উপভোগ কর। হারাম কাজের কথা ভেবে নয়।'

(আনফাসে ঈসা-১৪৫)

হযরত তার জবাবে লিখেছেন–

'খেয়াল বা চিন্তার চিকিৎসাও চিন্তা করা। (অর্থাৎ এই খারাপ চিন্তার চিকিৎসাও হল দ্বিতীয় আরেকটি চিন্তা। তা হল) তখন এই চিন্তা করবে যে, যদি ঐ নারীর স্বামীকে আমি আমার এ চিন্তার কথা জানিয়ে দেই তাহলে তা কেমন লজ্জাজনক ব্যাপার হবে? (তাকে যদি বলে দেই যে, আমি কোন নাজায়েয চিন্তা করছি না। বরং আমি ভাবছি তুমি যদি মরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার জায়েয সম্পর্ক হল... ইত্যাদি। তাহলে তা কত লজ্জাজনক ব্যাপার হবে?) কিন্তু আল্লাহ তোমার বলা ছাড়াই তোমার মনের এই খবর জানেন। তাহলে আল্লাহর কাছে এটা কেমন লজ্জার কথা। এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নামের আযাবের কথাও চিন্তা করতে থাকবে। অথবা নফসকে সম্বোধন করে বলবে, যেমনিভাবে তুমি অন্যের স্ত্রী থেকে স্বাদ গ্রহণের কথা বলছ তেমনি কেউ যদি তোমার স্ত্রী থেকে স্বাদ গ্রহণ করে এবং তুমি তা জানাতে পার তখন কী করবে? উত্তর স্পষ্ট যে, তুমি তার সঙ্গে লড়াই-সংঘাতের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাহলে অন্যের কি এমন আত্মমর্যাদা বোধ জাগতে পারে না? সে যখন তোমার এ ঘৃণ্য চিন্তার কথা জানবে তখন সেও তোমার সঙ্গে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে না? তারপর জাহান্নামের কথা চিন্তা করবে।

উপরন্তু শয়তানের এই ধোঁকা ও প্রতারণা অনেকটা এমনই যেমন না কি কেউ বাস্তবেই কোন নারীর সঙ্গে নাজায়েয কাজে

লিপ্ত হয় আর মনে মনে চিন্তা করে যে, কখনো যদি তার সঙ্গে আমার জায়েয সম্পর্ক হয় তাহলে তার সঙ্গে আমি এরকম করব। আর এটা যে হারাম তাতে তো সামান্যতম সন্দেহও নেই। তদ্রূপ অন্তরের ব্যভিচারেরও ঠিক একই হুকুম।"

(আনফাসে ঈসা-১৪৫)

হযরত থানভী রহ. তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, উপরোক্ত কুমন্ত্রণা যখন অন্তরে আসবে তখন সে এটা চিন্তা করবে যে, আমার স্ত্রী বোন বা মেয়ের ব্যাপারে যদি কেউ এরকম চিন্তা করে তাহলে আমার কি আত্মমর্যাদাবোধ জাগবে না? এবং আমি কি তার সঙ্গে সংঘাত-প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব না?

রাসূল ﷺ-এর কাছে ব্যাভিচারের অনুমতি প্রার্থনা

মাজমাউয যাওয়ায়েদ নামক কিতাবে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরজ করল 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার যে কোন নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত, তবে আমি আপনার কাছে একটি অনুমতি চাচ্ছি। তা হল আমি ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকতে পারছি না আমাকে তার অনুমতি দিন।'

চিন্তা করে দেখুন লোকটি কি কাজের অনুমতি চাচ্ছে? এবং কার কাছে চাচ্ছে? সরদারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে টেনে আনলেন এবং কাঁধে হাত রেখে বললেন, আচ্ছা বল তো! যে নারীর সঙ্গে তুমি ব্যভিচার করতে চাচ্ছ, সে কারো মা কি না? কারো বোন কি না? কারো মেয়ে কি না? কারো খালা কি না? যদি অন্য কোন মানুষ তোমার বোনের সঙ্গে এই কাজ করতে চায় তুমি তা পছন্দ করবে? সে বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবার বললেন কেউ তোমার মেয়ের সঙ্গে এই কাজ করতে চাইলে তুমি তা পছন্দ করবে? সে বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ। কেউ তোমার স্ত্রীর সঙ্গে এমন করতে চাইলে তা তুমি পছন্দ করবে? কেউ তোমার খালার সঙ্গে এমন করতে চাইলে তুমি তা পছন্দ করবে? সে বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন অন্যদের এই কাজ তুমি সহ্য করবে না এবং এ কারণে তোমার কষ্ট হবে, তাহলে সেই কাজই তুমি অন্যের বোনের সাথে করতে চাচ্ছ? তাদের কি

তাহলে কোন কষ্ট হবে না ? তারা কি তা সহ্য করে নিবে? তারপর এই লোক বলছে, যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলাম তখন আমি চিন্তা করছিলাম মুসলমান হতে আমার সবচেয়ে বড় বাধা হল যিনা পরিত্যাগ করা। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শোনার পর এই বদ আমলের প্রতি এমন ঘৃণা জন্মাল যে পরে আর কখনো তার প্রতি কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি।

প্রয়োজনীয় কাজে নারীদের সম্মুখীন হওয়া

এক ব্যক্তি লিখেছে,

> 'কিছু জায়গা এমন আছে যেখানে পুরুষকে নারীদের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন নারীদের ব্যবহার্য জিনিষ-পত্র বিক্রেতা, অলঙ্কার ব্যবসায়ী, হাসপাতালের ডা. কমকর্তা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যা হয়। এসব ক্ষেত্রে বদনজর থেকে বাঁচার উপায় কি হতে পারে জানালে কৃতজ্ঞ হব।'

এ জাতীয় লোকেরা আসলেও বড় বিপদে থাকে। কারণ সর্বদাই তাদেরকে নারীদের সম্মুখীন হতে হয়। যার কারণে বদনজর থেকে বাঁচা কঠিন হয়। তবে আল্লাহ মানুষকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দেননি যার উপর আমল করা অসম্ভব।

প্রথম কথা এটা বুঝে নাও যে, কোন নারীকে এমনিতেই শুধু দেখা এবং তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া মূলত গোনাহের কাজ ছিল না। বরং দৃষ্টি দেয়া তখন গোনাহ যখন তা ভোগ করার উদ্দেশ্যে হয় বা বাস্তবে ভোগ করা হয়। এ কারণেই যদি কোন কাজের ক্ষেত্রে পর নারীর সাথে কথা-বার্তার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তাতে ভোগের ইচ্ছা না থাকে এবং কার্যতও ভোগ না করে তাহলে এই দেখা হারাম নয়। কিন্তু এটা নির্ণয় করা যেহেতু কঠিন কাজ যে, কোথায় ভোগের ইচ্ছা আছে আর কোথায় নেই কিংবা কার্যত কখন ভোগ হয়ে যাচ্ছে আর কখন হচ্ছে না, এজন্য সরাসরি বেগানা নারীদের দিকে তাকাতেই নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। এবং একারণেই কুরআনে কারীমেও চোখ অবনত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ জায়েয নাজায়েয ক্ষেত্র নির্ণয় যেহেতু অনেক কঠিন তাই সহজ উপায় হল কখনো সেদিকে দৃষ্টিই ওঠাবে না।

ইচ্ছা করে তাকাবে না

যেসব লোককে প্রায়ই নারীদের, সম্মুখীন হতে হয় তাদের প্রতি প্রথম নির্দেশ হল, তোমরা দৃষ্টি অবনত রাখ। কারণ তাদের সঙ্গে জরুরী কাজ সারার জন্য তাকানো জরুরী নয়। অনেক মানুষকে আমি নিজে দেখেছি তারা কাজ করতে থাকেন কিন্তু তাদের দৃষ্টি উপরে ওঠে না। দৃষ্টি নিচে রেখেই তারা কাজ সেরে নেন। যদি অগত্যা কখনও দৃষ্টি উঠাতেই হয় তবে তা ভোগ থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখবে। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করবে; হে আল্লাহ, আমাকে হেফাজত করুন। আর যদি কখনো ভোগের ইচ্ছা এসে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা ও ইস্তেগফার করবে।

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর মুজাহাদা

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. হোমিও ডাক্তার ছিলেন। তিনি চেম্বার করতেন। হযরত থানভী রহ.-এর অনুমতিতে চেম্বার শুরু করেছেন। প্রথমে তিনি ওকালতি করতেন। যখন চেম্বার আরম্ভ করলেন তখন সেখানে নারী, পুরুষ সবই আসতে লাগল। হযরত বলেন– প্রথমে আমি কোন কোন সময় চিকিৎসা করার জন্য রোগীর বাসায়ও যেতাম। একবার আমাকে এক বাসায় ডাকা হল। সেখানে রোগী ছিল এক মহিলা। সেখানে গিয়ে দেখলাম পোষাকে তার পূর্ণ শরীরও ঢাকা নেই। খুব পেরেশান হলাম। ইয়া আল্লাহ! এ কোন মসিবতে পড়লাম। এখন আমার কি হবে? অবশ্য আল্লাহ হেফাজত করলেন।

পরে আমি হযরত থানভী রহ. কে চিঠি লিখলাম। হযরত! আমি আগে আইন পেশায় জড়িত ছিলাম। সেখানেও অন্য ধরনের ফেতনা ছিল। আর এই ডাক্তারীতে আরেক ধরনের ফেতনা। সবসময় মহিলাদের সম্মুখীন হতে হয়। আমি এখন কি করব? আমার চিঠির জবাবে হযরত দুটি মাত্র কথা লিখলেন। হযরত লিখলেন 'আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করে আপনার অন্তর ও আপনার দৃষ্টি হেফাজত করুন। আমিও দোয়া করছি' হযরত (আরেফী রহ.) বলেন, এই চিঠি পেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে চেম্বারে বসলাম, এর ফল এই দাঁড়াল যে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার অন্তর এ বিষয়ে যেন পাথর হয়ে গেল।

হযরত (আরেফী রহ.) আরো বলেন, প্রথমে আমার চিন্তা হল, দৃষ্টি অবনত রাখা বিশেষত যখন কোন নারী সামনে এসে পড়বে তখন তো অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। তাই ভাবলাম, আমি তো সবসময় দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস করে নিতে পারি। সামনে চাই পুরুষ থাকুক বা নারী, আমি সবার সঙ্গেই দৃষ্টি নত রেখে কথা বলব। ফলে আমি অনেক মাস পর্যন্ত অনুশীলন করলাম। সামনে পুরুষ হোক আর নারী, কখনো দৃষ্টি উঠিয়ে দেখতাম না। যার সঙ্গেই কথা বলতাম দৃষ্টি নত রেখে কথা বলতাম। যার ফলে এখন আমার খবরই হয় না যে, আমার সামনে পুরুষ বসা আছে না নারী বসা আছে। বৃদ্ধ বসা না জোয়ান। সুতরাং আমাদের বাঁচার পথ একটাই। তা হল দৃষ্টি অবনত রাখা।

হিম্মতের উপর আল্লাহর সাহায্য আসে

আসলে মানুষ যখন এসব জিনিসে জড়িয়ে পড়ে তখন তা থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য অনেক কঠিন মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ যখন কাউকে এমন বিপদে ফেলেন তখন তার জন্য সহজ পথও খোলা রাখেন। এমন হয় না যে, তিনি বান্দার সাহায্য সহযোগীতা বন্ধ করে দেন। বান্দা যদি গোনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছা করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সামান্য হিম্মত করে পা বাড়ায়, তাহলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস– এমন বান্দাকে আল্লাহ কখনো অসহায়ভাবে নি:স্ব ছেড়ে দিবেন না ইনশাআল্লাহ। কিন্তু মানুষ যদি বাঁচার ইচ্ছাই না করে এ নিয়ে কোন চিন্তাই না করে; গাফলতের ঘোরে ঝিমায় আর বলে, আমি তো এমন জায়গায় আটকা পড়েছি যে, এখান থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কারণ সবসময়ই মহিলাদের সম্মুখীন হতে হয়। তারাই সামনে আসে, আমি কি করব? তাহলে কিছুই হবে না। কারণ এসব হল উদাসীনতা লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা। এ অবস্থায় আল্লাহর সাহায্যের কোন অঙ্গিকার নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে সাহায্য করুন এবং এই গোনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত ও তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ষষ্ঠ মজলিস

গীবত ও তার চিকিৎসা

গীবত ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ،وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّابَعْدُ.

এ পর্যন্ত বদনজর ও তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। সামনে আরেকটি আধ্যাত্মিক রোগ গীবতের আলোচনা আসছে। এটা এমন এক রোগ যা থেকে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও তাওফীকে যদি কেউ বেঁচে থাকে তো ভিন্ন কথা। অন্যথায় সব মানুষই কোন না কোন পর্যায়ে এই রোগের শিকার। এই রোগ এতই জঘন্য যে, কুরআনে কারীম এর জন্য যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে তা আর অন্য কোন গোনাহের ক্ষেত্রে করেনি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَلاَتَجَسَّسُوا وَلاَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ (حجرات)

(অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমরা কেউ কি তোমার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ কর। বরং তা তো তোমরা অপছন্দ কর)।

এই আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া বলা হয়েছে। একে তো মানুষের গোস্ত! দ্বিতীয়ত সে মানুষ নিজেরই ভাই!! তৃতীয়ত সে ভাই আবার মৃত!!! যার মধ্যে সামান্যতম মনুষ্যত্বও আছে, সে এই কাজ করা তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু কুরআনে কারীম তা-ই বলছে যে, গীবত করা মানেই নিজের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া। এই গীবত কোন সাধারণ গোনাহ নয়; কবীরা গোনাহ।

গীবতের জঘণ্যতা

এই গীবতের গোনাহ্ কি মদ পান করার মত গোনাহ? শুকর খাবার মত গোনাহ? চুরি করার মত গোনাহ? ডাকাতি করার মত গোনাহ? না, তা নয় বরং এই সবগুলো থেকেও আরো মারাত্মক গোনাহ্। কারণ মদপান করা আর শুকর খাওয়ার সম্পর্ক শুধু আল্লাহ্‌র হকের সঙ্গে। কেউ যদি মদ পান করে বা শুকরের গোস্ত খায় তাহলে তার এ গোনাহ্ শুধু তার পর্যন্তই সীমিত থাকে। অন্য কোন বান্দার হকের সঙ্গে তা জড়িয়ে যায় না। ফলে আল্লাহ্ তাকে কখনো তাওবার তাওফীক দিলে তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু গীবতের গোনাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে। আর বান্দার হকের নীতি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ হকদার ক্ষমা না করবে ততক্ষণ তা ক্ষমা পাওয়ার কোন উপায় নেই। হাজার তাওবা করতে থাক; দিন রাত নামায-রোযা করতে থাক; তাতে তা ক্ষমা হবার নয়। আল্লাহ্‌র বিধান হল, আমার হক তো আমি ক্ষমা করে দিব কিন্তু যদি আমার কোন বান্দার জান মালের ক্ষতি কর বা তার ইজ্জতের কোন ক্ষতি কর অথবা তার অন্য যে কোন ক্ষতিই তুমি কর তাহলে যতক্ষণ সে তোমাকে ক্ষমা করবে না বা তার হক তুমি আদায় করবে না ততক্ষণ আমি ও তোমাকে ক্ষমা করব না। বান্দার হকের বিষয়টি এতই কঠিন ও জঘন্য। কিন্তু আমরা এটাকে এত সহজ বানিয়ে রেখেছি, যেন নাকে একটা মাছি বসল আর হাত নেড়ে তাড়িয়ে দিলাম। এর চেয়ে কোন বড় ব্যাপার নয়। মনে রাখবেন, গীবত কিন্তু বান্দার হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গীবতের পরিচয়

গীবত বলা হয়, কোন মানুষের অগোচরে অন্যের কাছে এমনভাবে তার আলোচনা করা যা সে জানলে অপছন্দ করবে। এবার নিজের হিসাব করে দেখুন! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরস্পর যে কথাবার্তা বলা হয় তাতে কী পরিমাণ গীবত করে থাক। কোন কোন মানুষ বলে আমি তার ব্যাপারে যা বলেছি, তা আমি তার সামনেও বলতে পারব। তারা বুঝাতে চায় যে, গীবত তো তখন হবে যখন আমি তার সামনে তা বলতে পারব না। আর একথা তো আমি তার সামনেও বলতে পারব। মনে রাখবে তুমি একথা তার

সামনে বলতে পার আর না পার, তাতে কিছু যায় আসে না। যদি একথা এমন হয়ে থাকে যে, তা জানলে সে অপছন্দ করবে তাহলে অবশ্যই তা গীবত ও গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং তুমি মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেয়ে ফেলেছ। নাউযুবিল্লাহ।

গীবত ও অপবাদের পার্থক্য

হাদীস শরীফে এসেছে, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যার দোষ বর্ণনা করছি বাস্তবেই যদি তার মধ্যে ঐ দোষ থাকে, তাহলেও কি তা গীবত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ! তুমি যদি তার বাস্তব ও সত্য দোষের কথা বল তাহলেই তা গীবত হবে। আর যদি তার এমন কোন দোষ বর্ণনা কর যা তার মধ্যে নেই তাহলে তো গীবতের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে।

কোন ব্যক্তির মধ্যে একটি দোষ আছে এবং সে দোষটা তুমি কোন মজলিসে বলে দিলে, যেমন, তুমি বললে, অমুকে বড় মিথ্যাবাদী। আর বাস্তবেও সে মিথ্যাবাদী। তাহলে তার অগোচরে তোমার এই মিথ্যাবাদী বলা গীবত এবং গোনাহ। আর যদি বাস্তবে সে মিথ্যাবাদী না হয় তবুও তুমি তাকে মিথ্যাবাদী বল তাহলে এক্ষেত্রে তুমি দুটি গোনাহ করলে। একটি, গীবত করার গোনাহ। আরেকটি, মিথ্যা অপবাদ দেয়ার গোনাহ। গীবত খুবই জঘন্য গোনাহ। মানুষকে তার যবান নিয়ন্ত্রণ করে রাখা চাই এবং আল্লাহর কাছে তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করা চাই। তাহলেই তার পক্ষে গীবত থেকে বাঁচা সম্ভব। অন্যথায় সে কোন না কোনভাবে তাতে লিপ্ত হয়েই যাবে।

গীবত সম্পর্কে জনৈক প্রফেসরের মন্তব্য

গীবত সম্পর্কে আমি একবার একটা প্রবন্ধ লিখেছি। প্রবন্ধ পড়ে এক ভার্সিটির প্রফেসর আমাকে চিঠি লিখলে, 'আপনি গীবতের অনেক অনিষ্টতার কথা বলেছেন, গীবত কবীরা গোনাহ, হারাম, না জায়েয। তা পরিহার করা চাই ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি এই গীবত সম্পর্কে অনেক চিন্তা ফিকির করে

দেখেছি যে, গীবত যদি জীবন থেকে বাদ দেয়া হয় তাহলে এই জীবন একেবারে ফিকে ও নিরস হয়ে যাবে। জীবনে স্বাদ বলতে কিছুই থাকবে না। কারণ যখন দুচারজন এক সঙ্গে বসি, কথা-বার্তা বলি তাতে যদি কিছু গীবত অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তাহলে কি নিয়ে কথা বলব? তখন তো আর শুধু আল্লাহ আল্লাহ করা ছাড়া উপায় নেই। হাসি ঠাট্টা ও আনন্দ বিনোদনের কোন কথাই তো বলা যাবে না। আপনি এত বড় প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এটার এত অকল্যাণ ও অনিষ্টতার বিবরণ দিয়েছেন যেন আপনি চাচ্ছেন, দুনিয়ার সব মানুষ হাসি ঠাট্টা আনন্দ বিনোদন সব বাদ দিয়ে বসে থাকুক। এবং জীবনের স্বাদ রস বলতে যা আছে সব শেষ হয়ে যাক।'

তিনি যেহেতু প্রফেসর মানুষ ছিলেন তাই নিজের মানসিক তা হিসাবে সবশেষে লিখেছেন। 'আমি বুঝি না যে, ইসলাম এমন জিনিস কেন নিষেধ করে, যা সব মানুষ সব সময় করতে থাকে। আর যদি না করে তাহলে তার জীবনের কোন স্বাদই থাকে না।'

আমি তার চিঠির জবাবে লিখেছি, আপনি যে লিখেছেন, 'গীবত ছেড়ে দিলে জীবনের স্বাদই শেষ হয়ে যাবে এটা তো হল আপনার জীবনের স্বাদ। গীবত যদি না করেন তাহলে আপনার জীবনের স্বাদ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ আপনার গীবত করে এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? যদি আপনি শোনেন অমুক ব্যক্তি অমুক মজলিসে প্রফেসর সম্পর্কে এই কথা বলেছে, অমুক এই কথা বলেছে, তখন আপনার স্বাদময় জীবনের কি অবস্থা হবে? স্বাদ লাগবে না সব স্বাদ-রস বিস্বাদ ও নিরস হয়ে যাবে?

নিজেকে এবং অপরকে এক পাল্লায় বিচার করুন

আসল কথা হল, সব মানুষ নিজের স্বাদ বিস্বাদের বিচার করে। এটা দেখে না যে, আমি যে কাজ অন্যের সঙ্গে করছি আমার সঙ্গে যদি কেউ এমন করে তাহলে আমার কি অবস্থা হবে? এ বিষয়ে হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক কার্যকর চিকিৎসা দিয়েছেন, যা একমাত্র একজন নবীই দিতে পারেন, অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এ ব্যবস্থাপত্র কাজে লাগানো হয় এবং এই পরামর্শমত কাজ করা হয় তাহলে

সমাজের সকল জটিলতা কেটে যাবে এবং সকল ঝগড়া-বিবাদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই পরামর্শ ভুলে যাবার কারণেই সমাজে যাবতীয় ফেতনা ফাসাদের সৃষ্টি হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ হল—

اَحِبَّ لِاَ خِيكَ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَاكْرَهْ لِغَيْرِكَ مَاتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ

তোমার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ কর যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তার জন্য তা অপছন্দ কর যা তোমার নিজের জন্য অপছন্দ কর। (মুসনাদে আহমাদ-৪/৭০)

অর্থাৎ, তোমার অপর ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর। অপরের জন্যও তা অপছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ কর। এই যে, আমরা একটা দ্বৈতনীতি বানিয়ে রেখেছি এবং দ্বিতীয় আরেকটি পাল্লা বানিয়ে রেখেছি যে, নিজের জন্য এক নীতি এক পাল্লা আর অন্যের জন্য অন্য নীতি অন্য পাল্লা এজন্যই সমাজে যত ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সব ক্ষেত্রেই চিন্তা করবে যে, আমি তার সঙ্গে যে আচরণ করছি যদি আমার স্থানে সে হত আর আমি তার স্থানে হতাম তাহলে আমার কি দশা হত। প্রত্যেক কাজের আগে এটা চিন্তা করে নিলে তার দ্বারা কখনো অন্যের হক নষ্ট হতে পারে না এবং বে-ইনসাফী হতে পারে না। তাই গীবতের সময় একটু চিন্তা কর যে, আমি যদি তার স্থানে হতাম এবং এভাবে মজলিসে আমার আলোচনা-সমালোচনা হত, যা আমি তার ব্যাপার করছি, তাহলে কি আমি তা পছন্দ করতাম বা সহ্য করতাম? যদি মনে করি পছন্দ করতাম না, তাহলে বুঝা যাবে এটা গীবত এবং এটা থেকে বাঁচা জরুরী।

মানুষ বলে গীবত থেকে বাঁচা যায় না। আমি বলি গীবত করা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। অনিচ্ছায় গীবত হয়ে যায় না। সুতরাং গীবত করা যেমন ইচ্ছাধীন গীবত থেকে বাঁচাও ইচ্ছাধীন এবং জরুরী।

যেসব ক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা জায়েয

অবশ্য কোন মুসলমানকে কারো ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তার দোষ বলে দেয়া জায়েয। যেমন কেউ আপনার কাছে এসে বলল, অমুক আমার মেয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে সে কেমন মানুষ?

এখন যদি তার এমন দোষ ত্রুটি আপনার জানা থাকে যা বিয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় এবং আপনি তার ঐ দোষের কথা বলে দেন যাতে সে এবং তার মেয়ে ঐ ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, তবে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অথবা আপনি জানেন কোন মানুষ ধোঁকাবাজ; ধোঁকা দিয়ে সে মানুষের অর্থ সম্পদ লুটে নেয়। এখন তার ব্যাপারে যদি কাউকে বলেন, দেখ তার সঙ্গে লেন-দেন করতে চিন্তা করে করো। কারণ তার লেন-দেন ঠিক নেই। তবে আপনার একাজ গীবত হবে না। কারণ এখানে উদ্দেশ্য হল অন্যকে বিপদ থেকে বাঁচানো।

সুতরাং যেখানে কাউকে সতর্ক করা প্রয়োজন বা দুনিয়া কিংবা আখেরাতের কোন বিপদ থেকে বাঁচানো প্রয়োজন সেখানে কারো বাস্তব দোষের কথা বললে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং তা জায়েয এবং জরুরী।

ফাসেক ও গোনাহ্গারের গীবত করা

অনেকের মাঝে একথা প্রসিদ্ধ যে, ফাসেক ফাজেরের গীবত করা জায়েয। তবে কথাটা ঠিক নয়। নেককারের গীবত যেমন নাজায়েয ফাসেক ফাজেরের গীবতও তেমনি নাজায়েয। তবে হাঁ! কেউ যদি কোন গোনাহ এমনভাবে প্রকাশ্যে করে যে, তা বলতেও সে লজ্জাবোধ করে না এবং খারাপ মনে করে না। তখন যদি তার সেই গোনাহের কথা তার আগোচরে বলা হয়, তাহলে তা নাজায়েয হবে না। যেমন কোন লোক প্রকাশ্যে এবং সবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে মদ পান করে। এখন যদি কেউ তার অগোচরে একথা বলে যে, সে মদ পান করে তো এতে তার কোন কষ্ট হবে না। কারণ সে নিজেই তো বলে বেড়ায় আমি মদ পান করি। তাই এটা না জায়েযও হবে না। তবে যে গোনাহ সে গোপন রাখতে চায় এবং সে যে এ গোনাহে লিপ্ত তা জেনে ফেলাকে খারাপ মনে করে এবং এটার আলোচনা হয় জানলে কষ্ট পায়, এমন গোনাহের আলোচনা তার অগোচরে করা না জায়েয। চাই তা সত্যই হোক না কেন। তা গীবত ও হারাম। তাই যবানে লাগাম লাগাতে হবে তা না হলে যবান তোমাকে গোনাহে লিপ্ত করে দিবে।

আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, গীবত করা যেমন না জায়েয শোনাও তেমনি না জায়েয।

অন্যের আলোচনাই করো না

এজন্যই হযরত থানভী রহ. বলতেন, সতর্কতার দাবী হল, অন্যের কোন আলোচনাই না করা। না ভালো, না মন্দ। কারণ যখন কারো ভালো আলোচনা করবে তখন ও এক পর্যায়ে শয়তান তার সমালোচনায় লিপ্ত করে দিবে। তখন বলবে, অমুক তো খুব ভালো মানুষ, তবে এই দোষটা অবশ্য তার আছে। সুতরাং এটাই নিরাপদ যে, অন্যের কোন আলোচনাই করবে না।

নিজের চিন্তা কর

তোমার অন্যের চিন্তা করার প্রয়োজনই বা কোথায়। তুমি তোমার নিজের চিন্তা কর। যেমন কেউ বলেছেন–

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

যার নিজের দোষত্রুটির চিন্তা আছে সে আবার অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে কোথায়? যে নিজে অসুস্থ; যার নিজের পেটে ব্যাথা সে আবার অন্য রোগীর চিন্তা করবে কিভাবে? যখন মানুষ নিজের চিন্তায় পড়ে যায়; চিন্তা করে আমার মধ্যে কি দোষ আছে? আমি কোন কোন গোনাহে লিপ্ত? আমার সংশোধন কিভাবে হবে? এর ক্ষতিপূরণ কিভাবে করব? তখন মানুষ অন্যের গীবত করে না। বাহাদুর শাহ্ জাফার খুব সুন্দর বলেছে

تھے جو اپنی برائی سے بے خبر ☆ رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائی پر جو نظر ☆ تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

যতক্ষণ তুমি নিজের দোষ ত্রুটি থেকে বে খবর ছিলে, ততক্ষণ অন্যের দোষগুণ নিয়ে মেতে ছিলে। যেই নিজের দোষ ত্রুটির উপর নজর পড়ল, অমনি অন্য সব দোষত্রুটি দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল।

অর্থাৎ, যখন নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ নেই; আমিই সবচেয়ে খারাপ। আল্লাহ্ দয়া করে আমাদের নিজেদের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করার এবং তা অনুভব করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গীবতের আরেকটি চিকিৎসা

গীবত সম্পর্কে হযরত থানভী রহ.-এর কিছু বাণীর ব্যাখ্যা পেশ করছিলাম। হযরত বলেছেন,

> 'সালেকের সামনে যদি এমন কেউ গীবত করে বা অনর্থক কথা-বার্তা বলে, যাকে সে বারণ করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে তার নিজের সেখানে থেকে উঠে যাওয়া উচিত। তাতে কারো কষ্ট পাবার চিন্তা করবে না।
>
> কারণ অন্যের মনোকষ্টোর চেয়ে নিজের দ্বীনের হেফাজতের বিষয়টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবে যদি উঠে যেতে না পারে তাহলে কোন বাহানা করে উঠে যাবে অথবা এমনভাবে অন্য কোন বিষয়ের জায়েয আলোচনা আরম্ভ করে দিবে যার ফলে ঐ আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।'
>
> (আনফাসে ঈসা-১৪৯)

একটু আগেও বলা হয়েছে যে, গীবত করা যেমন না জায়েয, শোনাও তেমনি নাজায়েয। এখন কোন মজলিসে যদি গীবত শুরু হয়ে যায়, তাহলে কি করতে হবে? হযরত বলেন, সামর্থ থাকলে এ আলোচনা বন্ধ করে দিবে। বন্ধ করার দু'টি পন্থা। একটি পন্থা হল সরাসরি একথা বলে দিবে যে, ভাই দেখ এভাবে আলোচনা করলে গীবত হবে এ আলোচনা বন্ধ কর। আর যদি এভাবে বলতে না পারে তাহলে দ্বিতীয় পন্থা হল এমনভাবে অন্য কোন আলোচনা আরম্ভ করে দিবে যাতে এমনিতেই সে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। যদি কোন পন্থায়ই বন্ধ করতে না পারে তাহলে ঐ মজলিস থেকে উঠে যাবে। সেখানে বসে থাকবে না।

মনোকষ্টের পরোয়া করবে না

এরপর হযরত একটি নীতি বলে দিয়েছেন। কারো মনোকষ্টের পরোয়া করবে না। কারণ অন্যের মনোকষ্টের চেয়ে (নিজের ও অন্যের) দীনের ক্ষতি না করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের সমাজের মানুষ সাধারণত প্রান্তিকতার শিকার। একদিকে তো হুকূকুল ইবাদ (বান্দার হকের) কোন

পরোয়া নেই। যখন তখন যে কোন কারো হক নষ্ট করে ফেলে। কারো জানের ক্ষতি হচ্ছে কি মালের ক্ষতি হচ্ছে কোনই পরোয়া করে না। অপর দিকে কেউ যদি হুকূকুল ইবাদের খেয়াল করে তো সে এমনভাবে সীমানা ছাড়িয়ে যায় যে, অন্যের খেয়াল করে নিজের ফরয-ওয়াজিবের পর্যন্ত খবর থাকে না।

যথাসময়ে নামায পড়া ফরয

জনৈক ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আমাকে বললেন, এমনি তো তিনি অনেক ভাল মানুষ, তবে চেম্বার চলাকালে নামায পড়েন না। আমি তাকে বলি, চেম্বার করাকালেও নামাযের সময় হলে নামায পড়ে নাও। তিনি বলেন, আমি তো মানুষের সেবা করি। চেম্বারে রোগী বসা থাকে। এখন যদি আমি নামাযে দাঁড়িয়ে যাই তাহলে তো বান্দার হক নষ্ট হবে। ফলে তিনি রাতে যখন ঘরে আসেন তখন আসর, মাগরিব ও এশা তিন নামায একসাথে পড়ে নেন এবং বলেন, আমি তো মানবসেবা করি। মানবসেবা করতে গিয়ে নামায কাযা হলে কোন অসুবিধা নেই।

আরে ভাই! তোমার উপর মানবসেবা এমন ফরযে আইন নয়, যেমন নামায ফরযে আইন। দ্বিতীয়ত তোমার ঐ সেবার সঙ্গে নামাযের কোন বিরোধ নেই। তুমি যদি আসরের চার রাকাত নামায পড়ে আবার রোগী দেখ তাতে এমন কি সমস্যা হবে? এটা আসলে তোমার নফসের একটা ধোঁকা। সে নামায কাযা করানোর জন্য বাহানা বের করে দিয়েছে যে, তুমি তো সেবায় নিয়োজিত।

এগুলো সব একপেশে কাজ। এগুলোর কারণ হল দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা। তাই হযরত থানভী রহ. বলছেন, অন্যের মনোকষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে নিজের দীন নষ্ট করা ঠিক নয়। সুতরাং এমন ভাবাও ঠিক নয় যে, আমি যদি তাকে গীবত থেকে বারণ করি বা মজলিস থেকে উঠে যাই তাহলে সে কষ্ট পেতে পারে। মনে রাখবেন, যদি গোনাহ থেকে বাঁচতে গিয়ে কারো মনে কষ্ট হয় তাহলে তা হতে দিন। কোন পরোয়া করার প্রয়োজন নেই। কারণ আপনি জায়েয সীমা পর্যন্ত অন্যের মনোকষ্টের প্রতি

খেয়াল রাখতে আদিষ্ট। আর যেখানে অন্যের মনোকষ্টের প্রতি খেয়াল রাখতে গেলে গোনাহের শিকার হতে হবে সেখানে তার খেয়াল করা আপনার কর্তব্য নয়।

অন্যের দুনিয়া নির্মাতা

এক হাদীসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের দুনিয়াবী উপকারের জন্য নিজের দীনের ক্ষতি করে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়াতেই তার উপর চাপিয়ে দেন। আপনি যেহেতু তার দুনিয়ার ফায়দার জন্য নিজের আখেরাত নষ্ট করেছেন তাই এখন সে আপনার দুনিয়াও নষ্ট করবে। যারা স্ত্রী সন্তানদের জন্য হারাম উপার্জনে লিপ্ত হয় অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ঐ সন্তানরাই পিতার উপর জুতা ওঠায়। কারণ সে স্ত্রী-সন্তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে এবং তাদের দুনিয়া নির্মাণের জন্য নিজের আখেরাত নষ্ট করেছে। এ জন্য আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদেরকে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং অন্যের মনোকষ্টের চিন্তায় কখনো নিজের দীন নষ্ট করবেন না।

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

আল্লাহর নাফরমানী করে কোন মাখলুকের আনুগত্য জায়েয নেই। আল্লাহর নাফরমানী করে কারো কথা মানারও প্রয়োজন নেই এবং কারো মন জয়েরও অনুমতি নেই।

গীবত থেকে বাঁচতে হিম্মতের প্রয়োজনীয়তা

মনে রাখবেন, কোন কাজই কষ্ট ছাড়া হয় না। প্রত্যেক কাজেই কিছু না কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। সুতরাং আপনি যদি একথা বুঝে থাকেন যে, গীবত করা খারাপ কাজ, গীবত করা গোনাহের কাজ এবং গীবতের কারণে অখেরাত বরবাদ হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনাকে কষ্ট করে হিম্মত কাজে লাগাতে হবে। যখন নিজের হিম্মতকে কাজে লাগাবে না তখন আল্লাহ আপনার সাহায্য করবেন এবং গোনাহ থেকে বাঁচা আপনার জন্য সহজ হবে।

নাজায়েয গীবতের শর্ত হল অসন্তুষ্টি

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ. কে প্রশ্ন করেছে,

> 'কারো সঙ্গে খুব বেশি সম্পর্কের কারণে যদি কেউ তাকে এমন কোন কথা বলে যা বাহ্যত অসন্তুষ্ট হওয়ার মত হলেও সম্পর্কের কারণে বা ঠাট্টা করে বলার কারণে সে তাতে অসন্তুষ্ট হবে না বলে মনে হয় (তাহলে এটাও কি নাজায়েয গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে?)। (আনফাসে ঈসা-১৪৯)

এই প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল কিছু লোক এমন থাকে যাদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকে। তাদের মাঝে হাসি-ঠাট্টা হয়। একে অপরকে ঠাট্টার ছলে অনেক কথা বলে। এখন এরা যদি একজন অপরজন সম্পর্কে তার অনুপস্থিতিতে এমন কোন কথা বলে যা বাহ্যত কেউ শোনলে অসন্তুষ্ট হবার মত মনে হলেও তার সঙ্গে যেহেতু ভিন্ন রকমের সম্পর্ক আছে, তাই বলা যায় সে এতে অসন্তুষ্ট হবে না। তাহলে এমন করাও কি নাজায়েয গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে?

হযরত তার উত্তরে বলেছেন–

> 'যখন সেটা তার অসন্তুষ্টির কারণ হবে চাই তা যেভাবেই হোক না কেন তখন তা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি অসন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয় তাহলেও তা থেকে বিরত থাকা জরুরী। তবে সে অসন্তুষ্ট হবে না বলে যদি নিশ্চিত হয় তাহলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।"

উত্তরের সারকথা হল, যদি একথা একশ ভাগ নিশ্চিত হয় যে, যার ব্যাপারে একথা বলা হচ্ছে সে একথা শোনলে অবশ্যই খারাপ মনে করবে না এবং তাতে অসন্তুষ্ট হবে না তাহলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন তুমি তোমার কোন বন্ধুকে বললে, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ। পরে অন্য কোন মজলিসে তার আলোচনা উঠল তখন তুমি বললে, আরে ঐ অকৃতজ্ঞের কথা বাদ দাও। তো এখানে অকৃতজ্ঞ এমন একটা শব্দ যা সাধারণ কাউকে বললে সে কষ্ট পাবে এবং অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে যখন একথা বলা হয় তখন সাধারণত এর কারণে কেউ অসন্তুষ্ট হয় না। সুতরাং যদি একথা

নিশ্চিত হয় যে, তোমার বন্ধু যদি শোনে তুমি তার ব্যাপারে একথা বলেছ তাহলে সে তাতে অসন্তুষ্ট হবে না তাহলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না । তবে যদি অসন্তুষ্ট হওয়ার সন্দেহও হয় অর্থাৎ, এমন সম্ভবনা থাকে যে সে এতে অসন্তুষ্ট হতেও পারে তাহলে তা নাজায়েয গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এমন হাসি-ঠাট্টা জায়েয নেই

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাও বোঝা গেল যে, অনেক সময় এমন হয় যে, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কোন একজন অন্যজনকে নিয়ে হাসি তামাশা করে। তার উদ্দেশ্য থাকে শুধুই হাসি তামাশা, তাকে কষ্ট দেয়া বা অন্য কিছু নয়। কিন্তু কিছু মানুষ এমন হয় যারা সব হাসি তামাশা বুঝে না এবং বরদাশত করে না বরং তাতে কষ্ট পায়। রেগে যায়। আবার অনেক সময় এমন মানুষকে খেপানোর জন্যও অনেকে আরো বেশি করে তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করে এবং তাতে মজা পায়। এরকম হাসি-ঠাট্টা বন্ধু-বান্ধবরা যদিও স্বাভাবিক মনে করে এবং বন্ধুত্বের দাবীতে করে থাকে কিন্তু এতে যেহেতু ঐ ব্যক্তি কষ্ট পায় এবং তা অপছন্দ করে তাই এমন হাসি-ঠাট্টাও জায়েয নেই।

অবশ্য যদি একথা পূর্ণ নিশ্চিত হয় যে, অমুকের সঙ্গে বন্ধুত্বের দাবীতে এমন আচরণ করলে সে কষ্ট পাবে না তার কাছে তা ভালো লাগবে এবং সে খুশি হবে তাহলে এক্ষেত্রে তার সামনেও এমন কথা বলা যাবে এবং তার অগোচরেও বলা যাবে।

সার কথা হল, এখানে তিনটি অবস্থা। এক. যদি এমন কথায় তার অসন্তুষ্ট হওয়া নিশ্চিত হয় তাহলে তা না জায়েয। দুই. যদি অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে তাহলেও না জায়েয। তিন. যদি এ কথা নিশ্চিত হয় যে, সে এতে অসন্তুষ্ট হবে না, তাহলে জায়েয। আল্লাহ আমাদের সকলকে গীবত থেকে বাঁচার হিম্মত ও তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সপ্তম মজলিস

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

হযরত থানভী রহ. গীবত থেকে বাঁচার একটি উপায় ও নিয়ম বলে দিয়েছেন। নিয়মটি হল,

> 'চিন্তা ভাবনা ছাড়া কখনো যেন কোন কথা না বলা হয়। যদিও বা অনেক সময় একথাও মনে থাকবে না যে, আমি চিন্তা ভাবনা করে কথা বলব। তবে গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল রাখলে অধিকাংশ সময়ই মনে থাকবে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে আর ভুল হবে না ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক কথার আগেই যদি এটা চিন্তা করা হয় যে, আমার একথা আবার গোনাহ্ হয়ে যাচ্ছে না তো? তাহলে এর দ্বারা অনেকটা সংশোধন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (আনফাসে ঈসা-১৪৯)

অর্থাৎ, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলার যে অভ্যাস হয়ে গেছে তা পরিত্যাগ কর। প্রত্যেক কথা চিন্তা-ভাবনা করে বল। চিন্তা কর, আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি তা আবার আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয়ে যাচ্ছে কি না? হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন- قُلْ خَيْرًا وَ إِلَّا فَاصْمِتْ হয় ভালো কথা বল অন্যথায় চুপ থাক। এমন কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা হাজারো গুণ ভালো যে কথা মানুষের জাহান্নাম ও আযাবের কারণ হয়।

উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপকারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ মানুষকে তো তার যবানের কথাই উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। (নাউযুবিল্লাহ্) এই

যবান যেন সরকারী মেশিন। যা আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে দান করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই মেশিন চলছে এবং চলেই যাবে। না তাতে কোন তেলের প্রয়োজন, না কোন সার্ভিসিং বা মেরামতের প্রয়োজন। সে তার কাজ করেই চলেছে। যেই মাথায় কোন কথা আসল সঙ্গে সঙ্গে তা মুখে বেরিয়ে পড়ল। যেন অটোমেশিন। এই নেয়ামতের মূল্য আমাদের কাছে এজন্য নেই যে তা আমরা জন্ম থেকে পেয়েছি এবং কাজ করে চলেছে। তা অর্জনে আমাদের কোন টাকা পয়সাও খরচ হয়নি এবং কোন শ্রমও ব্যায় হয়নি।

যবানের মূল্যায়ন কর

যবানের মূল্য যে কী তা ঐসব লোকদের জিজ্ঞাসা করে দেখ! যাদের বাকশক্তি হারিয়ে গেছে, তাদের কাছে জানতে পারবে তারা কেমন আযাবে নিমজ্জিত? প্যারালাইসিসের কারণে যাদের যবান বন্ধ হয়ে গেছে; সে কথা বলতে চায় স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে, বলতে চায় পিতা-মাতা ভাই-বোনের সঙ্গে, এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, কিন্তু বাকশক্তি তার সঙ্গ দিচ্ছে না। কথা বলতে পারছে না। কখনো মাথা পিটায়। আমি বলতে চাচ্ছি, আমি আমার মনের কথা কিভাবে বুঝাব? জিজ্ঞাসা করে দেখ! তখন সে কেমন অনুভব করে এই যবানের মূল্য? আল্লাহ না করুন আমাদের কারো কথা যদি দুই মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং কথা বলার শক্তি না থাকে, তখন যদি কেউ বলে কিছু পয়সা খরচ না করলে তুমি আর বাকশক্তি ফিরে পাবে না, তাহলে সে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। তবুও যেন সে বাকশক্তি ফিরে পায়। এখন এই যবান তার কাছে একদম ফ্রি। যার কারণে তা যেখানে সেখানে কেচির মত চলছে। হালাল হারামের বাছ বিচার না করে মানুষ তা যেখানে সেখানে নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই।

মহামূল্যবান দু'টি কালিমা

শরীয়তের দাবী শুধু এতটুকু যে, এই সরকারি মেশিন তুমি যে ফ্রি পেয়ে গেছ এটা যেহেতু তোমার উপকারী বস্তু তাই এটাকে তোমার উপকারের কাজে ব্যবহার কর; হালাল কাজে ব্যবহার কর এবং হারাম থেকে বাঁচিয়ে

রাখ। মানুষ যদি এই যবান থেকে উপকার গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার উপকারও অনেক বড়। হাদীস শরীফে এসেছে। কেউ যদি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা একবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে তাহলে তার মিযানের পাল্লার অর্ধেক ভরে যায়। খতমে বুখারীর সময় আপনারা এ হাদীস শুনে থাকেন–

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

দুটি কালিমা এমন যা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, যবানে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু মিযানের পাল্লায় তা অনেক ভারি। কালিমা দুটি হল

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

(সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম) সুতরাং, মানুষ যদি এই যবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাহলে সে জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামতের পাহাড় গড়তে পারে। চলাফেরা উঠা বসায় সে তার যবানকে আল্লাহর যিকিরে সজিব তরতাজা রাখতে পারে।

হাদীস শরীফে এসেছে এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, সবচেয়ে উত্তম আমল কী? তিনি উত্তর দিলেন, সবচেয়ে উত্তম আমল উঠা বসায় সর্বদা আল্লাহর যিকির করতে থাকা এতে তোমার আমলনামায় সওয়াব বৃদ্ধি হতে থাকবে। নেকের স্তূপ হতে থাকবে। আল্লাহর কাছে দান প্রতিদানের ভাণ্ডার জমা হতে থাকবে।

যবান মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করায়

এই যবানই মানুষকে কুফর থেকে বের করে ইসলামে প্রবেশ করায়। সত্তর বছরের কোন কাফেরকে আল্লাহ ঈমানের তাওফীক দিলেন আর সে মুখে أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ পড়ে মুহূর্তের ব্যবধানে জাহান্নামের সপ্তম স্তর থেকে মুক্তি পেয়ে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত– জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছে গেল।

এই বিশাল প্রাপ্তি যবানেরই বদৌলতে। আল্লাহ এত বরকত রেখেছেন এ যবানে। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, একজনের সারা জীবন কুফর ও যাবতীয় নাফরমানী এবং পাপাচারে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তাকে ঈমানের তাওফীক দান করেছেন, সে কালিমায়ে শাহাদাত পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। এই কালিমা পড়ার সামান্য আগেও যদি সে মৃত্যুবরণ করত তাহলে সোজা জাহান্নামে যেতে হত। কিন্তু যখন এই কালিমা পড়ার পর ইন্তেকাল করল এখন সোজা জান্নাতে চলে যাবে। যবানের এই কালিমা তাকে জাহান্নামের সপ্তম স্তর থেকে মুক্ত করে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছে দিবে।

যবানের উপকার ও ক্ষতি দুটোই অনেক বড়

যবানের উপকারও অনেক বড় এবং ক্ষতিও অনেক জঘণ্য। সুতরাং তুমি যদি চাও তাহলে এই যবান দ্বারা আখেরাতের অনেক বড় ভাণ্ডার সঞ্চয় করে নিতে পার। তেলাওয়াতের মাধ্যমে, যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে, আল্লাহর হামদ; সানা ও শোকরের মাধ্যমে এবং মানুষকে খুশি করার মাধ্যমে আখেরাতের অনেক বড় সঞ্চয় গড়ে নাও। কারণ যবানে এমন কোন কথা বলা, যার দ্বারা অন্য মুসলমান খুশি হয় তা সদকা সমতুল্য। আর যদি এই যবানের অপব্যবহার হয় তাহলে এর ক্ষতিও অনেক বেশি। যেমন ইতিপূর্বে একটি হাদীস শুনেছি যে, মানুষকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে এই যবানেরই কর্মকাণ্ড। কারণ এই যবানই মিথ্যা বলে, এই যবানই গীবত করে অন্যের মনে কষ্ট দেয়, অশ্লীল কথা বলে। আর এসব কাজই মানুষকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপকারী। যখন এই যবানের ক্ষতিও অনেক এবং উপকারও অনেক তাই নাজাত ও মুক্তির একমাত্র উপায় হল– মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে যবানকে ব্যবহার করবে। এজন্যই হযরত থানভী রহ. বলেন যখন কোন কথা বলবে, তখন চিন্তা করবে যে, এই কথা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে? না জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে?

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর চুপ থাকা

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তাঁকে কেউ প্রশ্ন করলে কখনো কখনো অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কোন

উত্তর দিতেন না। একদিন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত এতক্ষণ হয়ে গেল আপনি কিছুই বলছেন না? তখন তিনি বললেন–

حَتّٰى أَعْرِفَ اَنَّ الْفَضْلَ فِى السُّكُوْتِ اَوْ فِى الْكَلَامِ

আমি একথা বুঝা পর্যন্ত বিলম্ব করি যে, এখানে আমার জন্য বলা উত্তম না না বলা উত্তম।

সুতরাং প্রথমে মাপ তারপর বল। বলার আগে যাচাই বাছাই করে দেখ যে, আমার মুখ থেকে যা বের করতে চাচ্ছি তা আমার জন্য ক্ষতিকর না উপকারী।

যবানের হেফাজতের উপর জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

এজন্যই হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَابَيْنَ لِحْيَتَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দু'টি জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিবে তাকে আমি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সেই দু'টি জিনিসের একটি হল দুই চোঁয়ালের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ যবান। সে যদি যবান সম্পর্কে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তা আমি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করব না। এবং দ্বিতীয় জিনিস হল, দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ লজ্জাস্থান। এ ব্যাপারে যদি সে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমি তা অন্যায় কাজে ব্যবহার করব না তাহলে আমিও তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সুতরাং এমন যেন না হয় যে, এই সরকারি মেশিন ফ্রি পেয়ে গেলাম আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা কেঁচির মত চালাতে থাকলাম, থামার কোন নাম নেই। যা মুখে আসছে তাই বকে যাচ্ছি, কোন চিন্তা ভাবনা নেই। এটি ঠিক নয় বরং বলার আগে চিন্তা কর যা মুখ থেকে বের হচ্ছে তা ক্ষতিকর না উপকারী। আগে চিন্তা কর পরে বল।

অনর্থক কথা: দুজন ছাত্রের ঘটনা

দিল্লীতে অনেক বড় একজন আল্লাহর অলী ছিলেন, হযরত মির্জা মাজহার জানে জানা রহ.। তার নাযুক মেজাজ ও সংবেদনশীল স্বভাবের অনেক ঘটনাই প্রসিদ্ধ আছে। একবার দুইজন ছাত্র তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আফগানিস্তানের বল্‌খ শহর থেকে এসেছে। তারা শুনেছে দিল্লীতে একজন বড় আল্লাহওয়ালা আছেন। শুনে তাদের দিলে তামান্না হল, তার হাতে বাইআত হওয়া দরকার। তাই দীর্ঘ সফর করে তারা দিল্লী হযরত মির্জা মাজহার রহ. এর মসজিদে পৌছালো। যেহেতু নামাযের সময় নিকটবর্তী ছিল তাই তারা হাউজে গিয়ে অযু করতে আরম্ভ করল। অযুর ফাঁকে তারা পরস্পর কথা বার্তায়ও লেগে গেল। কথা হল এই হাউজটি বড়, না আমাদের বল্‌খের মসজিদের হাউজ বড়? একজন বলছে এই হাউজ বড়, আরেকজন বলছে না, ঐ হাউজ বড়। এভাবে পরস্পর কিছু তর্ক বিতর্কও হতে লাগল। ঘটনাক্রমে হযরত মির্জা মাজহার রহ. সেদিক দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে তাদের কথা শুনে ফেললেন। নামাযের পর তারা যখন হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা বল্‌খ থেকে এসেছি। হযরত বললেন, কি উদ্দেশ্যে আসা হল? তারা বলল, আমরা হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছি। হযরত মাজহার রহ. বললেন, আপনারা বাইআত হওয়ার জন্য এসেছেন ঠিক আছে, কিন্তু আপনাদের এই সিদ্ধান্ত কি হয়েছে যে, এই হাউজ বড় না বলখের হাউজ বড়? এখন দুইজনই চুপ হয়ে গেল এবং লজ্জিত হল যে হযরত আমাদের কথা শুনে ফেলেছেন। হযরত বললেন, আচ্ছা এখনো যেহেতু ফয়সালা হয়নি তো এক কাজ কর আগে বল্‌খ যাও। গিয়ে সেখানকার হাউজ মেপে দেখ কত বড়। তারপর এখানে এসে এটা মেপে সিদ্ধান্ত নাও কোনটা বড় কোনটা ছোট। তারপর বাইআত হও। কারণ তোমাদের কথা বার্তায় প্রথমত এটা বোঝা গেছে যে, তোমরা যা বলেছ তার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই এবং এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতাও নেই। একজন কোন মাপ-ঝোপ ছাড়াই দাবী করে বসলে এই হাউজ বড় আর দ্বিতীয়জনও একইভাবে দাবী করে বসলে ঐ হাউজ বড়। এবং এই দাবীর উপরই পরস্পর বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে।

দ্বিতীয়ত তোমাদের কথা থেকে এটাও বোঝা গেল যে, অনর্থক কথা বার্তায় তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। যদি এটা জানতেই পারতে যে, এই হাউজটা বড় না ঐ হাউজটা বড় তাহলে এতে দুনিয়া বা আখেরাতের এমন কি ফায়দা হত। তাই তোমরা বলখে ফিরে গিয়ে ঐ হাউজ মেপে আস। এ ছাড়া তোমাদেরকে বাইআত করব না।

চিকিৎসার উপকারিতা

আগের যুগে এমন চিকিৎসাই হত। এখন তো তা অনেক কঠিন ও তিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই চিকিৎসা এমন ছিল যা সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। এরপর সারা জীবন আর কখনো যাচাই বাছাই ছাড়া যবান থেকে কোন কথা বের হত না। আগে এভাবে চিকিৎসা করা হত। এমন ছিল না যে, কিছু যিকির ও তাসবীহের অযীফা দিয়ে দেয়া হল আর সে অযীফা জপে জপে কামেল হয়ে গেল। বরং এভাবে দলিত-মথিত করে তাদের ইসলাহ ও সংশোধন করা হত।

তাদেরকে এত কঠিন চিকিৎসা দিলেন কেন?

এই ঘটনা বলার পর হযরত থানভী রহ. বলেন, কারো মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে যে, ঐ ছাত্ররা বেশির চেয়ে বেশি একটি ভুল কাজই না হয় করেছে। যদি তাদের দ্বারা এমন ভুল কাজ নাই হয় তাহলে আর তাদের আসারই বা কি প্রয়োজন ছিল। তারা তো এই ভুলের চিকিৎসার জন্যই এসেছে। আগে থেকেই যদি তারা কামেল হয়, যবান তাদের আয়ত্বে থাকে তাহলে শায়খের কাছে আসার কি প্রয়োজন ছিল? সুতরাং এই ভুলের কারণে তিনি বাইয়াত করতে অস্বীকার করলেন কেন? প্রথমে বাইআত করতেন তারপর ইসলাহ করতেন।

তারপর হযরত নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে, এখানে দু'টি বিষয় আছে। প্রথম বিষয়টি হল বাইয়াত করতে অস্বীকার করে তাদেরকে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কিছু জিনিস এমন আছে যেগুলোর প্রতি সালেক ও মুরিদকে আগে থেকেই লক্ষ্য করতে হয়। শায়খ দ্বারা তখনই ফায়দা হয়

যখন মুরিদ আগে থেকে ঐসব মোটা বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখে। এর বাইরে যে বিষয়গুলো সূক্ষ্ম সেগুলোর চিকিৎসা শায়খের মাধ্যমে করতে হয়। এজন্যই শায়খ তাদেরকে বাইআত করতে অস্বীকার করেছেন।

প্রত্যেকের চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন হয়

দ্বিতীয় কথা হল, আল্লাহই শায়খের অন্তরে ঢেলে দেন এখন তার সঙ্গে কি আচরণ করতে হবে। প্রত্যেকের চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারো চিকিৎসা থাপ্পড় মেরে হয়, কারো চিকিৎসা ধমক দিয়ে হয়, কারো আদর করে হয়, কারো মাথায় হাত বুলিয়ে হয়। আর কারো চিকিৎসা শুধু এক নজর দেখার দ্বারাই হয়ে যায়। আল্লাহ্ শায়খের অন্তরে ঢেলে দেন যে, এখন তার জন্য কোন পন্থা উপকারী হবে। কিন্তু অন্য মানুষ দেখে ভাবে শায়খ কিছুটা বেশি করে ফেলেছেন। কারণ সে জানে না যে, এর মধ্যেই আল্লাহ্ তার চিকিৎসা রেখেছেন।

মুহতারাম আব্বাজানের নীতি

আমার আব্বাজান যতদূর হতে পারে একজন নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। রাগ তো তিনি কখনো করতেনই না বলা যায়। প্রত্যেকের সঙ্গে খুব সহিষ্ণু ও নম্র আচরণ করতেন। খুব বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও অনেকবার এ ঘটনা দেখেছি যে, হঠাৎ করেই তিনি কারো খুব সামান্য কথার উপর অনেক কঠিন রাগ দেখাতেন। যা এই চামড়ার চোখে দেখে সন্দেহ হয়ে যেত যে, তিনি লোকটির উপর বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নেক বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দেন, কার সঙ্গে কখন কি আচরণ করতে হবে?

একটি ঘটনা

একটি ঘটনা মনে পড়ল। একবার একজন পদস্থ, শিক্ষিত এবং প্রসিদ্ধ মানুষ আব্বার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসলেন। এসে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। মাত্র দুই 'তিনটি বাক্য বলেন। আব্বাজান তাকে এমন ধমক আরম্ভ করলেন! আমিও পেরেশান হয়ে গেলাম। তিনি তো আজ পর্যন্ত কোন দিন

কাউকে এভাবে ধমক দেননি। এমনকি এক পর্যায়ে তাকে বললেন, এখান থেকে বের হয়ে যাও এবং দপ্তর থেকে তাকে বের করে দেয়া হল। এমন দৃশ্য আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। আমার চিন্তা হল, হায় আল্লাহ্! এই লোক তো এবার পালাবে। কারণ সবেমাত্র সে কিছু তালীম পাচ্ছিল। এখনো শার্ট প্যান্ট পরা। দাড়ি রেখেছে নামে মাত্র সামান্য। আর এ অবস্থায় আব্বা তাকে এভাবে ধমকে দিলেন। এখন তো সব সময়ের জন্য দূরে সরে যাবে; তার অন্তরে ঘৃণা জন্মাবে।

সেই লোক পরে আমাকে নিজের মুখে বলেছেন যে, মুফতী সাহেবের ঐ দিনের ধমক আমার যিন্দেগীর রূপ পাল্টে দিয়েছে। সেই ধমক আমার উপর এমন প্রভাব ফেলেছে যা আমার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে।

মোটকথা! আল্লাহ্ তায়ালাই নেক বান্দাদের অন্তরে একথা জাগিয়ে দেন যে, কার সঙ্গে কখন কি আচরণ করতে হবে? তাই আল্লাহওয়ালাদের কাজের উপর কখনো সন্দেহ করো না যে, এই তো কাউকে ধমকাচ্ছেন, আবার কাউকে আদর যত্ন দিয়ে গ্রহণ করছেন। কারণ আসল দাতা এবং দানের উৎস তো হলেন আল্লাহ্ তায়ালা। শায়খ তো হলেন মাধ্যমমাত্র। তিনিই শায়খের অন্তরে ঢেলে দেন কার ইসলাহ্ ও সংশোধনের উপযোগী পদ্ধতি কি হবে? সবাইকে এক চিকিৎসা দিলে হবে না। এই জন্য আল্লাহ্ ওয়ালাদের উপর কখনো আপত্তি না করা চাই।

এজন্যই হযরত মির্জা মাজহার জানে জানা রহ. ঐ দুই ছাত্রকে এই শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তোমরা বল্খে ফিরে যাও এবং সেখানকার হাউজ মেপে আস। আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁর অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছিলেন যে, এটাই তাদের চিকিৎসা। একবার যখন আঘাত লেগে যাবে তো সারা জীবন তা কাজে আসবে। এবং কাজ হয়েও গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে এ সবকও দিলেন যে, যবান ব্যবহারে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর না; অথচ তা অত্যন্ত জরুরী।

আগে ভাব, পরে বল

এই সতর্কতা অবলম্বনের পথ হযরত এভাবে বাতলে দিয়েছেন যে, প্রথমে চিন্তা কর, আমি যা বলতে চাচ্ছি তা বলা ঠিক কি ঠিক নয়। তাতে সীমালঙ্ঘন হচ্ছে কি না? তাতে কোন মিথ্যার মিশ্রণ আছে কি না, তাতে অতিরঞ্জন হচ্ছে কি না বা তা অসতর্কতাবশত হচ্ছে কি না? ইত্যাদি।

আজকাল অনেক ঝগড়া ফাসাদ শুধু এই জন্য হয় যে, একজন ঠিকমতো না বুঝেই এদিকের কথা সেদিকে, সেদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে দেয়। যাচাই-বাছাই করে না, ঠিক মত স্মরণ রাখে না। আধা বুঝে আধা না বুঝে অন্যত্র বলে দেয়। আর এই এক কথার কারণে পুরো মহল্লায় পুরো এলাকায় ফেতনা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই যা শোন প্রথমে তা ভাব যে কি বলা হল? কি পরিমাণ বলা হল। তারপর যদি কাউকে বলতে হয় তাহলে এই পরিমাণই বল, নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলো না।

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন আমাদের যবান যেহেতু সার্বক্ষণিক বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু বলতেই থাকে; থামার নাম নেয় না, তো বলার আগে কখন আবার চিন্তা করব? কিভাবে চিন্তা করব? এর উত্তরে হযরত বলেন, প্রত্যেক কাজই অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই চর্চা করতে থাক। এতে প্রথমে হয়তো চিন্তা করার কথা মনেই থাকবে না। কিন্তু যদি সামান্য একটু খেয়াল কর তাহলে ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। শুরুতে যদি চিন্তা করতে ভুলে যাও তাহলে যখন মনে পড়ে তখন চিন্তা কর। আবার যখন ভুলে যাবে এবং পরে মনে পড়বে তখন আবার চিন্তা কর। এভাবে করতে করতে চিন্তা করার অভ্যাস হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে অনায়াসে চিন্তা এসে যাবে। তখন চিন্তা করে বলার জন্য বিশেষ কোন খেয়াল রাখার প্রয়োজন হবে না। বরং তখন যা যা বলবে সব ঠিকঠিক বের হবে। গীবত, মিথ্যা ও অন্যের মনোকষ্টকর কথা ইত্যাদি থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র পথ।

গীবত করার জন্য নফসের বাহানা

এক ব্যক্তি হযরতকে চিঠি লিখেছে–

'আমার নফস আমাকে এই বাহানা দেখায় যে, মানুষও তো তোমার গীবত করে। সুতরাং কেয়ামতের দিন যারা তোমার

গীবত করেছে তাদের কাছ থেকে তুমি যে প্রতিদান পাবে তা তুমি যাদের গীবত করতে তাদেরকে দিয়ে দিবে।' (তাহলেই তো তোমার কোন সমস্যা হবে না।)– আনফাসে ঈসা-১৫০)

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি কারো গীবত করে তার (আমলের) সওয়াব ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। এজন্য আমার মাথায় এ কথা এসেছে যে, মানুষও আমার গীবত করে আমিও মানুষের গীবত করি। তো আমার সওয়াব যেমন মানুষকে দিয়ে দেয়া হবে মানুষের সওয়াবও তো আমাকে দিয়ে দেয়া হবে। তাহলে যখন বরাবর হয়ে গেল তো এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কি আছে।

তার চিঠির উত্তরে হযরত থানভী রহ. লিখেছেন,

> 'প্রথম কথা হল, একথার কোন প্রমাণ নেই যে, তুমি অন্যের কাছ থেকে যা পাবে তাই তোমার কাছ থেকে যারা পাবে তাদেরকে দেয়া হবে। এমনও সম্ভবনা আছে যে, তাদের কাছ থেকে পাওয়া সওয়াব তোমার কাছেই থেকে যাবে, যা তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। আর তোমার নিজের আমলের সওয়াব অন্যদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত বরাবর হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। হতে পারে তুমি কম পাবে আর তোমার কাছ থেকে বেশি চলে যাবে। তাহলে তোমার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে?' (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, তোমার কাছে একথার কি প্রমাণ আছে যে, তোমার গীবতকারীদের কাছ থেকে তুমি যা পাবে তাই তোমার কাছ থেকে অন্যদেরকে দেয়া হবে। এমনও তো হতে পারে, অন্যের কাছ থেকে যা পাবে তা তোমার কাছে থেকে যাবে আর তোমার নামায, রোযা, তোমার তেলাওয়াত, তোমার যিকির ইত্যাদি সব তোমার গীবতের কারণে অন্যকে দিয়ে দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত তুমি অন্যের কাছ থেকে যা পাবে এবং তোমার কাছ থেকে অন্যকে যা দেয়া হবে তা যে সমান সমান হবে এটারই বা কি নিশ্চয়তা আছে। হতে পারে তোমাকে কম দেয়া হবে আর (তুমি বেশি গীবত করেছ এজন্য) তোমার কাছ থেকে বেশি নেয়া হবে।

এসব শয়তানী বাহানা

এসব হচ্ছে শয়তানী বাহানা এবং শয়তানী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। মানুষকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করার জন্য শয়তান মানুষের অন্তরে এসব কুমন্ত্রণা দেয়; বলে, একাজ কর, এভাবে ঠিক হয়ে যাবে ও কাজ কর, ওভাবে ঠিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ হেফাজত করুন! আখেরাতে যখন দান-প্রতিদানের প্রশ্ন আসবে এবং নিজের আমলের সওয়াব অন্যের কাছে চলে যাবে তখন বুঝা যাবে এ ব্যাখ্যা কত বড় ধোঁকা ও প্রতারণা ছিল। অনেক নেক কাজ করেছ; নামায পড়েছ। রোযা রেখেছ তেলাওয়াতের মধ্যে রমযান মাস অতিবাহিত করেছ, ইতেকাফের তাওফীক হয়েছে, রাত জেগে যাবতীয় নফল ইবাদতে কাটিয়েছ। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখা গেল সব আমলের সওয়াব অন্যের আয়ত্ত্বে চলে যাচ্ছে; জীবনে যা করেছে সব অন্যকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তখন যে কষ্ট ও আফসোস হবে তা থেকে মুক্তির কোন উপায় থাকবে না। তাই এমন ভাবা যে, সেখানে গিয়ে সব সমান সমান হবে নিতান্তই ভুল ভাবনা। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

গীবতের চিকিৎসা হিম্মত এবং শাস্তির কথা স্মরণ করা

এরপর হযরত বলেন–

> 'গীবত মানুষের ইচ্ছাধীন একটি বিষয়। তার চিকিৎসার উপায় হল হিম্মত করা এবং তার জন্য পরকালে যে শাস্তি রয়েছে তা স্মরণ করা। আর চিকিৎসার সহায়ক হল, একবার যখন গীবত হয়ে যাবে তখন একবেলা না খেয়ে থাকো কর।'

(আনফাসে ঈসা-১৫০)

এখানে হযরত থানভী রহ. প্রথমে বলেছেন, গীবত মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। তাতে কেউ কখনো বাধ্য হয় না। যদি বাধ্য হত তাহলে তা হারাম হত না। আল্লাহ এমন কোন কাজ হারাম করেননি যা থেকে বাঁচা মানুষের সাধ্যে নেই।

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

আল্লাহ্ কাউকে তার সামর্থের বাইরে নির্দেশ দেন না।

সুতরাং গীবত থেকে বাঁচাও মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। তবে তার জন্য হিম্মতের প্রয়োজন হয় এবং এ গোনাহের আযাবের কথা স্মরণ করতে হয়। বান্দাকে এই হিম্মত করতে হবে যে, এই গোনাহ্ আর করব না, এই যবান দিয়ে কোন অন্যায় কথা বের করব না। এই কথা স্মরণ করতে হবে যে, এটা কত বড় অন্যায় কত বড় গোনাহ্। এর কারণে নিজের যাবতীয় আমল অন্যের আমলনামায় চলে যাবে। পরকালে এর জন্য কত কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে!

গীবতের কারণে নফসকে শাস্তি দেয়া

এরপর বলেছেন, গীবত থেকে বাঁচার জন্য একটা বিষয় সহায়ক হিসাবে কাজ করে। তা হল বান্দা এটা ঠিক করে নিবে যে, যদি ভবিষ্যতে কখনো গীবত হয়ে যায় তাহলে আমি নিজেই নিজেকে এ রকম শাস্তি দিব। হযরত বলতেন, এই শাস্তিটা এত হালকা না হওয়া চাই যে, নফস তার কোন পরোয়াই করে না। যেমন আমার আব্বাজান একটি ঘটনা শোনাতেন। যখন আলীগড় কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন সেখানে আইন ছিল প্রত্যেক ছাত্রকে মসজিদে এসে নামায পড়তে হবে। যদি না আসে তাহলে নামায প্রতি দুই আনা করে জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু দেখা গেছে অনেক ছাত্র একমাসের জরিমানা একসঙ্গে মাসের শুরুতে অগ্রীম জমা করে দিত। কারণ জরিমানা এত সামান্য ছিল যে, তা আদায় করা তেমন কোন কষ্টকর ছিল না। আর এই রকম জরিমানা আরোপে কোন ফায়দাও হয়নি। তাই জরিমানা এই পরিমাণ হওয়া চাই, যা আদায় করতে কিছু কষ্ট হয়। আবার এত কঠিনও না হওয়া চাই, যা মানুষ বরদাস্ত করতে পারবে না। না হয় সে জরিমানাও ছাড়বে আসল আমলও ছাড়বে। জরিমানা হওয়া চাই মধ্যম পর্যায়ের, যা আদায়ও করতে পারে, আবার আদায় করতে কিছুটা কষ্টও হয়।

গীবতের জন্য নফসকে উপবাস করানো

কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় আর্থিক জরিমানা বেশি উপকারী হয়। এটা ঐসব লোকের হয় যাদের জন্য সদকা করা কষ্টকর। এ জাতীয় লোকেরা ঠিক করবে যে, আমি যদি আর কখনো এই গোনাহ করি তাহলে এত টাকা সদকা করব। এতে তার নফসের শাস্তি হবে।

আর যাদের টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন পরোয়া নেই তাদের উচিৎ নিজের উপর এমন কোন জরিমানা আরোপ করা, যা আদায় করতে কিছুটা কষ্ট হয়। যেমন হযরত এখানে বলেছেন, এমন ব্যক্তি এটা ঠিক করে নিবে যে, আমি যদি কখনো গীবত করি তাহলে এক বেলা না খেয়ে থাকবো। খানা খাব না অনশন করব। আজকাল তো মানুষ অনশনের জন্য উল্টা নিয়ম বের করেছে। যখন অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় তখন তারা অনশন করে। অন্য ব্যক্তি যদি এ চাপ গ্রহণ না করে তাহলে তো না খেয়েই মরতে হয়। এটা ঠিক নয়। হযরত এখানে যে অনশনের কথা বলেছেন, তা হল নিজের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য। আমি এজন্য উপবাস করছি যে, আমি যেন ভবিষ্যতে আর কখনো গীবত না করি। যদি যখনো করে ফেলি তাহলেই নফসকে উপবাসের শাস্তি দিব। এই উপবাস এমন চিকিৎসা যার উপর আমল করলে অল্প কিছু দিনেই চিকিৎসা হয়ে যাবে এবং গীবত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

অন্যের দোষ প্রকাশ করার বিধান

এক ব্যক্তি হযরতকে প্রশ্ন করেছে–

> 'যেসব লোক কবীরা গোনাহে লিপ্ত তাদের গোনাহ এবং দোষ প্রকাশ করে দেয়াও কি গীবত হবে? নফস সবসময় এই বলে প্ররোচিত করে যে, এদের দোষ যদি মানুষের কাছে প্রকাশ করা না হয় তাহলে মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত হবে। আর মুসলমানদেরকে ধোঁকা থেকে বাঁচানো জরুরী।'

(আনফাসে ঈসা-১৫০)

অর্থাৎ, কোন লোকের ব্যাপারে আমার জানা আছে, সে এই এই অন্যায়ে লিপ্ত। এখন তার এই দোষগুলো মানুষের জানা থাকা দরকার, যাতে মানুষ ধোঁকা না খায়। এক্ষেত্রে তার দোষ বলা যাবে কি যাবে না?

যে ব্যক্তি এই প্রশ্ন করেছে সে ইসলাহের পথে এসেছে কেবল। শুরুতেই সে এই প্রশ্ন করে বসেছে। তাই তার জবাবে হযরত বলেছেন।

প্রাথমিক পর্যায়ের লোক জায়েয গীবতও করবে না

'এই প্রশ্ন ঐ ব্যক্তির উপযোগী যে এ পথের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর যে ব্যক্তি প্রাথমিক স্তরের তার জন্য জায়েয গীবত থেকেও বাঁচা জরুরী।' (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং নিজের ইসলাহের পথে এই মাত্র প্রবেশ করেছে এখন তো তার নফসের পরিমার্জন হতে হবে। তার কর্তব্য হল, জায়েয গীবত থেকেও বেঁচে থাকা। এটা সেই একই কথা, যা হযরত ইয়াকুব নানুতভী রহ. একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, একটি কাগজ যেমন একদিকে মোড়ানোর পর স্বাভাবিকভাবে তা আর সোজা করা যায় না। সোজা করার একটি মাত্র উপায়। তা হল আবার উল্টা দিকে মুড়ে দেয়া। তাহলে তা স্বাভাবিকভাবে সোজা হবে। ঠিক তেমনি মানুষের নফসও উল্টা দিকে মোড়ানো। সে না জায়েয গীবতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস ছাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হল প্রথমে তাকে জায়েয গীবত থেকেও বিরত রাখা। তাহলেই নফস সোজা হবে এবং পরবর্তীতে আর না জায়েয গীবতও তার দ্বারা হবে না। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অষ্টম মজলিস

অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া

(كيفيات انفعاليه)

অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার দাবী পূরণ

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ. কে লিখেছেন–

'কেউ যদি আমার অন্যায় গীবত করে এবং আমি তা জানতে পারি তাহলে অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।'

(আনফাসে ঈসা-১৫০)

অর্থাৎ, যখন আমি জানতে পারি অমুক আমার অগোচরে আমার সমালোচনা করেছে, তখন অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তার প্রতি যেন মনে এক রকম রাগ এসে যায়।

হযরতকে ঐ ব্যক্তির এ অবস্থা জানানোর উদ্দেশ্যে ছিল, যদি আমার এ অবস্থা সহীহ হয় তাহলে তো ঠিক আছে। কিন্তু যদি এটা আমার জন্য ক্ষতিকর ও সংশোধনযোগ্য হয় তাহলে তার চিকিৎসা কি হবে?

তার উত্তরে হযরত থানভী রহ. বলেছেন–

'এই দুটি অবস্থা হল انفعال। তথা অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া, যা সম্পূর্ণ মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত। আর এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয় নিন্দনীয়ও নয় এবং তাতে গোনাহ নেই। অবশ্য এই প্রতিক্রিয়ার চাহিদা পূরণ করা এবং তার দাবী অনুযায়ী কাজ করা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। যেমন, মনে এরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ফলে তুমিও তার গীবত আরম্ভ করে দিলে, অথবা তাকে কষ্ট দিতে শুরু করলে। তাহলে এক্ষেত্রে অনেক সময় গোনাহও হয়ে যায়। সুতরাং যখন এ জাতীয় অবশ্যম্ভাবী

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তখন তার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করবে না। এবং তা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। হে আল্লাহ, আমার এসব খেয়াল অন্তর থেকে বের করে দাও। যাতে এটা আমাকে গোনাহ্ পর্যন্ত না পৌছে না দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গোনাহ্ ও দোষ-ক্রটির কথা স্মরণ করবে, যাতে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায় যে, সে আমার যে সমালোচনা করেছে আমি তো আসলে আরো বেশি সমালোচনা ও ভর্ৎসনার যোগ্য। এবং সম্ভাব্য গোনাহের শাস্তির কথাও স্মরণ করবে যাতে ঐ প্রতিক্রিয়াটা দুর্বল হয়ে যায়। এক সপ্তাহ্ পরে আবার অবস্থা জানাবে। (প্রাগুক্ত)

মনে খারাপ চিন্তা আসা

উপরোক্ত আলোচনায় হযরত থানভী রহ. একটি নীতি এবং তার উপর আমল করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। এবং অল্প কথায় যে বিষয়টির বাস্তবতা ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। তা খুবই মূল্যবান।

বিষয়টি হল, কোন খারাপ চিন্তা নিজে নিজে মানুষের অন্তরে আসা এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। এতে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ভূমিকা নেই। এজন্য এবিষয়ে আল্লাহর কাছেও কোন জবাবদেহিতা নেই; কোন গোনাহ নেই। এমনকি কোন কঠিন থেকে কঠিনতর গোনাহ্ বরং (আল্লাহ্ হেফাজত করুন) কুফর শিরকের খেয়ালও যদি নিজে নিজেই কারো অন্তরে এসে যায়, তার কারণেও কেউ ভর্ৎসনা বা শাস্তিযোগ্য হবে না এবং তার কাজটাও গোনাহ্ বলে গণ্য হবে না। কারণ এই খেয়াল তার অন্তরে অনিচ্ছাকৃত এসে গেছে।

অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া গোনাহ্ নয়

এমনিভাবে অন্যের কোন কাজের কারণে অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে আরবীতে 'ইনফেয়াল' বলা হয় (তার উপরও কোন গোনাহ্ নেই) ইনফেয়াল বলতে বোঝায় অন্যের কোন কাজের প্রভাবে অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় বা যে পরিবর্তন আসে তবে। যেমন, কেউ একজনকে গালি দিল- ফলে তার অন্তরে একটা উত্তেজনা বা রাগ সৃষ্টি হল যে, সে আমাকে গালি

দিল, আমার পূর্বপুরুষকে মন্দ বলল? এই উত্তেজনা ও রাগ সৃষ্টি হওয়ার নামই ইনফেয়াল যা সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূত; বরং মানুষের জন্মগত ও স্বভাবজাত বিষয়। এর জন্য কোন গোনাহ্ হবে না।

তার চাহিদা পূরণ করা গোনাহ

কোন কোন আল্লাহর অলী এমন হন, যারা নফসকে এমনভাবে নিষ্পেষণ করেছেন যে, তাদের মনে কখনো রাগ আসেই না। কেউ গাল মন্দ করে দিলেও তাদের মনে সামান্যতম প্রভাব বা পরিবর্তনও আসে না, তাঁরা হলেন আল্লাহর খাস বান্দা। রিয়াযত মুজাহাদার ফলে তাদের নফস থাকে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত ও নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু এখানে সাধারণ লোকের আলোচনা হচ্ছে। যখন একজন সাধারণ মানুষকে গালমন্দ করা হয় তখন তার অন্তরে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এতে কোন গোনাহ্ নেই। এর কোন শাস্তি নেই এবং এর জন্য কাউকে ভর্ৎসনাও করা যাবে না। তবে কাজের মাধ্যমে যদি ঐ প্রতিক্রিয়ার বহি:প্রকাশ ঘটে যায়; যেমন কেউ গালি দিয়ে বলল তুই খবীস। এখন যদি তুমি ও তার উত্তরে বল তুই খবীস, তোর বাবা খবীস এবং এতে তুমি সীমালঙ্ঘন করে ফেল, তাহলেই তোমার গোনাহ্ হবে। তার গালির কারণে তোমার অন্তরে অনিচ্ছাকৃত যে রাগ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল তা কোন গোনাহ্ ছিল না এবং ঐ রাগের ফলে তার কাছ থেকে বদলা নিতে গিয়ে যতক্ষণ তার বরাবর ছিলে ততক্ষণও (আমরা আশাবাদি) কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু যখনই বদলা নিতে গিয়ে তুমি সামান্য সীমা ছাড়িয়ে গেলে তখনই তা গোনাহ্ হয়ে গেল। মানুষ যখন তার রাগের চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী কাজ করতে যায় তখন সাধারণত সে সীমার ভিতরে থাকতে পারে না; বরং সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই সীমালঙ্ঘন খুবই ভয়ঙ্কর। কারণ এটা নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার এবং এজন্য আখেরাতে জবাবদেহি করতে হবে।

ক্ষমা করে দেয়াই নিরাপদ

মনে কর! তোমাকে কেউ ঘুসি মারল। এখন তুমি যদি তার বদলা নিতে যাও তাহলে সে যত জোরে মেরেছে ঠিক মেপে মেপে তত জোরে মারা অসম্ভব। বরং কিছুটা বেশি হয়েই যেতে পারে। এজন্যই নেককারদেরকে

কেউ মারলে তারা তার প্রতিশোধ নেন না। তারা ক্ষমা করে দেয়াকেই নিরাপদ ভাবেন। কারণ যদি সামান্যও সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়, তাহলেই তো কেয়ামতের দিন জবাবদেহি করতে হবে।

বুযুর্গদের বিচিত্র রং

হযরত থানভী রহ. 'আরওয়াহে সালাসা'য় লিখেছেন, এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গের কাছে গিয়ে বলল, হযরত আমি শুনেছি বুযুর্গদের রঙ বিচিত্র হয় কারো এই রঙ কারো ঐ রঙ ইত্যাদি। আমি বুযুর্গদের এই রঙবৈচিত্র দেখতে চাই। বুযুর্গ তাকে নিষেধ করলেন; আরে ভাই এ আবার কোন ধান্দায় পড়লে তুমি। এসব ছাড়। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। বুযুর্গের পিছনে লেগেই থাকল। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আচ্ছা এক কাজ কর। অমুক গ্রামের মসজিদে গিয়ে দেখবে তিনজন বুযুর্গ ইবাদতে মগ্ন আছেন। তুমি পেছন থেকে গিয়ে সবাইকে একটা একটা করে ঘুসি দিবে। তারপর কি হয় আমাকে এসে জানাবে। কথা মতো সে ঐ গ্রামের মসজিদে গিয়ে দেখল ঠিকই তিন বুযুর্গ ইবাদতে মগ্ন। সে এক এক করে তিনজনকেই ঘুসি মারল। যখন ফিরে এল বুযুর্গ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ভাই বল। সে বলল, বড়ই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। যখন প্রথম বুযুর্গকে ঘুসি মারলাম তিনি পিছনে ফিরেও তাকালেন না। তিনি আগের অবস্থায়ই নিজের যিকির-আযকারে ব্যস্ত থাকলেন। যখন দ্বিতীয়জনকে মারলাম, তখন তিনি পেছনে ফিরে আমাকেও অনুরূপ একটা ঘুসি মেরে দিলেন। তারপর যখন তৃতীয়জনকে মারলাম তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে আমার হাত টিপতে লাগলেন এবং বললেন, ভাই! তোমার হাতে ব্যাথা পাওনি তো?

তারপর ঐ বুযুর্গ তাকে বললেন, তুমি যে বুযুর্গদের রঙবৈচিত্র দেখতে চেয়েছিলে এটাই হল তাদের রঙবৈচিত্র, যা তুমি দেখেছ।

গন্তব্যে পৌঁছতে বাধা

প্রথম বুযুর্গের রঙ ছিল এরকম। তিনি ভেবেছেন, আমি আল্লাহর যিকিরে মশগুল। যদি এর মাঝে আমাকে কেউ একটা ঘুসি মেরেই দিল তো এতে এমন কি আর হল। এখন যদি আমি পেছনে ফিরে দেখতে যাই, কে মারল, কেন মারল, তারপর তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে যাই

তাতে তো আমি গন্তব্যে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হব এবং আমি যে কাজে আছি তাতে ব্যাঘাত ঘটবে। এজন্য তিনি পিছনে ফিরেও তাকাননি যে, কে মারল। এটা ছিল এক রঙ।

অনুগ্রহের কারণে প্রতিশোধ

আর দ্বিতীয় বুযুর্গ যিনি পাল্টা ঘুসি মেরেছেন, তার সম্পর্কে বুযুর্গ ঐ লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তিনি যে, তোমাকে ঘুসি মারলেন, তিনি কি ঐ পরিমাণ জোরেই মেরেছিলেন যে পরিমাণ জোরে তুমি তাকে মেরেছিলে? সে উত্তর দিল, হাঁ! সেই পরিমাণ জোরেই মেরেছিলেন। বুযুর্গ বললেন, এটা ছিল অন্য রঙ। যেহেতু আল্লাহ্ বদলা নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন এজন্য তিনি বদলা নিয়ে নিয়েছেন। আর অনেক সময় আল্লাহ্ওয়ালাদের এই বদলা নেয়াও মায়া মহব্বতের কারণেই হয়ে থাকে। কারণ অনেক সময় কেউ যদি কোন আল্লাহ্ ওয়ালাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি তার বদলা না নিয়ে সবর করেন তখন তার এই সবর কষ্টদাতার জন্য আরেক খারাপ পরিণতি বয়ে আনে। (নাউযুবিল্লাহ্)। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন আল্লাহ্ওয়ালাকে কষ্ট দিল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।' সুতরাং কষ্টদাতা ব্যক্তিকে যেন তার এ অন্যায়ের খেশারত ভোগ করতে না হয়, এজন্য দ্বিতীয় বুযুর্গ তার বদলা নিয়ে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দিলেন। এটা ছিল আরেক রঙ।

তৃতীয় রঙ

তৃতীয় বুযুর্গের রঙ ছিল এরকম। তিনি ভেবেছেন আরে ভাই আমি আর কি ব্যাথ্যা পেয়েছি। কিন্তু যে আমাকে মারল, সে না কোন আবার আমার কারণে কষ্ট পেয়ে গেল। এই ভেবে তিনি তার হাত টিপতে লাগলেন। এ ছিল বুযুর্গদের রঙবৈচিত্র।

যাহোক! আমি যে কথা বলছিলাম যে, অন্যের কাজের কারণে তোমার অন্তরে যে ঘৃণা ও রাগের সৃষ্টি হয় তা কোন গোনাহ্ নয়। কিন্তু যদি ঐ রাগের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে ফেল তাহলে তা গোনাহ্ হবে এবং আল্লাহর কাছে তার জবাবদেহি করতে হবে। এই জন্য বলা হয় বদলা নিও না; বরং ক্ষমা করে দাও। তাতে তোমার লাভ হবে এই যে, তুমি সওয়াবও পেয়ে যাবে এবং নিজেকে আশঙ্কামুক্তও রাখতে পারলে।

এই খেয়ালকে পাকা হতে দিও না

অন্যের কারণে অন্তরে যে প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তার উপর যদিও কোন গোনাহ হবে না, কিন্তু এ খেয়াল ও চিন্তা যদি অন্তরে জমে বসে, তাহলে এক সময় তা অবশ্যই গোনাহ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ঠিক একই অবস্থা হিংসার ব্যাপারেও। যেমন তুমি কারো খুব উন্নতি অগ্রগতি হতে দেখলে। দেখে তোমার মনে এই খেয়াল আসল, আরে এতো আমার চেয়ে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। আমি অগ্রসর হতে পারলেই না ভাল হত। তার অর্থ বেশি, তার বাড়ি আমার বাড়ির চেয়ে বড়, তার গাড়ি আমার গাড়ির চেয়ে সুন্দর, তার সুখ্যাতি আমার চেয়ে বেশি। তার প্রশংসাকারী আমার চেয়ে বেশি। তার স্থানে যদি আমি হতাম তাহলে বেশি ভালো হত। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত যদি এই খেয়ালও এসে যায় যে, তার নেয়ামতগুলো যদি ছিনিয়ে নেয়া হত, আর আমি এগুলো পেয়ে যেতাম! এই খেয়ালও হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অন্যথায় তা গোনাহে লিপ্ত করে দিবে

কিন্তু যদি এই খেয়াল ও চিন্তা অন্তরে বসে যায় তখন কোন না কোন কাজ এমন হয়েই যায় যা ঐ লোকের কল্যাণকামনার পরিপন্থী যার ব্যাপারে অন্তরে হিংসার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। যেমন কোন সময় হয়তো বদ দোয়া করে দিবে, হে আল্লাহ! তার এই সম্পদ ছিনিয়ে নাও অথবা এমন কোন কাজ করে ফেলবে যাতে তার ক্ষতি হয়। অথবা মানুষের কাছে তার এমন আলোচনা করবে যাতে তার অপমান হয় কিংবা এমন কাজ করে বসবে যার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দিলের ঐ খারাপ চিন্তাটাকে শান্ত করা। আর এ গুলো সবই হারাম।

এখতিয়ার বহির্ভূত খেয়ালের চিকিৎসা

সুতরাং এই এখতিয়ার বহির্ভূত যে খেয়াল বা চিন্তা অন্তরে আসল, চাই তা হিংসা, ঘৃণা বা রাগ যাই হোক না কেন তারও চিকিৎসা করা জরুরী। কারণ তুমি যদি তার চিকিৎসা না করে অন্তরে জিইয়ে রাখ, তাহলে এক সময় তা তোমাকে মেরে ফেলবে। তার চিকিৎসা হল, প্রথমে এই

খেয়ালকে মন থেকে খারাপ মনে কর। এভাবে চিন্তা কর, আমার অন্তরে যে খেয়াল এসেছে তা খুবই খারাপ ও অন্যায়। এই খেয়াল আমার অন্তরে না আসা উচিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দোষ-ত্রুটির কথাও স্মরণ কর এবং এভাবে চিন্তা কর যে, সে তো আমার সম্পর্কে একটি কথাই বলেছ মাত্র। বাস্তবে তো আমি আরো বেশি বদনামের যোগ্য।

দোয়া হল অন্যতম চিকিৎসা

সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে দোয়া কর, হে আল্লাহ! আমার অন্তরে এই যে চিন্তা এসেছে তা যেন আমাকে হারাম কাজে লিপ্ত না করে। যার ফলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। হে আল্লাহ! আমার অন্তর থেকে এই খেয়াল বের করে দাও।

এভাবে এই খেয়ালের চিকিৎসা করা জরুরী। যদি তার চিকিৎসা না করে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে তা ধীরে ধীরে অন্তরে জমে বসবে এবং কোন না কোন সময় তোমাকে গোনাহে লিপ্ত করে দিবে। তাই এই খেয়ালকে খারাপ মনে কর এবং তার চিকিৎসার ফিকির কর। যদি অন্যের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হতে চায় তাহলে হিংসার চাহিদার সম্পূর্ণ বিপরীত চিকিৎসা অবলম্বন কর। যেমন মন চাচ্ছে সে যেন অপমানিত হয়। কিন্তু তুমি মনের এই চাহিদার উপর পাথর চাপা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কর, হে আল্লাহ তারে সম্মান বাড়িয়ে দাও। অথবা যদি মন চায় যে, মানুষ তার নিন্দা করুক এবং মানুষের দৃষ্টিতে সে তুচ্ছ হয়ে যাক। তাহলে তুমি জোর পূর্বক তার জন্য এই দোয়া কর, হে আল্লাহ! মানুষের দৃষ্টিতে তার গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। হিংসুক যখন এই দোয়া করবে তখন হয়তো তার দিলে করাত চলবে। কিন্তু এই করাতেই তার চিকিৎসা হয়ে যাবে। এমনিভাবে অন্যের প্রতি যদি ঘৃণা সৃষ্টি হয় তার চিকিৎসাও হল তোমার এ ঘৃণাকে মন থেকে খারাপ মনে করতে হবে।

দ্বিতীয় চিকিৎসা হল আযাবের কথা স্মরণ করা

শেষে হযরত থানভী রহ. বলেছেন, 'এইসব অন্যায় কাজের শাস্তির কথা স্মরণ করবে।' অর্থাৎ, আমার অন্তরে যে ঘৃণা সৃষ্টি হচ্ছে তা যদি আরো

অগ্রসর হয়ে আমাকে কোন গোনাহে লিপ্ত করে দেয়; যেমন গীবতে লিপ্ত করে দিল বা তার জন্য ক্ষতিকর কোন কাজে লিপ্ত করে দিল, তাহলে সে গোনাহের জন্য আমাকে আল্লাহর কত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে! এভাবে আযাবের কথা চিন্তা করবে, যাতে ঐ চিন্তা ও খেয়াল দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যায় এবং গোনাহে লিপ্ত করতে না পারে।

এক সপ্তাহ্ পর জানাবে

সবশেষে হযরত থানভী রহ. লিখেছেন, এক সপ্তাহ পর আবার অবস্থা জানাবে, কারণ চিকিৎসক দেখেন যে, এ ঔষধে তার কতটুকু কাজ হচ্ছে, যদি কাজ হয় তাহলে তো ঠিক আছে, কিন্তু যদি কাজ না হয় তাহলে ঔষধ পরিবর্তন করে দিবেন। তাই শুধু একবার শায়খের নির্দেশনা নেয়াই যথেষ্ট নয়।

আরেক কথা হল, হযরত এখানে যা বলেছেন, তা একটা ফর্মূলা বা মূলনীতির মত। ব্যক্তির ব্যবধানে কারো ক্ষেত্রে এ চিকিৎসা কাজে আসবে আবার কারো ক্ষেত্রে অন্য কোন চিকিৎসারও প্রয়োজন হতে পারে। তাই কেউ এই নীতি পড়ে যেন না ভাবে যে, আমি নিয়ম নীতি জেনে গিয়েছি। সুতরাং নিজেই নিজের চিকিৎসা করে নিব এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকব। শায়খের প্রয়োজন নেই।

হযরত থানভী রহ. বলেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং তারপরও শায়খের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও তুমি ইলম পেয়ে গেছ তবুও এক সপ্তাহ্ পর শায়খকে জানাবে তোমার ফায়দা কতটুকু হচ্ছে বা হচ্ছে না। তারপর শায়খ ফয়সালা করবেন তোমার এ চিকিৎসা যথেষ্ট কি যথেষ্ট নয়। অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন আছে কি নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

নবম মজলিস

গীবতের গোনাহ্ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

গীবতের গোনাহ্ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

গীবতের গোনাহ্ ক্ষমা পাওয়ার উপায়

হযরত থানভী রহ. বলেন,

'যদি কারো গীবত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করার পাশাপাশি গীবতকৃত ব্যক্তির কাছ থেকেও ক্ষমা চেয়ে নেয়া জরুরী। তবে এক্ষেত্রে গীবতের বিস্তারিত বিবরণ শোনানো তাকে কষ্ট দেয়ার শামিল। সুতরাং শুধু এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, আমি আপনার ব্যাপারে যা বলেছি এবং শুনেছি সব ক্ষমা করে দিন।'

(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫১)

হযরত থানভী রহ. তার এ বক্তব্যে গীবতের গোনাহ্ ক্ষমা চাওয়ার উপায় কি তা বলেছেন। গীবতের সম্পর্ক হল 'হুকূকুল ইবাদ' তথা বান্দার হকের সঙ্গে। কারণ এতে অপর মুসলিম ভাইয়ের হক পদদলিত করা হয়। আর বান্দার হক ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হয় না, যতক্ষণ না ঐ বান্দা তা ক্ষমা করে। সুতরাং আপনার কারণে যদি কারো কোন শারীরিক মানসিক বা অন্য কোন কষ্ট হয়ে থাকে তাহলে শুধু তাওবা করার দ্বারা তা ক্ষমা হবে না; বরং ঐ ব্যক্তির ক্ষমা করা জরুরী।

বান্দার হকের নাযুকতা

যে গোনাহ আল্লাহর হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত; যেমন মদপান করা বা ব্যাভিচার করা ইত্যাদি এগুলো থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায় হল, বান্দা যদি

একবার অন্তর থেকে তার গোনাহের উপর লজ্জিত হয়ে এবং ভবিষ্যতে আর গোনাহ না করার শপথ করে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় তাহলেই ক্ষমা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু বান্দার হক ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হবে না যতক্ষণ না ঐ বান্দা ক্ষমা করবে, যার হক সে নষ্ট করেছে। গীবতও এ প্রকারের গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য কেউ যদি শুধু তাওবা করে নেয় যে, হে আল্লাহ! যে গীবত আমি করে ফেলেছি তা থেকে তাওবা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন। তাহলে এর দ্বারা গীবতের গোনাহ ক্ষমা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কাছে ক্ষমা না চাওয়া হবে এবং যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করবে, এজন্যই হযরত থানভী রহ. তাঁর এই বক্তব্যে একথা বলেছেন যে, যদি কারো গীবত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ইস্তেগফারের সঙ্গে সঙ্গে যার গীবত করা হয়েছে তার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেওয়া জরুরী।

গীবতের বিবরণ দেয়া জরুরী নয়

অতঃপর হযরত থানভী রহ. বলেছেন, 'তবে গীবতের বিস্তারিত বিবরণ শোনানো তাকে কষ্ট দেয়ার শামিল।'

যেমন, তাকে একথা বলা যে, আমি অমুক সময় এই গীবত করেছিলাম এবং তোমাকে এই এই বলেছিলাম এবং তোমার এই এই দোষ বলেছিলাম। এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ গীবতের এ বিবরণ তাকে শোনালে তার কষ্ট পাবার আশঙ্কা আছে। এজন্য পূর্ণ বিবরণ তাকে শোনাবার প্রয়োজন নেই। বরং সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, আমি তোমার ব্যাপারে যা বলেছি এবং যা শুনেছি সব ক্ষমা করে দাও। দেখুন ক্ষমার জন্য আল্লাহ কত সহজ রাস্তা খুলে রেখেছেন।

'বলা-শোনা' ক্ষমা করে দিও

'বলা-শোনা' ক্ষমা করে দিও। আমাদের বুযুর্গদের মাঝে প্রচলিত একথাটি কতই না প্রজ্ঞাপূর্ণ। যখন থেকে হুঁশ-জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই বড়দের কাছে একথা শুনে আসছি যে, যখনই দু চারজন কিছু দিনের জন্য একসঙ্গে হতেন তারপর পৃথক হয়ে যেতেন তখনই একে অপরকে এ

সূচীপত্র

বাক্যটি বলতেন, 'ভাই আমার বলা-শোনা ক্ষমা করে দিও।' কারণ সফরে বা বাড়ীতে যেখানেই হোক দু চারজন যখন এক সঙ্গে থাকে তখন পরস্পরের কিছু না কিছু হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ভিন্ন হওয়ার আগেই তার ক্ষমা নিয়ে নাও। অন্যথায় কিছুদিন পর যখন মনে পড়বে যে, আমি তো অমুকের হক নষ্ট করেছি তখন তাকে কোথায় খুঁজে বেড়াবে? জানা নেই পরে কখনো তার সঙ্গে সাক্ষাত হবে কি হবে না। ক্ষমা নেয়ার সুযোগ হবে কি হবে না। অতএব পৃথক হওয়ার আগেই একাজ সেরে নেয়া চাই। এ বাক্যটি বললে গীবতের বিষয়টিও এসে যাবে এবং গীবতের গোনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে।

হযরত থানভী রহ.-এর নীতি

আমি হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর কাছে শুনেছি, হযরত থানভী রহ. বলতেন, যখন আমার কাছে কেউ বলে যে, আপনার গীবত করেছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আমি বলি, ভাই ক্ষমা তো অবশ্যই করব তবে আগে বল আমার কি গীবত করেছ? আর এটা স্বাভাবিক কথা যে যার হক নষ্ট করা হয়েছে তার সে হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার অধিকার অছে। থানভী রহ. বলতেন, এ প্রশ্নের একটি ফায়দা এটা হত যে, কখনো সে গীবত সত্য হত। কারণ গীবতের জন্য এটা জরুরী নয় যে, তা মিথ্যাই হবে। ফলে তার বলার দ্বারা নিজের দোষ সম্পর্কে জানা যেত।

আল্লাহর সৃষ্টি তোমাকে কি বলছে

দ্বিতীয়ত এর দ্বারা এটা জানা যেত যে, তোমার ব্যাপারে মানুষের নিরপেক্ষ মন্তব্য কী?

کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا

তোমার অজান্তে মানুষ তোমার ব্যাপারে কী মন্তব্য করে?

কারণ যারা তোমার আশপাশে থাকে তারা তো তোমার প্রশংসাই করবে। তোমার ভালোই বলবে। তাই তোমার পেছনে লোকে তোমাকে কি বলে? তোমার ব্যাপারে কি ধারণা রাখে? কি মন্তব্য করে? তাও তোমার জানা দরকার এবং তা তোমার জন্য উপকারী।

কারণ কোন মানুষই যদি সবসময় শুধু প্রশংসাই শুনতে থাকে, তাহলে কোন কোন সময় মানুষের মনে আত্মগরিমা সৃষ্টি হয়ে যায়। সে ভাবে, যখন সব মানুষই আমার প্রশংসা করছে তাহলে আমার মধ্যে কোন পূর্ণতা ও যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে, যার কারণে এসব মানুষ আমার পেছনে পড়ে আছে।

এই আত্মাহংকারের চিকিৎসা হল, তুমি এটা মনে করবে যে, দেখ তোমার থেকে দূরে থাকা মানুষ তোমার ব্যাপারে কী ধারণা রাখে এবং কী মন্তব্য করে? এর দ্বারা মানুষের আত্মাহংকারের চিকিৎসা হয়। এজন্য হযরত থানভী রহ.-এর কাছে যারা ক্ষমা চাইতে আসত তাদের তিনি বলতেন, ভাই ক্ষমা তো করব, তবে আগে বল কী গীবত করেছিলেন, তাহলেই ক্ষমা করব।

সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সংক্ষেপে ক্ষমা চেয়ে নাও

এখন প্রশ্ন হল, কার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে? আগে তো আর খেয়াল করিনি। কত মানুষের গীবত করেছি কে জানে? এখন কি তাদের লিষ্ট তৈরী করে তাদের সকলের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে? আমার মুহতারাম আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলতেন, আরে ভাই! জান্নাত নিতে চাও? জান্নাত এত সস্তা নয়। সুরতাং প্রথমে নিজের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর, পাড়া-প্রতিবেশী এবং যাদের সঙ্গে উঠা-বসা হয় তাদের লিষ্ট বানাও। এরপর তাদের নিকট গিয়ে সংক্ষেপে ক্ষমা চেয়ে নাও।

সাহবায়ে কেরামের কাছে রাসূল ﷺ -এর ক্ষমাপ্রার্থনা

আমি আপনি কোন্ স্তরের লোক! অথচ যিনি আমার আপনার সকলের সরদার জনাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সাহাবায়ে কেরামের ভরা মজলিসে ক্ষমা চেয়ে বলছেন, আমার উপর যদি কারো হক থেকে থাকে, তাহলে তা আমাকে বলে আদায় করে নিবে। আর কেউ শারীরিক কোন কষ্ট পেয়ে থাকলে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিবে। নতুবা আমাকে ক্ষমা করে দিবে। দেখা গেল এই ঘোষণা শুনে জনৈক সাহাবী

দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি একদিন আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন। সুতরাং আপনার উপর আমার হক রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি তোমার কোমরে আঘাত করে থাকি, তাহলে অবশ্যই আমার উপর তোমার হক রয়েছে। সুতরাং তুমিও এসে আমার কোমরে আঘাত করে তোমার বদলা নিয়ে নাও। সাহাবী কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যখন আমাকে আঘাত করেছিলেন তখন আমার কোমরে কোন কাপড় ছিল না, কিন্তু আপনার কোমরে তো এখন কাপড় আছে। রাহমাতুল্লিল আলামীন তখন অনায়াসে নিজের কোমরের কাপড় উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই সাহাবীর আসল উদ্দেশ্য ছিল মোহরে নবুওয়াতে চুমু খাওয়া। ফলে তিনি সামনে এসে এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং মোহরে নবুওয়াতে চুমু খেলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে প্রস্তুত ছিলেন যে, কোন ছোট একজন মানুষ এসেও যদি তার বদলা নিতে চায়, তবুও যেন সে তার বদলা নিতে পারে। আসলে অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় থাকে, পরকালের চিন্তা থাকে এবং আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার অনুভূতি থাকে, তখন দুনিয়ার এ সামান্য বাহ্যিক অপমান কিছুই মনে হয় না। কিন্তু আমাদের নফস এবং শয়তান ক্ষমা চাওয়ার এ ভাবনাকে এমন মূর্ত করে রেখেছে যেন ক্ষমা চাইলে আমাদের নাক কান কাটা যাবে, আমরা একেবারে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে যাব। আরে আমরা তো এমন হাজারো অপমানের জন্য প্রস্তুত। যদি নাকি তার বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেন।

মুহতারাম আব্বাজানের ক্ষমা প্রার্থনা

আমার মুহতারাম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. যখন অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে শায়িত তখন জ্ঞান ফেরার পর প্রথম আমাকে যা বললেন, তা হল–

> 'আমার পক্ষ থেকে পরিচিতজনদের সকলের নিকট একটি আবেদন লিখে পাঠিয়ে দাও যে, আমি যদি কারো গীবত করে

থাকি কিংবা কারো কোন ক্ষতি করে থাকি তাহলে যেন সে আমার কাছ থেকে তার বদলা নিয়ে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়।'

অতএব আমি তাঁর নির্দেশে کچھ تلافی مافات 'কিছু ক্ষতিপূরণ' শিরোনামে প্রথমে এ আবেদনপত্র মাসিক 'আল বালাগে' প্রচার করলাম। তারপর লিফলেট আকারে তাঁর পরিচিতজনদের সকলের নিকট পাঠালাম।

যাই হোক, সার কথা হল বান্দার হকের ক্ষমার জন্য শুধু তাওবা করে নেয়াই যথেষ্ট নয়। বরং যার হক তার কাছ থেকেও ক্ষমা নিতে হবে। আর গীবত করাও বান্দার হক নষ্ট করা। সুতরাং যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা নেয়া জরুরী।

যার গীবত করেছ তার প্রশংসা কর

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেছেন—

'তার সঙ্গে এটাও জরুরী যে, যাদের কাছে তার গীবত করেছিলে তাদের কাছে তার প্রশংসা করে একথা প্রমাণ করে দাও যে, আগে যা বলেছিলে তা ভুল ছিল।'

(আনফাসে ঈসা, প্রাগুক্ত)

কারণ তুমি তার কাছে হয়তো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছ এবং আল্লাহ্র কাছেও তাওবা ইস্তেগফার করে নিয়েছ। কিন্তু মানুষের মনে তুমি তার ব্যাপারে যে ঘৃণা সৃষ্টি করেছ তার ক্ষতিপূরণও জরুরী। এজন্য এখন তার প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা কর। এবং আগের কথা যে ভুল ছিল তা ভুল সাব্যস্ত কর। বল, আমি আগে যা বলেছিলাম তা ভুল ছিল।

এরপর তিনি বলেন—

'যদি তোমার ঐ কথা ভুল না হয়ে থাকে বরং তা সত্য হয় তাহলে এরকম বলে দাও যে, ভাই! শুধু এই কথার উপর ভিত্তি করে তার প্রতি খারাপ ধারণা করো না। কারণ স্বয়ং আমারই তো একথার উপর পূর্ণ আস্থা নেই। এরকম বললে

> এটা রূপক অর্থে সহীহ হয়ে যাবে। কারণ অহী ছাড়া সত্য কথার উপরও অকাট্য আস্থা হয় না।' (আনফাসে ঈসা প্রগুক্ত)

অর্থাৎ, তুমি যদি গীবতের সময় সত্য দোষ বলে থাক– কারণ সত্য কথাও গীবত হয়– তাহলে তো এখন একথা বলতে পারবে না যে ঐ কথা ঠিক ছিল না। এজন্য এখন এভাবে বলে দাও যে, আমার ঐ কথার উপর ভিত্তি করে তুমি তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করো না। কারণ স্বয়ং আমারও ঐ কথার উপর পূর্ণ আস্থা নেই। কেননা অহী ছাড়া অন্য কোন সত্য কথার উপরও পূর্ণ আস্থা অর্জিত হতে পারে না। পূর্ণ আস্থার জন্য হয় সরাসরি প্রত্যক্ষ হতে হবে নতুবা অহী হতে হবে। এছাড়া একশভাগ আস্থা অর্জনের জন্য কোন রাস্তা নেই। সুতরাং একথা বলতে কোন অসুবিধা নেই যে, আমারই ঐ কথার উপর আস্থা নেই। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আশা করি ঐ গীবতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। যা তুমি তার দোষ বর্ণনা করে করেছিলে।

যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মৃত হয়

এরপর হযরত থানভী এরশাদ করেন,

> 'যার গীবত করা হয়েছে ঐ ব্যক্তি যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায় হল, তার জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করতে থাকুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার অন্তর এই সাক্ষ্য না দিবে যে, আশা করি সে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ, তুমি যার গীবত করেছিলে এখন যদি তার মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে কীভাবে ক্ষমা নিবে। এক্ষেত্রে ক্ষমা নেয়ার পদ্ধতি হল তার জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার অন্তর একথার সাক্ষ্য দিবে যে, এখন হয়তো বা সে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য বান্দার হকের বিষয়টা যদিও খুব স্পর্শকাতর যে, বান্দা ক্ষমা না করলে ক্ষমা হয় না এবং ঐ বান্দা যদি মৃত্যু বরণ করে তবে তো তা আরো জটিল হয়ে পড়ে, তবুও কোন অবস্থায়ই হতাশ হওয়ার কারণ নেই। কোন অবস্থায় আল্লাহ নিরাশ হওয়ার সুযোগ রাখেননি যে, এখন তোমার ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ।

নিরানব্বইজন মানুষ হত্যাকারীর ক্ষমার পথ

বুখারী শরীফে একটি ঘটনা এসেছে যে, এক লোক নিরানব্বইজন মানুষকে অন্যায়ভাবে করেছিলো। তারপর তার তাওবা ইস্তেগফার করার চিন্তা হয়েছে। ফলে এক পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল, আমি তো ৯৯টি হত্যা করে ফেলেছি এখন আমার ক্ষমার কোন পথ কি খোলা আছে? পণ্ডিত বলল না, তোমার ক্ষমা পাবার কোন পথ খোলা নেই। তুমি সোজা জাহান্নামে যাবা। কারণ তুমি তো ৯৯ জনকে হত্যা করেছ। আর শুধু তাওবা করলে এ গোনাহ ক্ষমা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সকল নিহতের সকল ওয়ারিস থেকে তুমি ক্ষমা না নিতে পার। আর এত মানুষ থেকে তুমি কীভাবে ক্ষমা নিবে? সুতরাং তোমার ক্ষমার কোন রাস্তা নেই। তুমি জাহান্নামী। তখন সে বলল, আচ্ছা আমার ক্ষমার কোন রাস্তা নেই। তাহলে ৯৯টা হত্যা যখন করেছি তাহলে আরেকটা করে একশ পূর্ণ করে নেই। এই বলে সে ঐ পণ্ডিতকেও হত্যা করে ফেলল। এবং একশ হত্যা পূর্ণ করল।

এরপর সে অন্য এক পণ্ডিতের কাছে গেল। তার কাছে সব ঘটনা খুলে বলল যে, ৯৯টা হত্যা আমি আগেই করেছি। এখন আবার নতুন করে আরেকটা করেছি। এখন বলুন! আমার জন্য তাওবা ইস্তেগফারের কোন পথ খোলা আছে কি না। পণ্ডিত বললেন, হ্যাঁ তোমার তওবা ইস্তেগফারের রাস্তা খোলা আছে। তুমি প্রথমে তাওবা কর। তারপর অমুক এলাকায় কিছু নেনকার মানুষ থাকেন তাদের সাহচর্য অবলম্বন কর। এই পণ্ডিত তাকে নেককারদের সাহচর্যে যাওয়ার পরামর্শ এই জন্য দিয়েছেন যে, সে যদি খারাপ লোকদের সাহচর্য ছেড়ে ভাল লোকদের সাহচর্যে যায় তাহলে এই গোনাহ বর্জন করা তার জন্য সহজ হবে। ফলে সে তাওবা করল এবং নিজের বসতি ছেড়ে এই উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল যে, আমি আমার যিন্দেগীতে পরিবর্তন আনব এবং আগামী জীবনে আল্লাহর আনুগত্য করব। কোন নাফরমানী করব না। নেককারদের সান্নিধ্যে থাকব, আমার উপর অর্পিত সকল ফরয ওয়াজিব আদায় করব।

রাস্তার মাঝেই ফেরেশতার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হল, তার রূহ নিয়ে আস। ফেরেশতা তার রূহ নিয়ে গেল এবং সে মৃত্যুবরণ করল। তার

মৃত্যুর পর দুই প্রকারের ফেরেশতা এসে ঝগড়া শুরু করল। রহমতের ফেরেশতারা বলল, এই লোক তাওবা করে পবিত্র হয়ে নেককারদের সানিধ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য এলাকায় যাচ্ছিল। সুতরাং তাকে আমরা নিব। আযাবের ফেরেশতারা বলল, তার সারা জীবন গোনাহে অতিবাহিত হয়েছে। একশ মানুষকে সে হত্যা করেছে। সুতরাং তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমরা নিব। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের ঝগড়ার ফয়সালা এভাবে করলেন যে, দেখ সে যেই এলাকা থেকে বের হয়েছে এবং যেই এলাকার দিকে যাচ্ছিল মৃত্যুর সময় সে কোন এলাকার বেশি কাছে ছিল? মেপে দেখা গেল সে যেই এলাকার দিকে যাচ্ছিল সেই এলাকার কয়েক গজ বেশি নিকটে। তখন আল্লাহ বললেন, সে যখন তাওবা করে নেককারদের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছ এবং সেই এলাকার কাছে পৌঁছে গেছে, তাই আমিও তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই

তাই নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই যে, আমার কারণে অনেক বান্দার হক নষ্ট হয়েছে এবং যাদের হক নষ্ট হয়েছে তারা ইন্তেকাল করে গেছে। সুতরাং আমার ক্ষমা কীভাবে সম্ভব! বিষয়টি এমন নয়।

প্রথম কাজ হল বান্দার হকের বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন কর, বান্দার হক নষ্ট করাকে খুব গুরুতর মনে কর এবং কোন বান্দার হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। কিন্তু তারপরও যদি কারো হক নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাত তা ক্ষমা চেয়ে নাও। আর যদি ক্ষমা চাওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে নিরাশ হবে না, বরং তার জন্য ইস্তেগফার করতে থাক এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাক, হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে তোমার ঐসব বান্দাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও, যাদের হক আমি নষ্ট করেছি।

হে আল্লাহ! তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও; তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং তাদেরকে তোমার পূর্ণ সন্তুষ্টি দান কর। এই দোয়া করতে থাক যতক্ষণ তোমার অন্তরে এই প্রবল ধারণা সৃষ্টি না হবে যে, আশা করি সে এখন আমার উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের হযরত থানভী রহ.-এর শিক্ষা ও নির্দেশনায় হতাশ হওয়ার কোন কথাই নেই। তার সকল নির্দেশনার ভিত্তি হল একথার উপর–

سوئے ناامیدی مرو امید ہاست ☆ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست

আশার পথ যখন উন্মুক্ত হতাশার কোন কারণ নেই, সূর্য যখন আলো বিতরণ করছে অন্ধকারে পতিত হওয়ার কারণ নেই।

হযরত থানভী রহ. কখনো হতাশা বা অন্ধকারের দিকে যেতেই দিতেন না। বরং পথ দেখিয়ে দিতেন যে, এখন এভাবে কর এখন এভাবে কর। কারণ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ ক্ষমার কোন না কোন পথ অবশ্যই খোলা রেখেছেন।

কুফর ও শিরক থেকে তাওবা

দেখুন কুফর ও শিরক থেকে জঘন্যতর কোন কিছুই দুনিয়াতে নেই। কুফর ও শিরকের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, আমি তা ক্ষমা করব না। এ ছাড়া বাকি সব আমি ক্ষমা করব। কিন্তু তথাপিও আল্লাহ এই কুফর শিরক থেকে তাওবা করার পথ খোলা রেখেছেন। সত্তর বছরের কাফেরও যদি তার কুফর শিরক থেকে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।

শয়তানের প্ররোচনা

সুতরাং বান্দার হকের বিষয়টা যদিও একটু কঠিন, কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে তার কারণে হতাশ হয়ে বসে থাকতে হবে। শয়তান মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করার জন্য প্ররোচনা দেয় এবং বলে, আরে তুমি তো এই গোনাহের কারণে বিতাড়িত হয়ে গেছ। এখন তোমার ঠিকানা জাহান্নাম। তোমার ক্ষমার কোন রাস্তা নেই। সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা-ই কর। কারণ জাহান্নামে যখন যেতেই হবে তো দুনিয়ায় কিছুদিন ভালোভাবে মজা করে নাও; যা ইচ্ছা গোনাহ করে নাও। এভাবে শয়তান ধোঁকা দিয়ে আরো বেশি গোনাহে লিপ্ত করে দেয়।

অথচ বাস্তবতা হল, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কখনো মুমিনের কাজ নয়। যত বড় গোনাহ্ই হোক না কেন তবুও তা আল্লাহ্র রহমত থেকে বেশি হতে পারে না।

আবু নাওয়াসের ক্ষমার ঘটনা

আরবের এক কবি ছিল, যার উপনাম আবু নাওয়াস। সে ছিল মুক্তচিন্তার মানসিকতা সম্পন্ন কবি। ঐ সকল কবির অন্তর্ভুক্ত যারা সবধরনের গোনাহে লিপ্ত থাকে। ফলে সারা জীবন তার গোনাহে অতিবাহিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে কি আচরণ করলেন? উত্তরে বলল, আমি কি বলব! যখন আমার মৃত্যু হচ্ছিল তখন আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম যে, আল্লাহ্র সামনে যখন যাব তখন তো আমাকে এমন মারা হবে যে আমার সারা জীবনের স্বাদ মিটে যাবে। তাই আমার খুবই দুশ্চিন্তা এবং ভয় ছিল যে, এখন কী উপায় হবে? এই দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় আমি তিনটি কবিতা বলেছিলাম। আল্লাহ্র মেহেরবাণী, তিনি সেই কবিতার উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। স্বপ্নে সে ঐ কবিতাগুলোও শুনিয়েছে। খুবই অদ্ভূদ কবিতা ছিল সেগুলো। যখন আল্লাহ্ তাওফীক দেন তখন কবিরা তাদের কবিতায় ভাল কথা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কবিতাগুলো হল–

يَارَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِيْ كَثْرَةً + فَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَفْوَكَ اَعْظَمُ

اِنْ كَانَ لَايَرْجُوْكَ اِلَّامُحْسِنٌ + فَبِمَ يَلُوْذُ وَيَسْتَجِيْرُ الْمُجْرِمُ

অর্থ : হে প্রভু! যদিও আমার গোনাহ্ অনেক বেশি, অনেক বড়, তবে আমি জানি, তোমার ক্ষমা আরো বেশি, আরো অনেক বড়।

একমাত্র ভালো মানুষই যদি তোমার কাছে আশা করতে পারে, তবে অপরাধীরা কার দুয়ারে যাবে, কার কাছে আশ্রয় চাইবে?

وَمَدَدْتُ يَدَيَّ اِلَيْكَ تَضَرُّعًا + فَلَئِنْ رَدَدْتَ يَدَيَّ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ

তোমার দুয়ারে দুহাত পেতেছি ক্রন্দনরত ভিখারী আমি, যদি ফিরায়ে দাও

খালি হাতে তবে কে আর আছে দয়া করিবে বল।

এ কবিতা বলতে বলতে সে মৃত্যুবরণ করেছে। না জানি কত আবেগ, আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে সে এই কবতিাগুলো পড়েছিল। যার ফলে আল্লাহ তাকে বললেন, যাও এই কবিতার উসিলায় আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। এই কবিতাগুলো আবু নাওয়াসের কবিতার বইয়ে ছিল না। কারণ কবিতাগুলো সে জীবনের শেষ মুহূর্তে একেবারে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলেছিল। এজন্য তা বইয়ে সংকলনের সুযোগ ছিল না। স্বপ্রদ্রষ্টাকে আবু নাওয়াস স্বপ্নে বলে দিয়েছিল যে, এই কবিতাগুলো আমার রচিত। স্বপ্নদ্রষ্টা পরে এই কবিতাগুলো স্বপ্নের উদ্ধৃতিতে আবু নাওয়াসের কবিতার বইয়ে যোগ করে দিয়েছে।

বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা করো না

এজন্য বুযুর্গরা বলেন, কারো বাহ্যিক অবস্থা দেখে সে জান্নাতী না জাহান্নামী এ ফয়সালা করো না। কারণ আমাদের কি জানা আছে যে, তার কোন ভাব বা ভাবনা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়ে যাবে? তার শেষ পরিণাম কী হবে? ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন সে কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে যাবে। এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে তার বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক কাফেরকে সম্ভাবনার ভিত্তিতে আমার চেয়ে উত্তম মনে করি। সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলতে উদ্দেশ্য হল, হতে পারে এক সময় তাকে আল্লাহ ঈমানের তাওফীক দিবেন এবং সে দীনের দিক দিয়ে আমার চেয়েও অগ্রসর হয়ে যাবে। এজন্য বাহ্যত যে মানুষ যেমনই হোক না কেন তুমি তার খারাপ কাজকে ঘৃণা করতে পার! অর্থাৎ, তার মদপান ঘৃণ্য কাজ। কিন্তু তার সত্তাকে ঘৃণা করো না। কারণ হতে পারে, আল্লাহ তাকে তাওবার তাওফীক দিবেন আর সে কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে দীনের উপর সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দশম মজলিস

দোষ বর্ণনার জায়েয ক্ষেত্র

(গত মজলিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত)

দোষ বর্ণনার জায়েয ক্ষেত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

দোষ বর্ণনার জায়েয ক্ষেত্র

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন–

'যদি কোন দীনী প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে দোষ বর্ণনা করাও জায়েয; যেমন মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটির পর্যালোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে যদি দীনী প্রয়োজন না থাকে বরং শুধু নফসের চাহিদা মেটানোর জন্য দোষ বর্ণনা করা হয়, তাহলে তা সত্য হলেও হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। উপরন্ত যদি তা সত্য না হয়, তবে তো তা মিথ্যা অপবাদের শামিল। একটা কথা মিথ্যা বলে গণ্য হওয়ার ভিত্তি, কথাটা বাস্তবে মিথ্যা হওয়া নয় বরং তার সত্যতা যাচাই না করা।'

অর্থাৎ, আমার কথা যদি বাস্তবে সত্যও হয় কিন্তু আমি তার সত্যতা যাচাই না করেই বলে দিলাম, তাহলেও আমি মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হব।

অর্থাৎ দীনী প্রয়োজনে কারো দোষ বর্ণনা করা জায়েয। এজন্য সকল মুহাদ্দিসের কাজই ছিল মানুষের দোষ-গুণের পর্যালোচনা। অমুক বারী (বর্ণনাকারী) কেমন ছিল? অমুক রাবী কেমন ছিল ইত্যাদি? যখন কেউ তাদের কাছে কোন রাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, তখন তারা বলে দিতেন, অমুক দুর্বল, অমুক মিথ্যবাদী, অমুক মহামিথ্যাবাদী, অমুক গালমন্দকারী ইত্যাদি। কিন্তু এ দোষ বর্ণনা ছিল তাদের ওয়াজিব দায়িত্ব। যদি বর্ণনা না করেন তাহলে গোনাহ হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হেফাজত করার জন্য কোন রাবীর কী অবস্থা সবার সামনে তা স্পষ্ট

করে তুলে ধরা জরুরী ছিল। সুতরাং এই দোষ বর্ণনা যেহেতু দীনী প্রয়োজনে তাই এটা জায়েয।

হযরত আলী ইবনে মাদীনী রহ.-এর ঘটনা

হযরত আলী ইবনে মাদীনী রহ. অনেক উচ্চস্তরের মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং 'জরাহ-তাদীল' –রাবী পর্যালোচনার বিষয়ে ইমাম (সুপণ্ডিত) ছিলেন। তার পিতা হাদীস বর্ণনায় সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার পিতার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য কি না? তিনি প্রথমে বললেন, আমার পিতার ব্যাপারে এ প্রশ্ন তুমি অন্য কোন মুহাদ্দিসকে কর। কিন্তু প্রশ্নকারী পুণরায় বলল, না, তার সম্পর্কে আমি আপনার মন্তব্যই জানতে চাচ্ছি। যখন প্রশ্নকারী বার বার অনুরোধ করল, তখন তিনি মাথা নত করে বললেন

هُوَ الدِّيْنُ اِنَّهُ ضَعِيفٌ

যেহেতু বিষয়টি দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এজন্য বলছি, আমার পিতা হাদীস বর্ণনায় অনির্ভরযোগ্য।

অর্থাৎ, বিষয়টা যেহেতু দীনী তাই বাস্তবতা গোপন রাখার কোন অবকাশ নেই। চাই তা পিতা বা ছেলে যার বিরুদ্ধেই হোকনা কেন। দীনের প্রয়োজনে তা বলতেই হবে।

হযরত ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর ঘটনা

সুনানে আবু দাউদের সংকলক ইমাম আবু দাউদ রহ. এত বড় ইমাম, কিন্তু তাঁর ছেলে ইবনে আবু দাউদ ছিলেন হাদীস বর্ণনায় 'যয়ীফ' অনির্ভরযোগ্য। ইমাম আবু দাউদ রহ.-কে কেউ প্রশ্ন করলেন, আপনার ছেলের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? তিনি উত্তর দিলেন-

لَاتُحِلُّ عَنْهُ الرِّوَايَةَ

তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা আমি হালাল মনে করি না।

দেখুন মুহাদ্দেসীনে কেরাম রাবীদের দোষ বর্ণনার ক্ষেত্রে না পিতার পরোয়া করেছেন, না ছেলের পরোয়া করেছেন, না অন্য কোন বন্ধু-বান্ধব বা নিকটাত্মীয়ের পরোয়া করেছেন। কারণ এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিষয়। যেখানে রাবীদের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া ছিল দীনী প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা মুহাদ্দিসদের এই কাফেলাকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, এভাবে তাদের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণের কাজ করাবেন। এজন্য হযরত বলেন, যেখানে দীনী প্রয়োজন দেখা দিবে সেখানে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয বরং অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যকও বটে।

অন্যথায় তা হারাম গীবতের শামিল

'কিন্তু যদি দীনী প্রয়োজন না হয় বরং শুধু নফসের চাহিদা মেটানোর জন্য হয় তাহলে বাস্তব দোষ বর্ণনা করাও হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত।'

এখন এই পার্থক্য বুঝতে হবে যে, এ দোষ বর্ণনা বাস্তবেই কি দীনী প্রয়োজনে করছি, না নফসের চাহিদা মেটানোর জন্য এবং নফসকে আনন্দ দেয়ার জন্য করছি? ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রেই নফস গীবতের লোভে এই বাহানা অবলম্বন করে গীবতে লিপ্ত হচ্ছে যে, এটা দীনী প্রয়োজনে করা হচ্ছে। কিন্তু ভালোভাবে অন্তরের দিকে তাকালেই তখন বুঝা যাবে এটা আসলে আদৌ কোন দীনী প্রয়োজন ছিল না, বরং সম্পূর্ণই নফসের তাড়না ও ধোঁকা ছিল। মূলত এটা হারাম গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত। চাই তা বাস্তব সত্য হোক এবং যাচাই-বাছাইয়ে তার সত্যতা প্রমাণিত হোক না কেন, তবুও তা হারাম ও নাজায়েয।

সত্যতা যাচাই ছাড়া বলা অপবাদ

'সত্যতা যাচাই করা ছাড়া যদি কোন কথা বলা হয়, তাহলে তা মিথ্যা অপবাদের অন্তর্ভুক্ত।'

একটা কথা মিথ্যা বলে গণ্য হওয়ার ভিত্তি বাস্তবে কথাটা মিথ্যা হওয়ার উপর নয়, বরং কথাটির সত্যতা যাচাই না করার উপর।'

অর্থাৎ একটা কথা বাস্তবে যদি সত্যও হয় কিন্তু যিনি বলছেন, তিনি যদি কথাটার সত্যতা যাচাই না করে বা সত্যতার কথা নিশ্চিত না হয়েই বলে দেন, তাহলে তার জন্য তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। কারণ হাদীসে এসেছে–

كَفٰى بِالْمَرْأِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ

অর্থাৎ, একজন মানুষ মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে। (সুনানে আবু দাউদ, আদব অধ্যায়)

আমরা যখন কারো গীবত করি তখন শয়তান এসে আমাদেরকে এভাবে বুঝায় যে, তুমি যে তার দোষ বর্ণনা করছ এতে গোনাহের কিছু নেই। কারণ এটা তো তুমি দীনের প্রয়োজনেই করছ। অথচ বাস্তবে তাতে দীনের কোন ব্যাপার থাকে না, থাকে শুধু নফসের তাড়না। দুইটির মাঝে পার্থক্য করা কঠিন কাজ। একজন সুপণ্ডিত শায়খই পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন যে, কোনটা দীনের প্রয়োজনে হচ্ছে আর কোনটা নফসের তাড়নায় হচ্ছে। শয়তান দীনী প্রয়োজনকে ছুতা বানিয়ে গীবতে লিপ্ত করে দেয়। এ ধরনের গীবত সুস্পষ্ট গীবত থেকেও জঘন্যতর। কারণ এর দ্বারা সে যেন আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায় যে, হে আল্লাহ! আমি যে গীবত করছি তা আপনার দীনের প্রয়োজনেই করছি। সুতরাং এতে গীবতের গোনাহের সাথে সাথে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার গোনাহও হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের সকলকে গীবতের গোনাহ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

গীবতের কারণে শারীরিক কষ্ট হয়

হযরত থানভী রহ. বলেন–

'গীবতে মানুষ কত যে মজা পায়! সামান্য সময়ের জন্য নিজের নফসকে একটু খুশি করল তাতেই যেন কি হয়ে গেল। অথচ যদি ঐ ব্যক্তি তা জেনে যায় এবং তার সঙ্গে দুশমনি হয়ে যায়, তাহলে সারা জীবন তার কষ্ট ভোগ করতে হয়। যদি অন্তরে সামান্য অনুভূতিও থাকে তাহলে গীবত করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় যে, এর ফলে অন্তরে এমন

অন্ধকার সৃষ্টি হয় যার কারণে মনে মারাত্মক কষ্ট অনুভব মনে হয়। যেন কেউ গলা চেপে ধরেছে।' (আনফাসে ঈসা-১৫২)

যেহেতু আমাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে এবং অনুভূতি শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এজন্য আমরা গোনাহ্ করতে থাকি, কিন্তু গোনাহের অন্ধকার অনুভূত হয় না। আল্লাহ্ যাদের অন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন তাদের অন্তরে সামান্য একটু গোনাহেরও এমন অন্ধকার অনুভূত হয় যেন কেউ তার মাথার উপর দুনিয়ার অন্ধকার নেমে এসেছে। মাওলানা রূমী রহ. বলেন–

بر دل سالک ہزاراں غم بود ☆ گر ز باغ دل خلالے کم بود

'সালেক' (আল্লাহর পথের পথিক)-এর হৃদয় উদ্যান থেকে যদি একটি কণাও ঝরে পড়ে তবে তার হৃদয় আকাশে বিপদ মহা বিপদের তুফান ছুটে।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. সম্পর্কে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর কোন কিতাবে পড়েছি , একবার তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে আছেন। মনে হচ্ছিল যেন তাঁর উপর দুশ্চিন্তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। জনৈক শাগরিদ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আপনি ভালো আছেন? আপনাকে তো খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ! কিছু পেরেশানি আছে। তখন দারুল উলূম দেওবন্দে দস্তারবন্দীর মাহফিল চলছিল। হযরত বললেন, মাহফিলে এমন কিছু ব্যস্ততা এসে পড়েছিল, যার কারণে মসজিদে গিয়ে তাকবীরে উলা পাইনি। ইমাম সাহেবের প্রথম তাকবীর শুনতে পারিনি। এরপর বললেন, ৩৫ বছরে এই প্রথম তাকবীরে উলা ছুটে গেল। এবার আন্দাজ করুন যে, তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার অর্থ হল কেরাত শুনেছেন, রুকু পেয়েছেন এবং রাকাতও পেয়েছেন, এমনকি সহীহ মতানুসারে তাকবীরে উলাও পেয়েছেন. কিন্তু তবুও যেহেতু ইমাম সাহেবের প্রথম তাকবীর পাননি তাই তাঁর এত দুশ্চিন্তা।

আমাদের অনুভূতিহীনতা

অপরদিকে আমাদের অবস্থা হল, জামাত শেষ হয়ে যায় এবং অনেকেই আমরা মাসবুক হয়ে নিজ নিজ নামায আদায় করি; অথচ আমাদের সামান্য অনুভূতিও জাগে না। এর কারণ হল আমাদের অনুভূতিহীনতা। নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ মেহেরবানী করে তা দূর করে দিন। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতভী রহ.-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী রহ. বলেন, একবার এক লোকমা সন্দেহযুক্ত খাবার আমার পেটে চলে গেছে, যা হালাল না হারাম এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। যার ফলে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত সে সন্দেহযুক্ত খাবারের অন্ধকার অন্তরে অনুভব করেছি। আমাদের তো অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে, স্বভাব বিকৃত হয়ে গেছে। তাই গোনাহের অন্ধকার অনুভূত হয় না। মনে হয় যেন একটা মাছি এসে বসল আর তাড়িয়ে দিলাম। গোনাহের কাজকে আমরা এতই হালকা মনে করি। আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে আমাদের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করে দিন এবং স্বভাব দুরস্ত করে দিন! আমীন।

গীবত করে কী অর্জিত হল?

গীবত ছাড়ার জন্য এটা চিন্তা করা চাই যে, তুমি যদি কিছু সময় গীবত কর এবং গীবত করে কিছু মজাও অনুভব কর, কিন্তু এতে তোমার কি অর্জিত হল? এর ফলাফল তুমি কী পাবে? এবং এর পরিণতিই বা কী হবে? এটা স্পষ্ট যে, এতে লাভের কিছুই নেই; বরং তার পরিণামে আখেরাতে ভয়াবহ আযাব রয়েছে। আর দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তি যখন জানবে যে, তুমি তার গীবত করেছ, তখন তার অন্তরে তোমার ব্যাপারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। তাও খুব খারাপ পরিণতি বয়ে আনবে।

বান্দার হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোনাহের নিয়মই হল, বান্দা যখন এরকম একটা গোনাহ করে, তখন তার সঙ্গে আরো দশটা অন্যায় কাজ করতে হয়। যেমন, গীবত করার পর যদি ঐ ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এমন অন্যায় কথা আমার ব্যাপারে কেন বললে? তখন হয় তা স্বীকার করবে এবং

অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে, না হয় বানায়োট কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিবে, আমি এমন বলেছি বা এ উদ্দেশ্যে বলিনি ইত্যাদি অথবা মিথ্যার আশ্রয় নিবে যে, আমি এমন কথা বলিনি। মোটকথা! যাই বলুক না কেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন বুঝতে পারবে যে, সে আমার সঙ্গে মিথ্যা বলছে বা প্রতারনার আশ্রয় নিচ্ছে, তখন ঐ ব্যক্তির অন্তরে তার প্রতি আরো বেশি ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। সুতরাং একজন মানুষ কেন এমন কাজ করতে যাবে; যার ফলে পরস্পর ঘৃণা শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়? এতে কোনই ফায়দা নেই বরং অতিরিক্ত আরো নিজের অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয়।

গীবতের মূল চিকিৎসা হল তাওয়াযু

হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'গীবতের চিকিৎসাও বিনয়। তবে বিনয় একদিনেই সৃষ্টি হয়ে যাবে না। তাই বিনয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত গীবত থেকে বাঁচার জন্য তাৎক্ষণিক এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোন কথাই বলবে না। যে কথাই বলবে চিন্তা-ভাবনা করে বলবে। এতে গীবত কমে যাবে। এবং কিছুদিন পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি কখনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোন কথা বলে ফেল, তাহলে সাথে সাথেই 'সালাতুত তাওবা'র নিয়তে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিবে।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃ: ১৫২)

এই আলোচনায় হযরত প্রথম কথা বলেছেন, গীবত যেন কারো থেকে মোটেই না হয়। এর মূল চিকিৎসা হল, অন্তরে বিনয় সৃষ্টি করা। সব সময় মনে রাখবে যে, গীবত মূলত বিনয় না থাকার কারণেই হয়। যখন মানুষ নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকারে লিপ্ত হয় তখনই সে অন্যের গীবত করে। যার নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি খেয়াল আছে এবং তা সংশোধনের চিন্তা আছে তার আবার অন্যের দোষ বর্ণনার সুযোগ কোথায়? সে তো নিজের ব্যথায়ই কাতর, সে তো ভাবে, আমার মধ্যে এই দোষ আছে; আমার মধ্যে এই ত্রুটি আছে! কিভাবে তা সংশোধন করব? এই দুশ্চিন্তায়ই সে দিন

রাত ব্যস্ত। কোথায় সে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে? হাঁ তার অন্তরে যদি অহংকার থাকে এবং অন্যের প্রতি তুচ্ছ মনোভাব থাকে তাহলে তার যেহেতু নিজেকে নিয়ে চিন্তা নেই, তাই সে অন্যের দোষ-ক্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের কাছে এসব দোষ-ক্রুটি বলে বেড়ায়। সুতরাং গীবতের মূল কারণ হল তাকাব্বুর ও অহংকার। এই অহংকার শেষ হয়ে গেলে তখন আর গীবত হবে না। এজন্য গীবতের আসল চিকিৎসা হল, অহংকার দূর করা এবং বিনয় অর্জন করা।

আমাদের বুযুর্গদের বিনয়

একবার হযরত ড. হাফীজুল্লাহ রহ. দারুল উলূমে তাশরীফ আনলেন। তার কাছে একটি ঘটনা শুনলাম। হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ রহ. (যিনি জামেয়া খাইরুল মাদারিস মুলতান-এর প্রতিষ্ঠাতা) বলেছেন, যখন আমি থানভী রহ.-এর মজলিসে যেতাম তখন আমার মনে হত এই মজলিসে যত মানুষ আছে তাদের সকলের মাঝে আমিই সবচেয়ে অধম, নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে দুরাবস্থায় আছি। আর বাকি সবাই আমার চেয়ে উত্তম। বরং যেন এরাই শুধু মানুষ আর আমি হলাম পশু। এক সময় আমার চিন্তা হল, আমার এ অবস্থাটা ঠিক কি না? ফলে আমি হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান রহ. (জামেয়া আশরাফিয়া লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এবং আরজ করলাম, হযরত! আমার অবস্থা হল আমি যখন হযরত থানভী রহ.-এর দরবারে যাই তখন আমার মনে হয় আমিই সবচেয়ে অধম এবং নিকৃষ্টতম। আমার চেয়ে নিকৃষ্ট এবং অধম আর কেউ নেই। হযরত মুফতী সাহেব বললেন, আরে ভাই! এই অবস্থা তো আমারও। আমি যখন তাঁর মজলিসে যাই তখন মনে হয় যেন আমিই এই মজলিসে সবচেয়ে অধম এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এরপর হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব বললেন, আপনার আমার দুজনেরই যখন একই অবস্থা তো চলেন আমরা দুজনই হযরতকে আমাদের অবস্থা জানাই।

অবশেষে তাঁরা দুজনই হযরত থানভী রহ.-এর খেদমেত উপস্থিত হয়ে বললেন, হযরত আমাদের তো এ অবস্থা যে, আমরা যখন মজলিসে বসি

তখন মনে হয় এই মজলিসে যত মানুষ আছে সবাই আমার চেয়ে উত্তম এবং আমিই সবচেয়ে অধম এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম। হযরত থানভী রহ. তাদেরকে বললেন, চিন্তা করো না ভাই। আমারও একই অবস্থা। মজলিসে যখন বসি মনে হয় আমি সবার চেয়ে অধম আর সবাই আমার চেয়ে উত্তম।

তাওয়াযু গীবতকে নিঃশেষ করে দিতে পারে

তাওয়াযু (বিনয়) এটার নাম নয় যে, একজন মুখে বলে দিল, আমি অধম, আমি নিকৃষ্ট আর তাতেই বিনয় হয়ে গেল। বরং বিনয় হল বাস্তবেই নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি এমন দৃষ্টি থাকা যে, অন্যের দোষ-ত্রুটি তার দৃষ্টিতেই আসে না। যেদিন এমন বিনয় নিজের মধ্যে সৃষ্টি হবে সেদিন গীবত ধারে কাছেও আসবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ মানুষ যখন নিজেকে অন্যদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করবে এবং নিজের দোষ-ত্রুটির কথা সব সময় মাথায় রাখবে তখন সে কী করে অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখবে? সুতরাং গীবত থেকে নিজেকে পূর্ণ পবিত্র করতে হলে বিনয় অর্জন করতে হবে।

নিজের দোষ-ত্রুটি স্মরণে রাখ

এখন জানার বিষয় হল, বিনয় কিভাবে অর্জিত হবে? বিনয় অর্জন করার উপায় হল, নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করা। কারণ এই যে আমাদের অন্তরে সব সময় নিজের বড়ত্বের কথা আসন করে বসে থাকে-

هم چوں ما دیگرے نیست

'আমার মত আর কে আছে'? এবং কখনো ইলমের বড়াই, কখনো তাকওয়ার বড়াই, কখনো সম্পদের বড়াই, কখনো সাস্থ্যের বড়াই, কখনো বা চেহারা ছুরতের বড়াই হতে থাকে এগুলোই মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

মানুষের স্বরূপ

এক যুবক জনৈক বুযুর্গকে বলল, জানেন আমি কে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি জানি তুমি কে? জানতে চাও তুমি কে? তাহলে শোন–

أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ وَآخِرُهُ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ وَأَنْتَ فِيمَابَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

(তোমার শুরু এক ফোঁটা অপবিত্র বীর্য, তোমার সমাপ্তি একটা অপবিত্র মৃতদেহ আর এতদোভয়ের মাঝে কিছুদিন তুমি কিছু নাপাকী বহন করে বেড়াচ্ছ)

যে চামড়া তোমার গায়ে আল্লাহ লাগিয়ে রেখেছেন তা যাবতীয় দোষ-ত্রুটির পর্দা হিসাবে দান করেছেন। এই চামড়া সামান্য ফুটো হলেই দেখা যায় শুধু নাপাক আর নাপাক। কোথায়ও রক্ত, কোথায়ও পূঁজ আবার কোথায়ও মল, কোথয়াও বা মূত্র। এসব নাপাক তুমি বহন করে বেড়াচ্ছ। এ-ই হল আমাদের স্বরূপ! অথচ আমরা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করছি। আর বড় মনে করার এই মানসিকতাই মানুষকে অন্যের গীবত করতে উৎসাহিত করে।

তাই গীবতের আসল চিকিৎসাই হল বিনয় অর্জন করা। যখন বিনয় এসে যাবে, তখন আর কারো গীবত হবে না ইনশাআল্লাহ। অবশ্য যেখানে কোন দীনী প্রয়োজন হবে সেখানে অন্যের দোষ বর্ণনা করা জায়েয। যেমন কাউকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সাবধান অমুকের কাছ থেকে দুরে থেক। কারণ তার লেন-দেন ঠিক নেই –এটা গীবতের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

বিনয় অর্জনের জন্য শায়খের সোহবত

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দলিত-মথিত হওয়া ছাড়া বিনয় অর্জিত হয় না। আসল কথা হল, মানুষের দেমাগে 'খন্নাস' বাস করে। যার ফলে সে সব সময় নিজের মতামতকেই সঠিক এবং নিজের চিন্তাকেই নির্ভুল মনে করে। সে ভাবে, আমি যা চিন্তা-ভাবনা করছি, তাই ঠিক। আর অন্যের চিন্তা সম্পূর্ণ ভুল। মানুষ যখন নিজের এই চিন্তা-ভাবনাকে কারো কাছে গিয়ে এমনভাবে বিলীন করে না দিবে যে, আমি যা ভাবি তা সবই ভুল, আর আপনি যা বলেন, তা সব ঠিক; তাই আমি আপনার কথাই মানব। চাই তা আমার কাছে ভুল মনে হোক এবং দলীল প্রমাণের পরিপন্থী, এমনকি স্বতঃসিদ্ধ কোন সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হলেও আমি আপনাকেই মানব এবং আমার নিজের মতকে পরিহার করব। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের চিন্তা-ভাবনাকে

বিলীন করে না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাকাব্বুর শেষ হবে না এবং বিনয় অর্জিত হবে না।

হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর নসীহত

আল্লাহ তায়ালা শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন। যখন আমার মুহতারাম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর ইন্তেকাল হল, তখন হযরত শাইখুল হাদীস রহ. আমাকে এবং বড় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী রফী উসমানী (দামাত বারাকাতুম) কে অনেক বিস্তারিত চিঠি লিখলেন। সে চিঠিতে অনেকগুলো নসীহত করেছেন। একটি নসীহত ছিল, 'আমি আমাদের বুযুর্গদের কাছে শুনেছি যে, 'সাহেব যাদেগী'র শুকর (জান আমি কার ছেলে? এই মানসিকতা) অনেক দেরিতে বের হয়।

অর্থাৎ, কোন বড় মানুষের ছেলে হওয়ার কারণে মাথায় একটি বড়ত্বের ভূত সৃষ্টি হয়। এই বড়ত্বের ভূতকে শুকর বলা হয়েছে। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাকাব্বুর। আর এই শুকর অনেক দেরিতে বের হয়। অর্থাৎ, অন্যান্য রোগের চিকিৎসা তো তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু এটার চিকিৎসা অনেক দেরিতে হয়। তাই তিনি চিঠিতে এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এই রোগ যেন অন্তর থেকে বের করার চিন্তা করি।

এরপর তিনি লিখেছেন–

> 'যখন কোন মানুষ নিজেকে অন্য কারো কাছে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয় এবং তার হাতে দলিত-মথিত হয় তখনি এটা বের হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই তাকাব্বুর বের হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত (কল্যাণের) রাস্তা খুলবে না।'

ইলমের বড়াই দেরিতে বের হয়

তদ্রূপ ইলমের বড়াই হল আমি তো আলেম এই মানসিকতা। এই আলেম হওয়ার বড়াইও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অনেক দেরিতে বের হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে অন্যের সামনে বিলীন করে না দিবে, ততক্ষণ তা

বের হবে না। আর যদি ইলম ও সাহেবযাদেগী দুটিই একত্র হয়ে যায়, তাহলে দুই শুকর একত্র হয়ে গেল, যার চিকিৎসা সহজ কথা নয়। এর একমাত্র চিকিৎসা হল, কারো কাছে গিয়ে তার হাতে দলিত-মথিত হয় এবং নিজেকে তার সামনে পদদলিত কর। মাওলানা রূমী রহ. বলেন–

قال را بگزار صاحب حال شو ☆ پیش مردے کاملے پامال شو

বাক্যচর্চা ছেড়ে গুণ চর্চা কর, কোনো কামেল মনিষীর সামনে নিজেকে বিলীন কর।

"پامال" শব্দের অর্থ পদদলিত হওয়া। পদদলিত হওয়ার অর্থ হল, তোমার মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় তা বুঝে না আসুক, যুক্তি-প্রমাণের পরিপন্থী মনে হোক তবুও তুমি শায়খের কথার সামনে নিজেকে এমনভাবে অবনত করে দিবে যেন তোমাকে পদদলিত করা হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটার উপর আমল হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই শুকর মাথা থেকে বের হবে না। আর যতক্ষণ অন্তরে তাকাব্বুর থাকবে, ততক্ষণ হিংসা বিদ্বেষ থাকবে, গীবত থাকবে এবং ক্রোধও থাকবে। আর যখন তাকাব্বুর শেষ হয়ে তাওয়াযু পয়দা হবে তখন এই সকল রোগও দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

গীবতের কারণে জরিমানা

কিন্তু এই তাওয়াযু ও বিনয় একদিনেই পয়দা হবে না। এর জন্য মেহনত ও অনুশীলন করা এবং কোন শায়খে কামেলের সোহবত গ্রহণ করা জরুরী। তাহলেই তাওয়াযু পয়দা হবে। এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই তাওয়াযু অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত করণীয় হল, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোন কথা না বলা। তারপরও যদি কখনো গীবত হয়ে যায় তাহলে এজন্য নিজের উপর জরিমানা আরোপ করা। পিছনে এক জরিমানার আলোচনায় বলেছেন, এক বেলা খাবার থেকে বিরত থাকবে। এখানে বলছেন, দুই রাকাত 'সালাতুত তাওবা' (তাওবার নামায) পড়বে। এভাবে করতে থাকলে ধীরে ধীরে এ রোগ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শুধু আশা করাই যথেষ্ট নয়

দেখুন, দুনিয়াতে কোন কাজই মেহনত ছাড়া হয় না। কম-বেশি মেহনত অবশ্যই করতে হয়। শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে কাজ হয়ে যায় না। (কবি বলেন)

آرزوں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں

শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষায় কখনো কিছু অর্জিত হয় না, বরং কিছু অর্জনের জন্য কিছু চেষ্টা ও সাধনা করতেই হবে।

এক বেদুঈনের ঘটনা

যেমন হযরত লিখেছেন, জনৈক বেদুঈন বসে বসে নিজের ভাষায় বলে যাচ্ছে, ইস যদি এমন হত! এই স্তূপ সম্পূর্ণ দুধ হত, এই স্তূপ সম্পূর্ণ গুড় হত, তাহলে আমি সবগুলো দুধে সবগুলো গুড় ঢেলে আঙ্গুল দিয়ে মেখে খুব মজা করে পান করতাম! খুব ভাল হত! একজন এসে তাকে বলল, আরে তোমার মন তো চাচ্ছে, এমন হয়ে যাক। কিন্তু তোমার কাছে আছে টা কী? সে বলল, কেন, আমার কাছে আঙ্গুল আছে। অর্থাৎ, তার কাছে দুধও নেই গুড়ও নেই আছে শুধু আঙ্গুল। আঙ্গুলের উপর ভরসা করেই সে আশা করছে, এত এত পরিমাণ গুড় দুধ হয়ে গেলে, সে আঙ্গুল দিয়ে মেখে মজা করে খেত। হযরত থানভী রহ. বলেন, ঐ আহমক যেমন শুধু আঙ্গুলের ভরসায় আশা করছিল, অথচ এমন আশা-আকাঙ্ক্ষায় কিছুই হয় না, আমরাও তার মত শুধু ইসলাহ ও সংশোধনের আশা করেই বসে থাকি। ইসলাহের জন্য আমার কোন আমল আছে কি না তাও তো দেখা দরকার। যদি না থাকে তাহলে কিছু কিছু আমল করার চেষ্টা করা দরকার। তবেই তো ইসলাহ ও সংশোধন হবে।

অক্ষম বান্দার পরিচয়

কোন কাজই শুধু আশা করলেই হয়ে যায় না। আহ! যদি আমি এমন হয়ে যেতাম! যদি আমি ভাল হয়ে যেতাম! যদি আমি মুত্তাকি হয়ে যেতাম! যদি আমি গীবত ছেড়ে দিতাম, ইত্যাদি। আকাঙ্ক্ষাতেই কাজ হয় না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ. (ترمذی باب صفة القيامة حديث ٢٤٦١)

অক্ষম তো ঐ ব্যক্তি যে নফসকে তার কামনা বাসনার অনুগত করে রাখল, আর আল্লাহর কাছে যতসব অহেতুক আশা-আকাঙ্ক্ষা করে বসে থাকল।

অর্থাৎ, নিজের ইসলাহে অক্ষম তো ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে খাহেশের পেছনে ছেড়ে রেখেছে। মন যা চাচ্ছে লাগামহীনভাবে তাই করে চলেছে, আর বিনা চেষ্টায় বিনা শ্রমে আল্লাহর কাছে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে আছে। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, আল্লাহ তো রাহীম (দয়ালু) তিনি ক্ষমা করে দিবেন। এমন ব্যক্তি হল অক্ষম। (যে কিছু অর্জন করতে পারবে না) সুতরাং বুঝা গেল শুধু আশা আকাঙ্ক্ষা করে বসে থাকলে কিছুই অর্জিত হয় না বরং আশার সাথে সাথে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জরুরী। কিছু চেষ্টা করে কিছু আমল করে বল, হে আল্লাহ! আমার যা সামর্থ ছিল আমি করেছি এখন তা পূর্ণ করা আপনার কাজ, আপনি দয়া করে পূর্ণতায় পৌঁছে দিন।

একটু অন্তত হেঁটে দেখ!

আসলে আল্লাহ কি আমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান? কখনো না। তিনি চান আমার বান্দা একটু আমার দিকে অগ্রসর হোক, তাহলে আমি নিজেই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে নিব। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে—

اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت ٦٩)

আর যারা আমার পথে সাধনা করে আমি তাদের জন্য পথসমূহ খুলে দেই। (সূরা আনকাবুত: ৬৯)

আল্লাহ তোমাকে তুলে নিবেন

হযরত থানভী রহ. এটাকে একটা উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। যেমন ছোট বাচ্চা যখন হাঁটা শিখে, তখন পিতা চান তার বাচ্চা হাঁটা শিখুক। তাই তিনি একটু দূর থেকে বাচ্চাকে কাছে ডাকেন, বাচ্চা যখন দু এক কদম হেঁটে পড়ে যেতে চায়, তখন পিতা দৌড়ে এসে তাকে কোলে তুলে নেন। একইভাবে কোন বান্দা যখন আল্লাহর পথে চলার ইচ্ছা করে পা বাড়ায় এবং

এক পর্যায়ে পড়ে যেতে চায় তখন আল্লাহ তাকে পড়তে দেন না; বরং অগ্রসর হয়ে তার হাত ধরেন এবং তাকে তুলে নেন। যেখানে পিতা-মাতা সন্তানের সঙ্গে এই আচরণ করে সেখানে আল্লাহ তায়ালা যিনি রাহমান ও রাহীম এবং সেই পিতা-মাতারও স্রষ্টা, যাদের অন্তরে সন্তানের মমতা ও ভালোবাসা দান করেছেন, তিনি কি তার বান্দাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারেন? কখনো না। তিনি শুধু দেখতে চান, বান্দা তাকে পেতে একটু চেষ্টা করল কি না? এবং তাঁর পথে পা বাড়াল কি না? পা বাড়ালে তিনি নিজেই তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেন।

গীবতের আশ্চর্য একটি চিকিৎসা

তারপর হযরত থানভী রহ. গীবতের আশ্চর্য একটি চিকিৎসার কথা বলেছেন। এই চিকিৎসা যদিও তিক্ত কিন্তু আল্লাহ যদি এই চিকিৎসার তাওফীক কাউকে দান করেন, তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই গীবত করা বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'গীবতের আশ্চর্য একটি আমলী চিকিৎসা এই যে, যার গীবত করবে তাকে এই কুকীর্তির কথা বলে দিবে।
> অল্প কিছু দিন একাজ নিয়মিত করলে ইনশাআল্লাহ এই রোগ একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে।' (আনফাসে ঈসা-৫৩)

যখন কোন ব্যক্তি কারো গীবত করে ফেলবে তখন তাকে গিয়ে একথা বলে দিবে যে, আমি তোমার এই গীবত করে ফেলেছি। যখন গিয়ে তাকে একথা বলবে, তখন হয়তো তোমার দিলে করাত চলবে, কিন্তু এ করাতই তোমার ঐ রোগের অপারেশন করবে। যদি কয়েকবার একাজ করতে পার তাহলে আশা করি এই রোগ সমূলে বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় কথা হল, একজন মানুষ যখন কাউকে গিয়ে বলবে, আমি তোমার গীবত করেছি তখন অবশ্যই তার অন্তরে এর প্রতি অনুগ্রহ হবে যে, আচ্ছা সে যখন লজ্জা ও অনুশোচনায় অবনত হয়ে আমার কাছে এসেছে তো তাকে ক্ষমা করে দেই। অধিকন্তু এ গীবতের কারণে যে বিদ্বেষ শত্রুতা ও ক্রোধাগ্নি সৃষ্টি হওয়ার ছিল তাও আর হবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

এগারতম মজলিস

অন্যের প্রতি কুধারণা এবং অন্যের দোষ অন্বেষণ

অন্যের প্রতি কুধারণা এবং অন্যের দোষ অন্বেষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ، فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا... (سورة الحجرات ١٢)

অর্থ, হে মুমেনগণ! অনেক অনুমান করা হতে বিরত থাকো, কেননা কোন কোন অনুমান গোনাহ্। এবং (কারো দোষ খুঁজো না। এবং একে অন্যের গীবত করো না...। (সূরা হুজুরাত-১২)

কারো প্রতি খারাপ ধারণা করা বা কারো দোষ তালাশ করা এমন গোনাহ, যাকে আমরা গোনাহ মনে করার কথা ভুলে গেছি। অথচ কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট ভাষ্যমতে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা এবং কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করা সম্পূর্ণ হারাম।

কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে,

وَلَاتَجَسَّسُوْا 'অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না।'

বরং সকলের কর্তব্য হল অন্যের পেছনে না লেগে নিজের চিন্তা করা। এমনিভাবে কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করাও হারাম। এমনকি কারো কোন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলেও তার প্রতি সুধারণা রাখা চাই। শরীয়তের নীতিই হল,

ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا 'মুমিনদের প্রতি ভাল ধারণা কর।'

শুধু শুধু বিনা কারণে এমন খারাপ ধারণা করা যে, সে মনে হয় এ কাজ করেছে, সে মনে হয় এ নিয়তে করেছে– এটাই হল বদ গোমানী বা অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা যার ব্যাপারে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ –অবশ্যই কোন কোন ধারণা গোনাহ।

সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ

এই কাজগুলো যেমন হারাম ও নাজায়েয এবং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী, তেমনি এগুলো সামাজিক বিশৃঙ্খলারও কারণ। সমাজে পরস্পর বিরোধ, অনৈক্য ও ঝগড়া বিবাদ এই খারাপ ধারণা ও অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণের কারণেই সৃষ্টি হয়। তাই এ দুটি কাজ যেমনিভাবে বড় ধরণের গোনাহ্ তেমনিভাবে অনেক ফেতনা ফাসাদেরও কারণ।

আমাদের সমাজের অবস্থা

কিন্তু আমাদের সমাজ এ দুই অন্যায় কাজে ভরপুর। মানুষ নিজের পক্ষ থেকে কারো ব্যাপারে একটা ধারণা করে বসে থাকে এবং এক সময় এই ধারণার উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যেন সে নিজ চোখে তাকে এই কাজ করতে দেখেছে। সামান্য একটু বিষয় গোচরে আসলেই তার উপর ভিত্তি করে কল্পনার মিথ্যা প্রাসাদ গড়ে তোলে এবং সেসব মিথ্যা অন্যের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়। ভাবতে থাকে হয়তো সে এসব কাজ করেছে। তারপর এক পর্যায়ে এসে আর 'হয়তো' থাকে না। তখন হয়ে যায় 'নিশ্চয়'ই সে এসব কাজ করেছে।

কুরআনের বিন্যাস সৌন্দর্য

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا...

অর্থ, হে মুমেনগণ! অনেক অনুমান করা হতে বিরত থাকো, কেননা কোন কোন অনুমান গোনাহ্। এবং (কারো দোষ খুঁজো না। এবং একে অন্যের গীবত করো না...। (সূরা হুজুরাত-১২)

আল্লামা করতুবী রহ. উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ এ আয়াতের বিন্যাসে আশ্চর্য রকমের ভাষাশৈলী অবলম্বন করেছেন। প্রথমে বলেছেন, খারাপ ধারণা করো না। অর্থাৎ, কারো ব্যাপারে সামান্য কোন বিষয়

সামনে আসল আর একটু সন্দেহ সৃষ্টি হল, তার ভিত্তিতে কোন যাচাই বাছাই ছাড়াই তুমি তার ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা করে বসলে, এটা হারাম। কিন্তু এখন কেউ বলতে পারে, আচ্ছা যাচাই ছাড়া যখন বলা যাবে না তাহলে আমি যাচাই করেই বলি। আমাকে যাচাই করার অনুমতি দেয়া হোক। আয়াতে দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে, وَلَا تَجَسَّسُوا (কারো দোষ খুঁজো না) না তাও হবে না। অর্থাৎ, তুমি যদি কারো দোষ-ক্রটি বা গোনাহের যাচাই করতে চাও তাও তুমি পারবে না। কারণ অন্যের গোনাহের পেছনে পড়ার কি এমন প্রয়োজন? সে এই গোনাহ্ করল কি করল না? তা তোমাকে যাচাই করতে হবে না।

সে যা করছে আল্লাহর সামনে তার জবাব তাকেই দিতে হবে। তোমার তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তার দোষ তদন্ত করাও তোমার জন্য নিষেধ।

তাজাসসুস ও তাহাসসুস-এর পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়ে হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا 'তাজাসসুস' করো না এবং 'তাহাসসুস' করো না।

تجسس (তাজাসসুস) শব্দের অর্থ এ পর্যন্ত উপরে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, কারো দোষ জানার ফিকিরে থাকা। চাই তা জানার জন্য যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন। আর تحسس (তাহাসসুস) অর্থ হল, যাকে গ্রাম বাংলায় বলে 'কোনা ধরে শোনা'। অর্থাৎ, কেউ যখন তার কোন বিষয় গোপন রাখতে চায় তখন কোন এক কোনে বা আড়ালে আত্মগোপন করে তা শোনার চেষ্টা করা। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তাজাসসুস' এবং 'তাহাসসুস' উভয়টাকেই হারাম ঘোষণা করেছেন।

হারাম কেন?

'তাজাসসুস' ও 'তাহাসসুস' হারাম হওয়ার কারণ হল এসকল বিষয় এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, যে ব্যক্তি এগুলোর পেছনে পড়ে, সে নিজের

দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বে-খবর এবং বে-ফিকির থাকে। যদি তার নিজের দোষ-ত্রুটি এবং নিজের সংশোধনের চিন্তা থাকত, তাহলে কখনো সে অন্যের দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়ত না। কারণ যে ব্যক্তি নিজের পেটের ব্যাথায় অস্থির এবং দিশেহারা তার কি এই চিন্তা হয় যে, কার দাস্ত হল বা কার সর্দি কাশি হল? সে তো নিজের ব্যথায় নিজের চিন্তায়ই অস্থির, যতক্ষণ সে নিজের ব্যাথা থেকে মুক্ত হতে পারবে না, ততক্ষণ সে কী করে অন্যের চিন্তা করবে?

নিজের ফিকির কর

আমাদের যখন নিজের দোষ-ত্রুটির ফিকির আসবে এবং এই চিন্তা মাথায় ঢুকবে যে, আল্লাহর কাছে আমার কী পরিণাম হবে? আখেরাতে আমার কী অবস্থা হবে? তখন আর অন্যের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি পড়তেই পারে না। মরহুম বাহাদুর শাহ জাফর রহ. বলেন–

تھے جب اپنے عیوب سے بے خبر ☆ رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر ☆ تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

যতক্ষণ তুমি নিজের দোষ-ত্রুটি থেকে বেখবর ছিলে, ততক্ষণ অন্যের দোষ-গুণ নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। যেই নিজের দোষ-ত্রুটির উপর নজর পড়ল, অমনি অন্যের সব দোষ-ত্রুটি দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল।

হযরত থানভী রহ.-এর অবস্থা

যাদেরকে আল্লাহ নিজের দোষ-ত্রুটির ফিকির করার তাওফীক দান করেছেন, তাদের নজরে পুরো দুনিয়াই ভালো মনে হয়। শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন,

> 'আমি সকল মুসলমানকে বর্তমান অবস্থায় এবং সকল কাফেরকে উত্তম পরিণতির আশায় আমার চেয়ে উত্তম মনে করি।'

অর্থাৎ, সকল মুসলমানকে তো বর্তমান অবস্থায়ই আমার চেয়ে উত্তম মনে করি। আর কাফেরদেরকেও তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার

চেয়ে উত্তম মনে করি। কারণ হতে পারে আল্লাহ তাকে ঈমান দান করবেন, আর সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে আমার চেয়ে অনেক অগ্রসর হয়ে যাবে।

চিন্তা করে দেখুন! যখন এত বড় মানুষের অবস্থা এমন, তাহলে আমার আপনার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? আসলে আল্লাহ যাকেই নিজের দোষ-ত্রুটি দেখার সৌভাগ্য দান করেন সে দুনিয়ার অন্য সবাইকেই নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে। কখনো অন্যের দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়ে না।

সুতরাং নিজের চিন্তা কর! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কী আমল করছ? কত ধরনের দোষ-ত্রুটি তোমার মধ্যে রয়েছে? কী কী অসম্পূর্ণতা তোমার মধ্যে পাওয়া যায়? সেগুলোর সংশোধন করার ফিকির কর। অন্যের ফিকির করা, অন্যের দোষ-ত্রুটির তদন্ত করা, অন্যের পেছনে পড়া এবং অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা রাখা ও গীবত করা হারাম। এর দ্বারা আমরা আমাদের দুনিয়াও নষ্ট করছি, আখেরাতও বরবাদ করছি। আল্লাহ তাঁর নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এসব গর্হিত কাজ-কর্ম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোন পর্যায়ের খারাপ ধারণা নিন্দনীয়?

অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজা সম্পর্কে হযরত থানভী রহ.-এর বক্তব্য হলো,

> 'অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা তাকাব্বুরের কারণে সৃষ্টি হয়। নিন্দনীয় খারাপ ধারণা হল, যা নিজ থেকে করা হয়। আর যে ওয়াস্ওয়াসা অন্তরে এমনিতেই আসে, তা নিন্দনীয় নয়, যতক্ষণ না তাকে আমল দেয়া হয়। আর আমল দেয়ার অর্থ হল, ঐ ওয়াসওয়াসাকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করা বা অন্যের কাছে আলোচনা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ওয়াস্ওয়াসা আমলে না আনবে ততক্ষণ কোন গোনাহ্ও হবে না এবং তা ক্ষতিকরও নয়।" (আনফাসে ঈসা-১৫৩)

অর্থাৎ, কারো কর্মকাণ্ড দেখে তার ব্যাপারে আপনার সন্দেহ হল এবং অন্তরে এই ওয়াস্ওয়াসাও আসল যে, মনে হয় সে এই কাজ করেছে। যদি

এই ওয়াস্ওয়াসা এমনিতেই অন্তরে এসে থাকে এবং আপনা আপনিই সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তাতে কোন গোনাহ্ নেই। কারণ এতে আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ভূমিকা নেই।

অন্যের কাজের ভালো ব্যাখ্যা কর

যেমন, ধরুন রমযান মাসে আপনি কাউকে হোটেল থেকে বের হতে দেখলেন। তাতে আপনার অন্তরে এই ধারণা আসবে যে, সে হয়তো রোযা রাখেনি। এই যে ধারণা আপনার অন্তরে এমনিতেই এসে গেল, এতে কোন গোনাহ্ নেই। তবে আপনার উচিত যথাসম্ভব তার এ কাজের কোন ইতিবাচক ব্যাখ্যা করে নেয়া। যেমন, তার ব্যাপারে মনে মনে এমন চিন্তা করা যে, সে হয়তো কোন রোগীর খাবার আনতে কিংবা কারো সাথে কথা বলার জন্য হোটেলে গিয়েছে। কারণ, এখানে এসব বিষয়েরও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এসব সম্ভাবনার কথা ভেবে তার এ বিষয়টাকে মাথা থেকে বের করে দিতে হবে। কারণ আপনার উপর তার এ সম্ভাব্য দোষের যাচাই-বাছাই করার কোন দায়িত্ব বর্তায় না।

এমন খারাপ ধারণা করা হারাম

যে খারাপ ধারণা এমনিতেই অন্তরে এসে যায় তা গোনাহ নয়। কিন্তু অন্তরের এ ধারণার উপর যদি আপনি বিশ্বাস স্থাপন করে নেন যে, এই লোক খাওয়ার জন্যই হোটেলে ঢুকেছে এবং কিছু খেয়েই বের হয়েছে, এই বিশ্বাস করে অন্যান্য সম্ভাব্য দিকগুলোর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না। এমনকি এক পর্যায়ে অন্য মানুষের সামনেও বলতে লাগলেন যে, আমি নিজে তাকে রোযার দিনে খেতে দেখেছি, তাহলে আপনার এ খারাপ ধারণা হবে সম্পূর্ন নাজায়েয এবং হারাম।

এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, অন্তরে এমনিতেই নিজ থেকে কারো প্রতি যে ধারণা এসে যায়, তা গোনাহ নয়। কিন্তু সে ধারণার উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে নেয়া এবং তা নিশ্চয়তার সঙ্গে অন্যের কাছে বলা হল গোনাহ্।

খারাপ ধারণার দু'টি স্তর

খারাপ ধারণার দুটি স্তর। প্রথম স্তর হল, নিজের ইচ্ছা ও কোন কাজ ছাড়াই কারো প্রতি যে ধারণা এসে গেল এতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ভূমিকা

নেই। এ প্রকারের ধারণার জন্য আল্লাহর কাছে কোন জবাব দিতে হবে না। দ্বিতীয় স্তর হল, ইচ্ছাকৃত। অর্থাৎ, এমনিতেই যে ধারণা অন্তরে এসে গেল সেটাকে বিশ্বাসের স্থান দেয়া এবং তা থেকে আরো বিভিন্ন নেতিবাচক দিক বের করা, এমনকি অন্যের সামনে এগুলোর আলোচনা করা। এই দ্বিতীয় স্তর হল হারাম এবং এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

খারাপ ধারণার উৎস– অহংকার

এরপর হযরত থানভী রহ. খারাপ ধারণার চিকিৎসা সম্পর্কে বলেন–

'যখন কারো প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়, যার উৎস হল কিবির (অহংকার) তখন নিজের দোষ-ত্রুটিগুলোর কথা স্মরণ কর।'

(আনফাসে ঈসা-১৫৩)

এটা হল তার চিকিৎসা। অর্থাৎ, অন্তরে যদি কারো প্রতি কোন খারাপ ধারণা আসে– যদিও তা অনিচ্ছাকৃত এবং এ পর্যায়ে তার উপর কোন গোনাহও নেই। কিন্তু তা যদি বেশি সময় অন্তরে অবস্থান করে তাহলে এক সময় গোনাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিবে এবং অন্যের সামনে আলোচনা করা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এজন্য অবিলম্বে তার চিকিৎসায় মনোযোগী হওয়া জরুরী।

এর উপমা হল, জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। একটি জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়তো আপনার কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু আপনি যদি তা না নিভিয়ে রেখে দেন তাহলে হতে পারে তা থেকে আগুন প্রজ্জলিত হয়ে আপনার সবকিছু ভস্ম করে দিবে। এজন্য অনিচ্ছায় যে খারাপ ধারণা অন্যের প্রতি জন্মায় তারও চিকিৎসা করা জরুরী। চিকিৎসা হল, নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো স্মরণ করা যে, আমার মাঝেই তো এই এই দোষ আছে, আমি অন্যের দোষ খুঁজি কোন চোখে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে দোষ-ত্রুটিতে ভরপুর সেখানে আমি অন্যের দোষ খুঁজি কোন লাজে! এভাবে নিজের দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণার যে বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল তা শেষ হয়ে যাবে– ইনশাআল্লাহ।

খারাপ ধারণা করা এবং দোষ খুঁজে বেড়ানোর পরিণাম হল গীবত

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন,

'কারো প্রতি খারাপ ধারণা করা। দোষ খুঁজে বেড়ানো এবং গীবত করা– এসবগুলোর মূল উৎস হল কিবির। বরং মুতাকাব্বির বা অহংকারীর আসল উদ্দেশ্য গীবত দ্বারাই অর্জিত হয়। আর খারাপ ধারণা করা এবং দোষ তালাশ করা এগুলো হল গীবতের প্রস্তুতি মাত্র। যদি কেউ দোষ তালাশ করে বের করল এবং খারাপ ধারণাও করল কিন্তু গীবত করল না তাহলে তার উদ্দেশ্যই হাসিল হবে না। তখন সে দোষ তালাশ করা (ও অন্যের প্রতি) খারাপ ধারণা করাও ছেড়ে দিবে। সুতরাং গীবতই হল এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গোনাহ।' (আনফাসে ঈসা-১৫৩)

অর্থাৎ, এই তিনটি রোগ- (১) দোষ খুঁজে বেড়ানো, (২) খারাপ ধারণা করা এবং (৩) গীবত করা মূলত অন্য আরেকটি রোগ থেকে সৃষ্টি হয়। এগুলো যেন সেই রোগের উপসর্গমাত্র। সেটি হল কিবির (অহমিকা) তথা নিজেকে বড় মনে করাও অন্যকে তুচ্ছ মনে করা। যখন মানুষ নিজেকে বড় মনে করে তখনই সে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করে এবং অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়। এরপর কোন বাহানা পেলে মানুষের কাছে তা বলে বেড়ায়। আর এই তিনটির মধ্যে মূল হল গীবত। অহংকারী ব্যক্তি গীবত করার মধ্যেই আসল স্বাদ পায়। আর অহংকারী ব্যক্তি গীবতের প্রস্তুতি হিসাবে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করে বা অন্যের দোষ অন্বেষণ করে। যখন আমি কারো প্রতি খারাপ ধারণা করবো এবং অন্যের দোষ অন্বেষণ করব, তখন এমনিতেই গীবত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং আমি গীবতে লিপ্ত হয়ে যাব। এজন্যই এগুলো গীবতের ভূমিকা বা প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ। কারণ অন্যের দোষ অন্বেষণ করে বা খারাপ ধারণার ভিত্তিতে যখন কারো কোন দোষ আমার গোচরে আসবে, তখনই আমি তা মানুষের সামনে আলোচনা করব। সুতরাং বোঝা গেল এগুলোর আসল পরিণাম হল গীবত, যা অহংকারীর মূল উদ্দেশ্য। এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল, যে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করবে এবং অন্যের দোষ খুঁজবে অথচ সে গীবতে লিপ্ত হবে না। কারণ মানুষ খারাপ ধারণা এবং দোষ অন্বেষণ করে গীবত করার

জন্যই। গীবত করা এবং গীবতের স্বাদ পাওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য। এগুলো গীবতের মাধ্যম মাত্র। তাই এই আধ্যাত্মিক রোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জঘণ্যতম সংশোধনযোগ্য রোগ হল গীবত। যদি গীবত ছাড়া যায় তাহলে সহজেই অন্যগুলো ছাড়া সম্ভব।

কোন স্তরের খারাপ ধারণা গোনাহ্

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'খারাপ ধারণা তখনই গোনাহ্ যখন তা বিশ্বাসে পরিণত করবে। যদি তা বিশ্বাসে পরিণত না করে তাহলে তাতে অসুবিধা নেই। তবে তার চিকিৎসা করা এ পর্যায়েও জরুরী। চিকিৎসা হল, নিজের দোষ-ত্রুটিগুলোর কথা স্মরণ করা এবং চিন্তা করা। অবশ্য চিকিৎসার পরও যদি তার সামান্য ছিটে ফোঁটা থেকে যায়, তবে তা নিন্দনীয় নয়। (আনফাসে ঈসা-১৫৪)

অর্থাৎ, খারাপ ধারণার কারণে গোনাহ্ তখন হবে যখন তা বিশ্বাসে পরিণত করবে। কিন্তু যখন সে তা বিশ্বাসে পরিণত করবে না বরং শুধু সম্ভাব্য দিক বলে মনে করবে যে, সে একাজ করেও থাকতে পারে, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এবং এ অনিচ্ছাকৃত ধারণার উপর গোনাহ্ হবে না। যেমন রমযান মাসে দিনের বেলা কাউকে হোটেল থেকে বের হতে দেখে একথা মনে আসল যে,সে সম্ভবত রোযা রাখেনি। কিন্তু একথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল না, তাহলে এর জন্য গোনাহ্ হবে না, তবে এটারও চিকিৎসা করা জরুরী। যাতে তা শেষ হয়ে যায় বা অন্তত বিশ্বাসে রূপান্তরিত না হয়। কারণ এই সামান্য ধারণা এখন ছোট একটি জলন্ত অগিস্ফুলিঙ্গের মত। যে কোন সময় তা থেকে লাভা উদ্গীরণ হয়ে আপনাকে ভস্ম করে ফেলতে পারে। এজন্য এটার চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা হল নিজের যাবতীয় দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করা এবং সংশোধনের চিন্তা করা। অবশ্য চিকিৎসার পরও যদি সামান্য কোন ধারণা কখনো অন্তরে আসে কখনো তবে তা নিন্দনীয় নয়। কারণ তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

আল্লাহ আমাদের সকলকে দীনের উপর সহীহভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বারতম মজলিস

অন্যের প্রতি খারাপ করা ধারণা ও অন্যের দোষ অন্বেষণের চিকিৎসা

অন্যের প্রতি খারাপ করা ধারণা ও অন্যের দোষ অন্বেষণের চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

খারাপ ধারণা, দোষ অন্বেষণ ও গীবত থেকে বাঁচার উপায়

হযরত থানভী রহ. বলেন–

> ' অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা, অন্যের দোষ অন্বেষণ করা এবং গীবত থেকে বাঁচার উপায় হল, নিজের অন্তর থেকে কিবির (অহংকার) বের করা এবং তাওয়াযু (বিনয়) অবলম্বন করা। আর এই মূল সমাধান হওয়ার আগ পর্যন্ত সাময়িক এবং প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে যে, (১) চিন্তা–ভাবনা করে কাজ করবে (২) নিজের মনে যখন অন্যের সম্পর্কে খারাপ ধারণা এবং ওয়াস্ওয়াসা আসে তখন অন্তরকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত করা।
>
> (আনফাসে ঈসা-১৫৪)

এ বাণীতে হযরত দু'টি চিকিৎসার কথা বলেছেন। একটি হল স্থায়ী এবং মেয়াদী চিকিৎসা। অপরটি হল তাৎক্ষণিক এবং সাময়িক চিকিৎসা। তারপর এ সাময়িক চিকিৎসাটির তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। প্রথম প্রদ্ধতি হল, চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা।

অর্থাৎ, কথা বলার আগেই চিন্তা কর যে একথা আমি বলব কি বলব না? একথা প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয়? উপকারী না ক্ষতিকর? প্রথমে ভাব পরে বল।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর চুপ থাকা

ইমাম শাফেয়ী রহ.কে যখন কেউ প্রশ্ন করত তখন তিনি চুপ থাকতেন। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতেন না। এক সময় তাঁকে একজন জিজ্ঞাসা করল হযরত আপনাকে মানুষ প্রশ্ন করে, কিন্তু আপনি তাৎক্ষণিক উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকেন কেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন–

حَتّٰى اَعْرِفَ اَنَّ الْفَضْلَ فِى السُّكُوْتِ اَوْ فِى الْكَلَامِ

আমি চুপ করে চিন্তা করি, যাতে একথা আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে আমার জন্য বলা উত্তম, না চুপ থাকা উত্তম? একথাই হযরত থানভী রহ. তার উপরোক্ত বাণীতে বলেছেন যে, আগে ভাব পরে বল।

হযরত আবু বকর রাযি.-এর নিজের জিহ্বাকে শাস্তি প্রদান

বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর রাযি. একবার বসে বসে নিজের জিহ্বা মোচড়াচ্ছিলেন। সবাই দেখে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি এমন করছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন–

اِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ

এই জিহ্বা আমাকে ধ্বংসে পতিত করেছে।

দেখুন! কার যবান থেকে এমন কথা বের হচ্ছে। হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. কে ছিলেন? তিনি ছিলেন নবীর প্রতিচ্ছবি! তিনি বলছেন, এই যবান আমাকে ধ্বংসে পতিত করেছে। আসলে যাদেরকে আল্লাহ্ চিন্তাশীল অন্তর ও দৃষ্টি দান করেছেন, তাঁরা এভাবেই যবান ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যবানের কারণে সম্ভাব্য বিপদের কথা স্মরণে রাখেন।

যবানকে মানুষ যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাহলে তা খুবই মূল্যবান সম্পদ; আর যদি তার ভুল ব্যবহার করে, তাহলে তা খুবই খারাপ। এই যবান মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে আবার এই যবানই পারে মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে। যদি দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে পড়ে!

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

('আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ') তাহলে কাফেরও জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতী হয়ে যেতে পারে। আবার একজন মুসলমান কোন কুফুরী কথা বলে হয়ে যেতে পারে চীরজাহান্নামী (নাউযুবিল্লাহ) হাদীস শরীফে এসেছে 'মানুষকে তার যবানের কৃতকর্মের কারণে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' কারণ তার যবানকে সে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করেছে। মুখে যা এসেছে তাই বলে দিয়েছে এবং মাথায় যা ঢুকেছে তাই বলে দিয়েছে।

এই স্বভাব ছাড়। বলার আগে ভাবার অভ্যাস গড়। চিন্তা করে কথা বল যে, আমি যা বলতে যাচ্ছি তা আমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে না তো?

চুপ থাকার সাধনা

আমার মুহতারাম আব্বার কাছে এক লোক আসা-যাওয়া করত। সে খুব বেশি কথা বলত। আসামাত্র কথা শুরু হত আর শেষ হত না। আব্বাজান তার এ আচরণ বরদাস্ত করতেন। কিছু দিন পর সে বলল– হযরত আপনার হাতে বাইয়াত হতে চাচ্ছি এবং ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করতে চাচ্ছি। আব্বাজান তাকে বললেন,

> 'তুমি যদি আমার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক করতে চাও তাহলে প্রথম কাজ হল তুমি মুখে তালা লাগাও। যে যবান তোমার কেঁচির মত চলতে থাকে তা বন্ধ কর। এটাই তোমার অযীফা এবং চিকিৎসা'।

এরপর যখনই সে মজলিসে আসত চুপ করে বসে থাকত। আর এর দ্বারাই তার সংশোধন হয়ে গেছে।

গীবতের উপর জরিমানা

কথা বলার আগেই চিন্তা-ভাবনা কর যে, আমি যা বলছি তা গীবত বা মিথ্যা কি না? এবং তা জায়েয না নাজায়েয? হারাম না হালাল? এভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলার পরও যদি কোন পদস্খলন ঘটে এবং গীবত হয়ে যায়, তাহলে নিজের উপর জরিমানা আরোপ কর। সামনে আবার

কখনো গীবত হলে এত টাকা জরিমানা দিবো। টাকাও এই পরিমাণ হওয়া চাই যা দিতে কিছু কষ্ট হয়। আলীগড় ইউনিভার্সিটির মত সামান্য জরিমানা হলে হবে না।

আলীগড়ে নামাযের জরিমানা

আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়া আবশ্যক ছিল। কেউ নামাযে উপস্থিত না হলে, তাকে নামায প্রতি চার আনা করে জরিমানা পরিশোধ করতে হত। কিন্তু দেখা যেত বিত্তবানদের সন্তানেরা মাসের শুরুতেই হিসাব করে পুরো মাসের জরিমানা জমা দিয়ে দিতো। (ফলে এই জরিমানায় কোন কাজ হত না) এজন্য জরিমানা এই পরিমাণ হওয়া চাই যা আদায় করা কিছুটা কষ্টকর হয়।

অথবা নিজের উপর এই জরিমানা আরোপ কর যে, আমার দ্বারা যদি কখনো গীবত হয়ে যায়, তাহলে আমাকে চার রাকাত নফল নামায আদায় করতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ্ গোনাহ্ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করবেন। ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হবে

অন্তরে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা আসলে তার একটা চিকিৎসা এটাও সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর যিকিরের দিকে মনোনিবেশ করবে। যেমন ইস্তেগফার, কালিমা বা অন্য কোন তাসবীহ্ পড়তে আরম্ভ করবে এবং ভালোভাবে সেদিকে মনোনিবেশ করবে।

তাওয়াযু অর্জন কর

উপরের আলোচিত বিষয়গুলো ছিল সাময়িক চিকিৎসা। স্থায়ী এবং পরিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য নিজের মধ্যে তাওয়াযু পয়দা করতে হবে। কারণ আগেও একথা বলেছি যে, এ জাতীয় রোগগুলো সব কিবিরের কারণে এবং তাওয়াযু না থাকার কারণেই জন্ম নেয়। অন্তরে নিজের বড়ত্ব আছে যে, আমি যা ভাবি, আমি যা বুঝি, তাই ঠিক। আমি বড় বুদ্ধিমান। আমি অনেক বড় আলেম, আমি অনেক বড় মুত্তাকী। এগুলো সব অহংকারী চিন্তা-ভাবনা, যা

মানুষের গীবত করা মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা করা ও মানুষের দোষ অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সবগুলোর মূল চিকিৎসা হল– নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করা।

নিজের স্বরূপ চিন্তা কর

এখন প্রশ্ন হল, তাওয়াযু কীভাবে পয়দা হবে? তাওয়াযু পয়দা হওয়ার উপায় হল, কোন কামেল শায়খের হাতে নিজেকে সোপর্দ কর। কারণ শায়খের কাছে নিষ্পেষিত হওয়া ছাড়া কাজ হয় না। তাঁর মাড়াই মর্দন খাও, তাঁর ধমক খাও, তার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাক, তাঁর শাসকের দৃষ্টি গ্রহণ কর, তোমার স্বভাব ও রুচিবিরোধী তাঁর নির্দেশনা মেনে নাও, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ ধীরে ধীরে তাওয়াযু এসে যাবে। আর শায়খের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত, অন্তত নিজের হাকীকত ও স্বরূপ নিয়ে চিন্তা কর যে, আমার হাকীকতই বা কী? আমার নিজের কি এমন আছে? যা আছে তাতো সব আল্লাহ্‌রই দান। আমার সুস্থতা আল্লাহ্‌র দান, আমার মধ্যে যদি কোন সৌন্দর্য থেকে থাকে তাও আল্লাহ্‌র দান, যদি সামান্য ইলম থাকে তাও আল্লাহ্‌র দান। যদি কোন অর্থ কড়ি থাকে তাও তো আল্লাহ্‌রই দান। আর তিনি যখন চাইবেন তখনই তা ফিরিয়ে নিতে পারেন। খুব সুস্থ সবল মানুষকে আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা তখনই অসুস্থ করতে পারেন।

মানুষের ক্ষমতা ও অক্ষমতা

আমার এক প্রিয়ভাজন ছিলেন যিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাকে আল্লাহ্ এমন শক্তি দান করেছিলেন যে, বরফের চাকাও হাতের ঘুষিতে ভেঙ্গে ফেলত। তরমুজ কখনো সে ছুরি দিয়ে কাটত না। শুধু হাতেই ভেঙ্গে ফেলত। কিন্তু সে যখন শেষ বয়সে অসুস্থ হল, তখন দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি বিছানায় পড়ে আছে। নিজের হাতটা সামান্য উপরে উঠাবার শক্তিও তার নেই। আমি ভাবলাম হায়! এতো সেই হামেদই যে নাকি বরফখণ্ড পর্যন্ত ঘুষি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলত। অথচ এখন সে নিজে নিজের হাতটা পর্যন্ত উচু করতে পারছে না। এমন দুর্বল প্রকৃতির মানুষের কিসের গর্ব? কিসের অহংকার কর?!

ইলমের উপর গর্ব করো না

মাওলানা সাহেবের ইলমের বড় গর্ব হয়? আমি বড় আলেম। আমি অনেক কিছু পারি। কখনো এমন চিন্তা করবে না। কারণ আল্লাহ যখন চাইবেন তখন এই ইলমকে ছিনিয়ে নিবেন। যেমন আল্লাহ্ মাঝে মধ্যে এটা দেখিয়ে থাকেন, ফলে দেখা যায় কাগজ কলম নিয়ে বসলাম কিন্তু কিছুই বুঝে আসে না, যে কি লিখব? আর আমি গর্ব করছি আমি একজন লেখক, আমি একজন কলম সৈনিক, এমনকি অনেক সময় নিজের নাম লিখতে গিয়েও বসে থাকতে হয় কিভাবে লিখব? একটি অক্ষরও কলম থেকে বের হয় না। তাই এই অক্ষম মানুষের কিসের বড়াই! কিসের অহংকার! কিসের ভরসা! যা আছে তা সবই আল্লাহর। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তা নিয়ে নিতে পারেন। যেদিন অন্তর থেকে নিজের বড়ত্বের অনুভূতি বের হয়ে যাবে এবং মনে করবে যে, আমি তো কিছুই না, আমি অধম, অমি তুচ্ছ, বরং তুচ্ছ থেকেও তুচ্ছ, সেদিন ইনশাআল্লাহ অন্তরে তাওয়াযু পয়দা হয়ে যাবে।

আড়ালে বসে কথা শোনা

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'আড়ালে বসে কারো কথা শোনাও অন্যের দোষ অন্বেষণের শামিল। কারো যদি কোন প্রয়োজনে অন্যের আড়ালে বসতে হয়, তবে তাকে একথা জানিয়ে দেয়া জরুরী যে, আমি তোমার আড়ালে বসা আছি। নতুবা এমনভাবে বসা জরুরী যাতে সে দেখে বা বুঝতে পারে। মোটকথা! যে কোনভাবে তাকে নিজের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেয়া জরুরী'।
>
> (আনফাসে ঈসা-১৫৪)

যেমন, দুই ব্যক্তি বসে পরস্পর কথা বলছে, আপনি আড়ালে গিয়ে তাদের কথা শুনতে আরম্ভ করলেন– এটা হারাম, গোনাহ। এবং অন্যের দোষ অন্বেষণের শামিল। এজন্য কেউ যদি আড়ালে থাকে তাহলে একথা জানিয়ে দেয়া জরুরী যে, আমি এখানে বসা আছি অথবা তাদের সামনে এসে বসা জরুরী। যাতে তারা কোন গোপন কথা বলতে চাইলে তা থেকে বিরত থাকে।

আমাদের অবস্থা

আজ আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থা চলছে। এমন সুযোগ আসলে আমরা নিজেকে আরো গোপন করে রাখার চেষ্টা করি এবং চেষ্টা করি যাতে আলাপরত ব্যক্তিগণ বুঝতে না পারে যে, আমি এখানে আছি। যাতে আরামে বসে তাদের কথা শুনতে পারি। মনে রাখবেন, এসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ হারাম এবং 'তাজাসসুস' তথা অন্যে দোষ অন্বেষণের শামিল। সততার দাবি হল, তোমার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিবে, যাতে তারা সতর্কতার সাথে কথা বলে।

ঝগড়া বিবাদের মূল

শরীয়ত আমাদেরকে এমন এমন শিক্ষা দান করেছে যে, বাস্তবেই যদি আমরা সেগুলোর উপর আমল করি, তাহলে কখনো পরস্পর ঝগড়া বিবাদ হতে পারে না এবং সমাজে কোন ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে না। যেখানেই কোন ফেতনা-ফাসাদ বা ঝগড়া-বিবাদ হয় তা শরীয়তের কোন না কোন শিক্ষা বর্জন করার কারণেই হয়। শরীয়ত ফেতনা-ফাসাদ এবং ঝগড়া-বিবাদের পথে এমন পাহারা বসিয়েছে যে, আমরা যদি সেগুলোর উপর আমল করি, তাহলে কোন ঝগড়াই হওয়া সম্ভব নয়। যেমন একদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

তৃতীয় ব্যক্তিকে রেখে যেন অন্য দুইজন কোন গোপন কথা না বলে। অর্থাৎ, কোথাও যদি তিনজন লোক থাকে তাহলে তাদের দুইজনের জন্য এমন করা উচিত নয় যে, তারা দুইজন ভিন্ন হয়ে একজনকে রেখে কোন গোপন কথা বলবে। এমনটি করা না জায়েয। কারণ এতে তার মনে এই সন্দেহ বা আশঙ্কা জাগতে পারে যে, তাকে একা করে দিয়ে তার ব্যাপারেই হয়তো কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। যার কারণে তার কাছ থেকে তা গোপন রাখা হচ্ছে। এতে তার মনোকষ্ট হবে।

অপরদিকে তিনি এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এমন জায়গায় যেয়ো না, যেখানে আগে থেকেই দুজন কোন গোপন কথা বলছে। যাতে তাদের কথায়

ব্যাঘাত না ঘটে। তাদেরকে তাদের কথা বলতে দাও। তুমি তাদের মাঝে প্রবেশ করো না। এসব বিষয় আমাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবিস্তারে বলে গেছেন। কিন্তু আমরা এখন শুধু কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে দীনকে সীমিত করে দিয়েছি। শুধু নামায রোযার মধ্যেই দীনকে সীমিত করে রেখেছি। জীবন যাপনে আরো যে আদাব ও শিষ্টাচার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে যেন দীন থেকে বের করে দিয়েছি। অথচ তাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই হুকুম।

ফোনে অন্যের কথা শোনা

এমনিভাবে মনে কর, কখনো তুমি ফোন করার জন্য রিসিভার উঠালে। কানে লাগানোর পর দেখা গেল দুইজন পরস্পর কথোপকথন করছে। অর্থাৎ, তাদের লাইনে আর তোমার লাইনে সংযোগ হয়ে গেছে। এখন তুমি তাদের কথা শুনতে আরম্ভ করলে। অথচ তোমার জন্য এভাবে অন্যের কথা শোনা জায়েয নেই। তোমার কাজ হল এ অবস্থায় ফোন বন্ধ করে দেয়া। যদি এভাবে কথা শোন, তাহলে তা নাজায়েয 'তাজাসসুস' তথা অন্যের দোষ অন্বেষণের শামিল হবে।

দোষ তদন্ত যখন জায়েয

অনেক সময় প্রশাসনিক কারণে কারো দোষের তদন্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল যদি অধিনস্থ সকলের ভালো-মন্দের খোঁজ খবর না রাখেন তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। তাই কোন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য, প্রতিষ্ঠানে কোন জঘন্যতর অন্যায় অপরাধ হচ্ছে কি না? এই খোঁজ-খবর রাখতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল এই তদন্ত।

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর একটি ঘটনা

হযরত উমর ফারুক রাযি. রাতের আঁধারে মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলিতে ঘোরা-ফেরা করতেন। একবার দেখলেন এক ঘর থেকে

গানের আওয়াজ আসছে এবং পেয়ালা নড়াচড়ার আওয়াজ হচ্ছে। তিনি ধারণা করলেন সম্ভবত এখানে নাচ-গান ও মদপানের আসর জমেছে। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে তিনি সব শুনলেন এরপর দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং দেখলেন যা ভেবেছেন তাই হচ্ছে। তাদেরকে এই মদমাখা হাতেই পাকড়াও করলেন। তাদের সরদার ছিল বেশ হুঁশিয়ার। সে হযরত উমর রাযি. কে প্রশ্ন করল, আমাদেরকে কেন পাকড়াও করেছেন? তিনি বললেন, তোমরা নাচ-গান এবং শরাব পানের অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তাই। সরদার বলল, আমরা তো মাত্র একটি গোনাহ্ করেছি, আর আপনি কয়েকটি গোনাহ করেছেন। এক গোনাহ করেছেন, আমাদের দোষ অন্বেষণের পেছনে পড়েন। ভেতরে কি হচ্ছে তার তদন্তে লেগেছেন। দ্বিতীয় গোনাহ্ করেছেন, অনুমতি ছাড়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করেন– এটা নাজায়েয। তৃতীয় অন্যায় করেছেন, দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ঘরে ঢুকেছেন– অথচ কুরআনের ইরশাদ হল– وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। সুতরাং আমরা গোনাহ্ করেছি একটি, আর আপনি করেছেন তিনটি।

হযরত উমর রাযি.-এর ইস্তেগফার

হযরত উমর রাযি. তার এই কথা শুনে এই ভয়ে ইস্তেগফার করলেন যে, না জানি বাস্তবেই আমার দ্বারা এ গোনাহ হয়ে গেছে। দেখুন তাঁরা কেমন মনের মানুষ ছিলেন। আমাদের মত মানুষ হলে– একথা বলার পর তাকেই শাসন করতেন, বদমাশ অন্যায় করেছো আবার আমাকে শাসন কর। চুরি আবার সীনাজুরী। কিন্তু তারা যেহেতু শাসন ও দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নফসের খবরও রাখতেন এবং সংশোধনের চিন্তা করতেন, এজন্য তাঁরা ভাবতেন যেহেতু আমার নিজের উপরই অভিযোগ এসেছে, তাই এ সুযোগটি নিজের সংশোধন ও উন্নতির কাজে লাগানো উচিত। কারণ নফসের মধ্যে তো এসব বিষয়ের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। তাই তিনি ততক্ষণাৎ ইস্তিগফার করলেন।

সাহাবা কেরামের সিদ্ধান্ত

তারপর এ বিষয়টি তিনি সাহাবায়ে কেরামের সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, সর্দার বলছে, আমি এই তিন গোনাহ করেছি। বাস্তবেই কি

আমি এসব গোনাহ্ করেছি? তাদের অন্যায়ের খোঁজ নেয়ায় কি আমার জন্য অন্যের দোষ অন্বেষণের গোনাহ্ ছিল? অনুমতি ছাড়া অপরাধীদের ঘরে প্রবেশ করা এবং দেয়াল ডিঙ্গানো আসলেই কি আমার জন্য অন্যায় ছিল? সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কোন দায়িত্বশীল যদি কোন অন্যায়ের ব্যাপারে এই আশঙ্কা করে যে, এটা সমাজে বিস্তার লাভ করবে এবং মানুষের মাঝেও তার খারাপ প্রভাব পড়বে, তাহলে তার জন্য এ জাতীয় অন্যায়ের অনুসন্ধান এবং তদন্ত করা এবং প্রয়োজনে অনুমতি ছাড়া অপরাধীর ঘরে প্রবেশ করা জায়েয। এমনকি দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করাও জায়েয। তবে যদি কেউ এমন কোন কাজ করে যা সমাজে বিস্তৃতি লাভ করার বা অন্যের উপর কোন প্রভাব ফেলার আশঙ্কা নেই বরং তা একান্তই তার ব্যক্তি পর্যন্ত সীমিত, তাহলে দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্যেও তার তদন্ত ও অনুসন্ধান করা জায়েয নেই। ফুকাহায়ে কেরাম তাদের কিতাবে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

ফুকাহায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত

ইমাম খাসসাফ রহ. এর কিতাব হল 'আদাবুল কাযা' যার ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লামা সদরুস শহীদ রহ.। তাতে এ বিষয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে এবং কখন অন্যের দোষ তদন্ত করা জায়েয এবং কখন নাজায়েয এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতভেদ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য হল, যে অন্যায় সমাজে এবং অন্যদের পর্যন্ত কোন কুপ্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা হবে, সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তার সমাধান ও মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। অনুসন্ধান করা, দেয়াল ডিঙ্গিয়ে এবং বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করাও তার জন্য বৈধ। আর যেখানে ঐ অন্যায় কাজের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নেই বরং অন্যায়কারী ব্যক্তির মধ্যেই তা সীমিত থাকবে আর সেও তা নিজের ঘরে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে করছে, এক্ষেত্রে তার অনুসন্ধান ও তদন্ত করা শাসক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্যও জায়েয নেই।

আমার উপর দারুল উলূম করাচীর সামান্য দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য আমাকেও সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে তদন্ত করতে হয়। হোস্টেলের ছাত্ররা আবার কোন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ছে কি না? বা অন্য কোন বিধি-বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হচ্ছে কি না? আর এ অনুসন্ধান তখনই জায়েয যখন তা অপর ব্যক্তি পর্যন্ত সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যথায় চুপ থাকাই উত্তম।

জাগ্রত হওয়ার কথা জানিয়ে দাও

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'এমনিভাবে কেউ যদি ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়ল এবং সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে পাশের লোকেরা একান্ত কোন (গোপন) কথা বলতে আরম্ভ করল, কিন্তু আসলে সে ঘুমায়নি। তাহলে তার কর্তব্য হল তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আমি সজাগ রয়েছি। অবশ্য তারা পরস্পরে যদি ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তির ব্যাপারেই কথা বলে এবং তার কোন ক্ষতি করার চিন্তা করে তাহলে ঘুমের ভানে তাদের এ আলোচনা শোনা জায়েয হবে।' (আনফাসে ঈসা-১৫৪)

আজকাল আমাদের সমাজে একেবারে উল্টো কাজ চলছে যে, জেগে আছে সে ঘুমের ভান করে কথা শোনার চেষ্টা করে। যাতে তাদের যাবতীয় গোপন বিষয়ে অবগতি লাভ করে নিজের কৃতিত্ব দেখাতে পারে যে, তোমরা কি কি বলেছ– সব খবর আমার আছে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নাজায়েয। জাগ্রত ব্যক্তির প্রতি শরীয়তের নির্দেশ হল– অন্যদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, আমি জাগ্রত। তবে হ্যাঁ তার ব্যাপারে যদি তারা কোন ষড়যন্ত্র করে এবং তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাহলেই শুধু তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অগোচরে তাদের কথা শোনা জায়েয।

ভাষা বোঝার কথা জানিয়ে দেয়া

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন–

একইভাবে দুইজন যদি ইংরেজীতে বা আরবীতে কিংবা অন্য

> কোন বিদেশি ভাষায় কথা বলে এবং সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকে যে তাদের ভাষা বুঝে। কিন্তু তাদের তা জানা না থাকে, তাহলে তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া উচিৎ যে, আমি আপনাদের ভাষা বুঝি। (আনফাসে ঈসা-১৫৪)

অর্থাৎ, তাদের ভাষা বুঝার কথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া উচিত। যাতে তারা নিজেদের গোপন কথা ফাঁস করে না দেয়। মোটকথা! কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধানও করবে না এবং কখনো অনিচ্ছায় কারো গোপন বিষয়ের অবগতির সুযোগ হলেও তা গ্রহণ করবে না বরং তাদেরকে সতর্ক করে দিবে তারা যেন ধোঁকায় পড়ে নিজেদের গোপন কথা ফাঁস করে না দেয়।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

হযরত থানভী রহ.-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এক বুযুর্গ ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত। হযরতের সান্নিধ্যে এসে দাড়ি টুপি ও লম্বা পাঞ্জাবীসহ তার সীরাত-সুরত সবই দীনদার এবং আলেমদের মত হয়ে গেছে। তিনি একবার রেলে সফর করছিলেন। তার পাশেই ছিল আরো দুজন ইংরেজি শিক্ষিত যাত্রী। তারা দুজন তার সুরত দেখে ভাবল এতো মৌলভী মানুষ, ইংরেজি জানবে কোত্থেকে!? এই ভেবে তারা দুজন তার সম্পর্কেই ইংরেজিতে কথা বলতে আরম্ভ করল। ইংরেজিতে বলার উদ্দেশ্য ছিল তার কাছ থেকে গোপন রাখা। কথা শুরু করা মাত্রই তিনি বুঝলেন- এরা দুজন আমার থেকে গোপন রেখে কিছু বলতে চাচ্ছে। এজন্য ইংরেজিতে কথা বলছে। তিনি ভাবলেন- আমি যেহেতু তাদের কথা বুঝি তাই এখন চুপ থেকে তাদের কথা শোনা তো সততার পরিপন্থী। এই চিন্তা করে তিনি তাদেরকে বলে দিলেন, 'ভাই আমি ইংরেজি জানি। আপনারা যদি আমার কাছে গোপন রেখে কোন কথা বলতে চান তাহলে অন্য কোন পথ অবলম্বন করুন। আমি জানি না মনে করে ধোঁকায় পড়বেন না। যদি চান তাহলে আমি অন্যত্র চলে যেতে পারি, আপনারা নির্জনে কথা বলুন।'

এই বুযুর্গ যখন বুঝলেন, আমি তাদের ভাষা বুঝি না মনে করে আমার কাছে গোপন রেখে তারা কোন কথা বলতে চাচ্ছে। অথচ আমি তাদের ভাষা

বুঝি। সুতরাং এখন যদি আমি চুপ থেকে তাদের কথা শুনতে থাকি তাহলে এটা অন্যের দোষ তদন্তের অন্তর্ভূক্ত হবে। এই কথা তার মাথায় এ জন্যই এসেছিল যে, তার কিছু দিন থানাভবন থাকার সুযোগ হয়েছিল এবং হযরত থানভী রহ.-এর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। অন্যথায় আজ এমন মানুষ কোথায়? যারা এমন চিন্তা করবে। এবং একথা বলে দিবে যে, আমি তোমাদের ভাষা বুঝি। যদি কেউ বলেও তবে তা নিজের জ্ঞান প্রকাশ করার জন্য বলবে যে, আমাকে মূর্খ মনে করো না। আমিও ইংরেজি জানি। অন্যের দোষ অন্বেষণের গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে বাঁচার জন্য বলবে না। বরং এখন তো এটাকে নিজের কৃতিত্ব মনে করা হয় যে, চুপে চুপে কথা শুনবে এবং পরে তা প্রকাশ করবে যে, যে কথা আমার কাছে গোপন রাখতে চেয়েছো তা আমি জেনে গেছি। যার সম্পর্কে যা বলেছ! সব খবর আমার আছে।

আসল কথা হল। এ বিষয়গুলো দীনের অংশ। কিন্তু আজকাল আমরা তা দীন থেকে বের করে দিয়েছি। আল্লাহ্ যদি অনুগ্রহ করে বুঝ দান করেন তাহলেই বোঝা সম্ভব। আল্লাহ্ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তেরতম মজলিস

অহংকার ও তার প্রতিকার

অহংকার ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّابَعْدُ

পৃথিবীর বুকে প্রথম গোনাহ

কিবির (অহংকার) অনেক রোগের মূল। এর কারণে অনেক রকম আত্মিক ব্যাধির জন্ম হয়। এ জন্যই একে 'উম্মুল আমরায' তথা 'সকল রোগের জননী' বলা হয়। আর পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যে গোনাহ সংঘটিত হয়েছে তা হল কিবির। আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইবলীসকে বললেন, 'আদমকে সেজদা কর' তখন সে সেজদা করতে এই বলে অস্বীকার করেছিল যে,

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

(আমি তার চেয়ে উত্তম! আমাকে তুমি আগুন দিয়ে তৈরি করেছ আর তাকে তৈরি করেছ মাটি দিয়ে)

ইবলিস নিজেকে বড় মনে করেছিল এবং হযরত আদম (আ.) কে তুচ্ছ মনে করেছিল। সেজদা না করার যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছিল এই বলে যে, আমি তো তার চেয়ে উত্তম, কারণ আমাকে আপনি আগুন দিয়ে তৈরী করেছেন আর আদমকে তৈরী করেছেন মাটি দিয়ে। আগুন মাটি থেকে উত্তম। তার যুক্তির প্রামাণিক দিক থেকে যদিও অনেক মজবুত এবং শক্তিশালী মনে হয় কিন্তু আল্লাহর হুকুম না মেনে সে যে কিবিরের বহি:প্রকাশ করেছে তা ছিল এই পৃথিবীর আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রথম নাফরমানী। যে কিবিরের কারণে চিরজীবনের জন্য তাকে দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে।

অহংকার সকল গোনাহের মূল

এই অহংকার থেকেই হিংসার সৃষ্টি হয়। কারণ যখন অন্তরে এই কথা থাকে যে, আমি বড় সে ছোট তখন যদি সে কোন বিষয়ে তার চেয়ে অগ্রসর হয়ে যায়, তখনই তার প্রতি হিংসা হয়, (মনের মধ্যে আপত্তি জাগে) এই উন্নতি তার কেন হল? এটা তো আমার হওয়া দরকার ছিল।

এই কিবিরের কারণেই বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, অতিরিক্ত রাগও এ থেকেই সৃষ্টি হয়। গীবতের গোনাহও সাধারণত এই কিবিরের কারণে হয় এবং অন্যের দোষ অন্বেষণের গোনাহও এই কিবিরের কারণেই হয়। মোটকথা! এই কিবির অসংখ্য রোগের মূল। শারিরীক রোগ-ব্যাধির যেমন বিশেষজ্ঞ থাকেন। যেমন নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ। তেমনি রূহানী বা আত্মিক ব্যাধিরও বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন ইমাম গাজ্জালী রহ.। তিনি 'এহইয়াউল উলূম' গ্রন্থে লিখেছেন, কিবির হল উম্মুল আমরায' সর্বরোগের উৎস। যদি কারো অন্তরে এই কিবির সৃষ্টি হয়, তাহলে তা থেকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির জন্ম হতেই থাকে। এজন্য প্রথমে এই রোগের-চিকিৎসা করা জরুরী। আল্লাহ তাঁর নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এই রোগ থেকে হেফাজত করুন। আর কারো অন্তরে এ রোগ থেকে থাকলে তা থেকে মুক্ত করে দিন। আমীন।

কিবিরের অর্থ

কিবির তথা অহংকার অর্থ হল, অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় এবং উত্তম মনে করা। যেমন মনে করুন কারো বয়স যদি ৩০ বছর হয় এবং অন্য জনের বয়স ২০ বছর হয় তাহলে ৩০ বছর বয়সী ২০ বছর বয়সীকে ছোট মনে করবে এটাই স্বাভাবিক। এতে কোন গোনাহ নেই এবং এটা নিন্দনীয়ও নয়। বরং নিজেকে উত্তম মনে করা যে, আমি তার চেয়ে উত্তম এটা হল কিবির-অংহকারী।

আর যখন অন্তরে নিজের বড়ত্বের ভাব থাকে তখন তা বিভিন্ন আচরণে ও উচ্চারণে প্রকাশ পেয়ে যায়। এই প্রকাশ করার নাম হল তাকাব্বুর।

অর্থাৎ, অন্তরে যে বড়ত্বের ভাব থাকে তাকে বলে কিবির আর সেটার প্রকাশ হল তাকাব্বুর। যেমন, কারো সাথে কথা বলার সময় তাকে তুচ্ছ করে কথা বলা। এটা তাকাব্বুরের শামিল। যা অন্তরে বিদ্যমান কিবিরেরই প্রতিফলন। এর চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী।

তাকাব্বুর একটি গোপন ব্যাধি

এই রোগ এমন সূক্ষ্মভাবে মানুষের মাঝে বিরাজ করে যে, সে নিজেও অনুমান করতে পারে না, তার মধ্যে এই রোগ আছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম ব্যাধি যা ভেতরে বাড়তেই থাকে কিন্তু রোগী তা টের পায় না। যেমন, আজকাল ডাক্তারদের মতে জঘন্যতম ব্যধি হল ক্যান্সার, কারণ এটা এমন রোগ যাতে কেউ আক্রান্ত হলে ভেতরে ভেতরে এমনভাবে তা বাড়তে থাকে, রোগী নিজেও টের পায় না এবং ডাক্তারও ধরতে পারে না যে, ভেতরে কী হচ্ছে। যখন রোগের কারণে ব্যাথা হয় তখনই রোগী অনুভব করতে পারে যে, তার রোগ হয়েছে। তাই রোগের ব্যাথা হওয়াও আল্লাহর মেহেরবাণী, কারণ ব্যাথা এ কথার সংকেত বহন করে যে, ভেতরে কোন রোগ আছে। ফলে রোগী তখন ডাক্তারের কাছে যায় এবং চিকিৎসা করে তখন সুস্থ হয়। আর যদি রোগে কোন কষ্ট না হয়, তখন তার চিকিৎসার প্রতিও মানুষ খেয়াল করে না। যার ফলে রোগ ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এবং যখন তা ধরা পড়ে তখন আর চিকিৎসার উপায় থাকে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে এমন রোগ থেকে হেফাজত করুন, আমীন!

কিবির বা অহংকারের ব্যধিও ঠিক এরকম। মানুষ মনে করে আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। কিন্তু বাস্তবে সে কিবির এবং তাকাব্বুরের শিকার। কখনো কি কোন মুতাকাব্বিরের মুখে একথা শোনা গেছে যে, আমি তাকাব্বুরী করি। আজ পর্যন্ত কোন মুতাকাব্বির তা স্বীকার করেনি।

টাখনুর নিচে (পাজামা) সালোয়ার পরিধান করা

একটা বিষয় আমাদের সমাজে আজকাল অনেক প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বিষয়টি হল, হাদীস শরীফে পুরুষের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করার যে

নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার অপব্যাখ্যা। অনেকেই এই অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয় এবং বলতে চায় যে, হাদীসে তো এসেছে, যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়বে তার ঐ অংশ জাহান্নামে যাবে। তারা বলে, দেখুন হাদীসে তো অহংকারে শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং অহংকারবশত হলেই তা না জায়েয হবে। আর যদি অহংকারবশত না হয় বরং এমনিতেই বা ফ্যাশন হিসেবে হয় কিংবা এ জন্য হয় যে, আমার তা ভালো লাগে, তাহলে তাতে কোন গোনাহ নেই। আর প্রত্যেকেই মনে করে আমি যেহেতু অহংকারবশত করি না তাই আমার কোন অসুবিধা নেই। ইউরোপ আমেরিকায় আমার সফর হয়েছে। সেখানে দেখেছি মুসলমানদের মাঝে একথা এত প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, যাকেই প্রশ্ন করা হয়, সে-ই বলে আমি অহংকারের কারণে এমন করি না।

আমি তাদেরকে বললাম, আচ্ছা আমাকে এমন একজন মানুষ দেখাও তো, যে বলে, আমি এটি অহংকাবশত করি? এমন একজনও পাওয়া যাবে না। কারণ তাকাব্বুর এমন জিনিস– যে, সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তি যখন জানতে পারে তার মধ্যে তাকাব্বুর আছে তখনই তা শেষ হয়ে যায়। তাকাব্বুরের জন্মই এমনভাবে হয় যে, যার মধ্যে তা জন্ম নেয় সে টেরও পায় না। আমি কিবির বা তাকাব্বুরে লিপ্ত। সম্পূর্ণ শয়তানের ধোঁকায় মানুষ একথা বলে দেয় যে, আমার টাখনুর নিচে কাপড় পরা অহংকারবশত নয়, তাই তা জায়েয। এটা একেবারে ভুল ধারণা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইযার'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার আর কারো ব্যাপারে এমন কোন গ্যারান্টি নেই যে, সে কিবির থেকে পবিত্র থাকবে। একমাত্র তাঁর ব্যাপারেই এই গ্যারান্টি ছিল যে, তিনি কিবির থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যিনি তাকাব্বুর ও কিবির থেকে এমন পূত-পবিত্র ছিলেন, দেখুন! তিনি কখনো কিবির নেই বলে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করতেন না। তিনি পরিধান করতেন পায়ের অর্ধগোছা (নেসফে সাক্ব) পর্যন্ত উপরে উঠিয়ে। কারণ টাখনুর নিচে পরা হল অহংকারীর কাজ। অথচ আমরা যারা

প্রতি মুহূর্তে কিবিরে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় পতিত, তারা টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে– বলছি, আমার এটা অহংকারবশত নয়। এর চেয়ে বড় শয়তানের ধোঁকা আর কী হতে পারে? কারণ এই তাকাব্বুর এমন এক সূক্ষ্ম ব্যাধি– যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেও অনুমান করতে পারে না যে, সে তাতে আক্রান্ত হয়েছে।

বাহ্যিক বিনয়ে কিবির লুকিয়ে থাকে

হযরত থানভী রহ. বলেন, কখনো মানুষ এমন কাজ করে যা বাহ্যত বিনয়ের কাজ মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা আগা-গোড়া সম্পূর্ণ কিবিরের কাজ। যেমন, আজকাল এটার খুব প্রচলন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ নিজের ব্যাপারে বলে, আমি 'অধম' আমি 'জাহেল', 'মূর্খ', 'আমি তো কিছুই জানি না' ইত্যাদি। বাহ্যত মনে হয় এগুলো খুবই তাওয়াযু ও বিনয়পূর্ণ কথা, কিন্তু অনেক সময় একথাগুলোই আগা-গোড়া সম্পূর্ণ তাকাব্বুর ও অহংকার হয়ে থাকে। কারণ সে একথাগুলো এজন্য বলে, যাতে মানুষ তাকে বিনয়ী মনে করে এবং একথা বলে যে, না হযরত আপনি নিজেকে মূর্খ জাহেল বলছেন, আপনি তো অনেক বড় আল্লামা। আমার একথার বাস্তব অভিজ্ঞতা আপনার তখনই অর্জন হতে পারে, যখন এমন ব্যক্তিকে মুখে উপর কেউ বলে দিতে পারে যে, ঠিকই; তুমি আসলেও একটা জাহেল-মূর্খ। তখন দেখবেন তার মেজায কেমন হয়। যাতে বুঝা যায়– সে অন্তর থেকে একথা বলেনি। বরং এজন্য বলেছে যাতে মানুষ তাকে বিনয়ী বলে এবং তার প্রশংসা করে। এটা সুস্পষ্ট তাকাব্বুর। তাওয়াযু নয়।

বোঝা গেল তাকাব্বুর খুবই সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট, যার অস্তিত্ব সহজে আন্দায করা যায় না। এজন্য একজন অভিজ্ঞ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক প্রয়োজন। যিনি বুঝবেন যে, এর মধ্যে অহংকার আছে।

বাহ্যত তাকাব্বুর বাস্তবে তাকাব্বুর নয়

কখনো এমন হয় যে, বাহ্যত তাকাব্বুর মনে হয় কিন্তু আসলে তা তাকাব্বুর নয়। যেমন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَافَخْرَ

আমি সমস্ত আদম-সন্তানের সরদার। তবে এর উপর আমার কোন অহংকার নেই।

দেখুন একথা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। অন্য কারো মুখে একথা বেমানান এবং দোষনীয় ছিল। কিন্তু একথা বলছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– আমি সকল আদম-সন্তানের সরদার। তবে একথা আমি অহংকারবশে বলছি না। বরং আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শোকরিয়া হিসাবে বলছি। আল্লাহ্ দয়া করে আমাকে আদম-সন্তানের সরদার বানিয়েছেন। এখন দেখুন বাহ্যত এই কথা অহংকারের মতো মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু তা নয়। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি নেয়ামতের আলোচনা ও শোকরিয়া যে, আল্লাহ দয়া করে আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন।

প্রশংসার কারণে হযরত যুননূন মিসরী রহ.-এর হাসি

হযরত যুননূন মিসরী রহ. অনেক বড় আল্লাহর অলী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে লেখা হয়েছে, কেউ যখন তাঁর প্রশংসা করত যে, হযরত আপনি খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন– খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তখন তিনি খুব খুশি হতেন এবং হাসতেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে অনেকে ভাবত তিনি দেখি নিজের প্রশংসায় খুশি হচ্ছেন। যাদের অন্তরে আত্মতুষ্টি এবং কিবির থাকে তারাই তো এই আকাঙ্খা করে যে, আমার প্রশংসা করা হোক এবং তাতে তারা অনেক খুশিও হয়। একদিন হযরত যুননূন মিসরী রহ.-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'হযরত আপনার মনে হয় নিজের প্রশংসা শুনে খুব ভালো লাগে? কারণ কেউ যখন আপনার প্রশংসা করে তখন দেখি আপনি খুব খুশি হন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ ভাই! আমি খুব খুশি হই। কারণ কেউ যখন আমার কোন আমলের প্রশংসা করে তখন আমার মনে হয় আমার নিজের তো কোন আমলই নেই। এটা তো আল্লাহ্ পাকের দান। তিনিই তো আমাকে এ কাজের তাওফীক দান করেছেন এবং আমাকে দিয়ে একাজ করিয়েছেন। এখানে আমার প্রশংসা করা মানে তাঁরই প্রশংসা করা। আর আমি আল্লাহর প্রশংসায় খুশি হই। এবং একথায় খুশি হই যে, আমার আল্লাহ

আমাকে একাজের তাওফীক দান করেছেন। আমার দ্বারা এই কাজ করিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষ মনে করছে তিনি আত্মতুষ্টি ও অহংকারে লিপ্ত অথচ তিনি শোকর ও কৃতজ্ঞতার উচ্চাসনে সমাসীন।

মোটকথা! কখনো এমন হয় যে, মানুষ তাকাব্বুরে লিপ্ত থাকে কিন্তু সে তা বুঝতে পারে না। আবার কখনো এমন হয় যে, বাহ্যত তাকাব্বুর মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তা তাকাব্বুর হয় না। এজন্য একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট নয় যে, আমার ভেতরে তাকাব্বুর নেই। কারণ তোমার মধ্যে যখন তাকাব্বুর থাকবে তখন তোমার খবরও থাকবে না যে, তোমার মধ্যে তাকাব্বুর বা অহংকার আছে।

অহংকারীর দৃষ্টান্ত

কেউ মুতাকাব্বিরের সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অহংকারীর দৃষ্টান্ত হল পাহাড়ের চুড়ায় আরোহনকারীর মতো। পাহাড়ের উপর থেকে পাহাড়ের নিচের লোকদেরকে ছোট দেখা যায় বলে তাদেরকে নিজের চেয়ে ছোট মনে করছে। আর নিচের লোকেরাও তাকে ছোট মনে করছে। কারণ তারাও তাকে ছোট দেখছে। অর্থাৎ, সে অন্যদেরকে ছোট মনে করে, আর অন্যরা তাকে ছোট মনে করে। কারণ মুতাকাব্বির তার তাকাব্বুর থেকে বেখবর হওয়ার কারণে নিজেকে সবার চেয়ে উত্তম মনে করছে। আর অন্যান্যরা যারা জানে যে, এই লোক মুতাকাব্বির তারা সামনাসামনি তার যত প্রশংসাই করুক না কেন, তারা একথা খুব ভালোভাবেই বুঝে যে, সে একটা আহমক এবং মুতাকাব্বির। সে নিজেকে অনেক কিছু মনে করে। আসলে চিকিৎসক ছাড়া তাকাব্বুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই এই মনে করে ধোঁকা খাওয়া ঠিক নয় যে, আমি তো তাকাব্বুরের কারণে টাখনুর নিচে কাপড় পরি না। কারণ টাখনুর নিচে কাপড় পড়াই তাকাব্বুর সৃষ্টির একটি কারণ, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন।

তাকাব্বুরের বিষয়ে হযরতথানভী রহ.-এর কিছু বাণী আছে। নিচে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আলেমের জন্য নিজেকে জাহেলের চেয়ে ভাল মনে করা

জনৈক ব্যক্তি হযরতের কাছে লিখেছেন,

'অনেক সময় অন্তরে এই খেয়াল আসে যে, অমুক ব্যক্তি জাহেল আমি আলেম, সুতরাং আমি তার চেয়ে উত্তম।

(আনফাসে ঈসা-১৫৪)

একজনকে আল্লাহ্ বাস্তবেই ইলম দান করেছেন। তাই সে আলেম, অন্যজন আলেম নয়, এখন ঐ আলেমের অন্তরে এই খেয়াল আসা যে, আমার ইলম আছে, অমুকের ইলম নেই এবং ইলম অজ্ঞতা থেকে উত্তম, সুতরাং আমি অমুকের চেয়ে উত্তম। এটা তাকাব্বুরের অন্তর্ভূক্ত কি না? হযরত তার উত্তরে লিখেছেন,

'নফসকে বলে দাও যে, আল্লাহ্র কাছে কে উত্তম কে অধম? তা তুমি কি করে জান? হতে পারে তার অন্তর ভাল সে আল্লাহ্র কাছে ভাল, আর তুমি আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্ট-অপদস্থ। আর আল্লাহ্ তোমাকে বাহ্যিকভাবে সামান্য অক্ষরজ্ঞান দান করেছেন, তাতে তোমার বড়াই করার কি হল? তিনি যদি ইচ্ছা করেন এবং আজই তা ছিনিয়ে নেন তাহলে তোমার কি করার আছে? একথা বার বার স্মরণ কর এবং দোয়া করতে থাক।'

(আনফাসে ঈসা-১৫৪)

একটি সংশয়ের নিরসন

এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, অনেক সময় অন্তরে একথা আসে যে, মানুষ বাস্তবতাকে অস্বীকার করবে কীভাবে? যদি একজনের কাছে ইলম থাকে আর অপরজনের কাছে ইলম না থাকে, তাহলে সে কীভাবে একথা মনে করবে যে, আমার কাছে ইলম নেই, আর একথাও স্পষ্ট যে, ইলম জাহালাত থেকে উত্তম। কুরআনে সুস্পষ্ট ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ – سورة الزمر-٩

আপনি বলুন! যারা জানে আর যারা জানো না তারা কি এক সমান হতে

পারে? সুতরাং যার কাছে ইলম আছে সে কীভাবে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করবে, যে আমার কাছে ইলম নেই? অথবা মনে করো একজন মানুষ সুস্থ সবল। পক্ষান্তরে অন্যজন কিছুটা অসুস্থ ও দূর্বল। একথা খুবই স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সুস্থ্ সবল সে নিজেকে দ্বিতীয়জন থেকে স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ্ ও শক্তিশালী মনে করবে।

এমনিভাবে একজনের ধনসম্পদ বেশি। পক্ষান্তরে অন্যজনের সম্পদ কম। এখন স্বাভাবিকভাবেই যার কাছে পয়সা বেশি সে এটা মনে করবে যে আমি তার চেয়ে বেশি সম্পদশালী। আমার সম্পদ বেশি তার সম্পদ কম। অথবা একজন বড় অফিসার কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, দ্বিতীয়জন ঝাড়ুদার বা দিনমজুর। এখন বড় অফিসার ঝাড়ুদার থেকে নিজেকে বড় ও উচ্চপদস্থ্ মনে করবে এটাইতো স্বাভাবিক। তাহলে কি এটা তাকাব্বুর হবে? কিন্তু সে যদি নিজেকে তার চেয়ে ছোট মনে করে এবং সে যদি মনে করে আমি কিসের অফিসার আমি তো একজন দিনমজুর, তাহলে তো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে গেল। এমনিভাবে কোন সুস্থ্ সবল মানুষ যদি বলে আমি দুর্বল অসুস্থ্। কোন আলেম যদি মনে করে– আমি আলেম নই জাহেল, তাহলে তো এগুলো সব মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হল এর সমন্বয় কিভাবে হবে যে, মিথ্যা ও বাস্তবতার অস্বীকারও হবে না আবার কিবির ও অহংকারও হবে না।

সংশয়ের নিরসন

অন্য এক জায়গায় হযরত থানভী রহ. আরেকটি কথা বলেছেন, সেই কথাটি সামনে রাখলে এ প্রশ্নের সমাধান সহজে হতে পারে। হযরত থানভী রহ. বলেছেন–

آپنے آپکو اکمل سمجھنا تکبر نہیں افضل سمجھنا تکبر ہے

নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা তাকাববুর নয় বরং নিজেকে উত্তম মনে করা তাকাব্বুর। পূর্ণাঙ্গ মনে করার অর্থ হল, নিজের উপর আল্লাহর নেয়ামত বেশি মনে করা। অর্থাৎ, বাহ্যত আল্লাহ আমাকে অমুকের চেয়ে বেশি ইলম দান

করেছেন। অমুকের চেয়ে বেশি অসুস্থতা দান করেছেন। অমুকের চেয়ে বেশি সম্পদ দান করেছেন। অমুকের চেয়ে বড় বাড়ী দান করেছেন। অমুকের চেয়ে বেশি সন্তান দান করেছেন। মোটকথা! আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে একথা জানা এবং বিশ্বাস করা যে আলহামদুলিল্লাহ আমার উপর এই এই নেয়ামত আল্লাহ অন্যের চেয়ে বেশি দান করেছেন। এটা তাকাব্বুর নয়। অহংকার হল নিজেকে উত্তম মনে করা যে, আমি অমুকের চেয়ে উত্তম আর সে আমার চেয়ে অধম। আর এটার চিকিৎসা হযরত থানভী রহ. এই বলেছেন যে, আল্লাহর কাছে কে উত্তম এটা মানুষের কি জানা আছে! প্রকৃত উত্তম তো সেই যে আল্লাহর কাছে উত্তম।

এ নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় কর

অর্থাৎ, উপরে যে আলোচনা হল, নিজেকে অন্যের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ মনে করা, তথা ইলম, বয়স, সুস্থতা, সম্পদ ইত্যাদি নেয়ামতের ক্ষেত্রে নিজেকে অধিক নেয়ামতের অধিকারী মনে করা তাকাব্বুর নয়– এখানে একটি শর্ত রয়েছে। তা হল এটাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তার শোকর আদায় করতে হবে এবং একথা মনে করতে হবে যে, এই নেয়ামত আমার বাহুবলে নয়, এ একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে। আর বান্দা যখন এটাকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ মনে করবে তখন সে অহংকারে লিপ্ত হবে না।

নিজেকে উত্তম মনে করার কোন কারণ নেই

নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করার বিষয়টি একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ শেষ পরিণাম কি হবে তা কে জানে? কে আল্লাহর প্রিয়, আর কে অপ্রিয় তা একমাত্র তিনিই জানেন। তার কাছে ইলমের বড়ত্ব, বয়সের বড়ত্ব, কোন কাজে আসবে না। সম্পদের প্রাচুর্যও কোন কাজে আসবে না। একথার কোন গ্যারান্টি নেই যে, যার কাছে ইলম বেশি থাকবে সে অবশ্যই উত্তম হবে। বরং হাদীস শরীফ এসেছে, সর্বপ্রথম যাকে দিয়ে জাহান্নামের অগ্নিপ্রজ্জলিত করা হবে সে হবে একজন আলেম। সুতরাং শুধু ইলমের উপর ভরসা করে কিংবা দুনিয়ার মানুষ আমাকে সমীহ করে, বড় মনে করে

বা আল্লামা মনে করে, এজন্য নিজেকে উত্তম মনে করার কোন সুযোগ নেই। মনে রাখবেন, এর কোন ভরসা নেই। যখন হিসাব নিকাশ সামনে আসবে তখন বড় বড় আল্লামাও ধরা পড়ে যাবে। এমনিভাবে সম্পদের কারণেও নিজেকে উত্তম মনে করার কিছু নেই। কারণ কেয়ামতের দিন বড় বড় সম্পদশালীও জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হবে। সুতরাং কোন কিছুরই যখন কোন নিশ্চয়তা নেই– তখন মানুষ কিসের বলে নিজেকে উত্তম মনে করতে পারে?

এক বুযুর্গের ঘটনা

জনৈক বুযুর্গকে এক লোক বলল! তুমি আমার কুকুরের চেয়েও অধম। বুযুর্গ তার জবাবে বললেন, আসলে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না যে, আমি কুকুরের চেয়ে অধম না উত্তম? যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হব তখন যদি হিসাব-নিকাশের পর্ব পার হয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি কসম করে বলতে পারি, আমি তোমার কুকুরের চেয়ে উত্তম। আর যদি আমি হিসাব নিকাশের পর্ব নিরাপদে পার হতে না পারি এবং আমি আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হই, তাহলে তুমি খুবই ঠিক বলেছ যে, আমি কুকুরের চেয়েও অধম। কারণ ঐ কুকুরকে আল্লাহর সামনে হিসাবও দিতে হবে না এবং তাকে শাস্তির সম্মুখীণও হতে হবে না।

এই চিন্তা মন থেকে বের করে দাও

এঁরাই হলেন প্রকৃত আল্লাহওয়ালা। মানুষ তাঁকে গালি দিচ্ছে আর তিনি নিজের হাকীকত ও স্বরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হচ্ছেন। তিনি ভাবছেন– আমার প্রকৃত অবস্থা তো এই। তাই মাথা থেকে নিজের উত্তম হওয়ার চিন্তা বের করে দাও। নফসকে বলে দাও যে, তুমি কি জান, আল্লাহর কাছে কে উত্তম? হতে পারে তার অন্তর ভাল, হতে পারে তুমি আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়-অপদস্থ। আল্লাহ তোমাকে সামান্য জ্ঞান দান করেছেন আর তুমি অহংকার শুরু করে দিয়েছো। তিনি চাইলে তো এখনই তোমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাহলে এ তোমার কিসের দম্ভ! তুমি কি মায়ের গর্ভ থেকেই এই ইলম নিয়ে জন্মেছ! তিনিই তা তোমাকে নিজ দয়া ও

অনুগ্রহে দান করেছেন। তিনি যখন চাইবেন তখনই তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। তুমি কি সম্পদের বড়াই কর! তাহলে কি এ সম্পদ মায়ের গর্ভ থেকেই তুমি নিয়ে এসেছ?! এতো যিনি দান করেছেন তাঁর অনুগ্রহ মাত্র। তিনি চাইলেই তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। না তোমার সুস্বাস্থের দম্ভও ঠিক নয়। মনে রাখবে অনেক সুস্থ সবল ও শক্তিধরের শক্তি যখন তিনি ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন তারা একেবারে বাতাসের মত মিলিয়ে গেছে।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

আমার একপ্রিয়ভাজন ছিল। দুই বছর আগে যার ইন্তেকাল হয়েছে। তার ব্যাপারে দেওবন্দ জুড়ে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, সে ঘুষি মেরে বরফখণ্ড ভেঙ্গে ফেলে। তার এত শক্তি যে, সে কখনো তরমুজ চাকু দিয়ে কাটে না। এক ঘুষি দিয়েই ভেঙ্গে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিল একজন দুনিয়া বিমুখ আবেদ। শেষ দিকে এসে লাহোরের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। চার পাঁচ বছর আগে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে লাহোর গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম সেই শক্তিশালী মানুষটির খাবার গ্রহণের জন্য মুখ পর্যন্ত হাত উঠাবার শক্তিও নেই। অন্যরা তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে সে কেঁদে ফেলল এবং বলতে লাগল, আমি সেই হামেদ যে বরফ খণ্ড ঘুষি মেরে ভেঙ্গে ফেলত। আর এখন নিজের খাবার খাওয়ার শক্তিও নেই।

তুমি কিসের বড়াই কর!

আচ্ছা তুমি কিসের বড়াই কর? স্বাস্থ্যের? শক্তির? না সম্পদের? না কোন ইলমের বড়াই কর? আচ্ছা এগুলোর মধ্যে কোনটা এমনও আছে কি যা সর্বদা তোমার কাছে থাকবে বলে নিশ্চয়তা আছে? তা তো তোমাকে কেউ দান করেছেন। আবার যখন তিনি চাইবেন ফিরিয়ে নিবেন, এসব যদি তিনি এখনই ছিনিয়ে নেন তাহলে তোমার কী করার আছে? এই কথাগুলো বেশি বেশি স্মরণ কর এবং বার বার স্মরণ কর। যখন অন্তরে নিজের বড়ত্বের কথা আসে তখন খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবো, এতো আমার প্রতি কারো দান মাত্র। তিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে তা আমাকে দান করেছেন। যেখানে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আমার মত কত মানুষ আছে যারা ঘুরতে ঘুরতে জুতোর তলা

ক্ষয় করে ফেলেছেন কিন্তু কিছুই পাননি! আর যেভাবে তিনি আমাকে দান করেছেন সেভাবে তিনি আবার তা ফিরিয়েও নিতে পারেন। সুতরাং আমার জন্য বড়াই করা, দম্ভ করা, অন্যের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা এবং নিজেকে উত্তম মনে করার কোন সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ! তোমাকে তার শোকর আদায় করতে হবে। হে আল্লাহ তুমি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে এই নেয়ামত দান করেছ। আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না এবং এ আমার নাগালেও ছিল না, তুমিই দয়া করে তা দান করেছ তাই তোমার শোকর– হে আল্লাহ। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

'শোকর' অসংখ্য রোগের চিকিৎসা

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, শোকর এমন এক জিনিস যা অসংখ্য আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা। যে মানুষ শোকর আদায় করবে সে কখনো তাকাব্বুরে লিপ্ত হবে না। ইনশাআল্লাহ। কারণ শোকরের অর্থই হল, যে নিয়ামত আমি পেয়েছি তার হকদার আমি ছিলাম না এবং তার যোগ্যও আমি ছিলাম না। বরং আল্লাহ তা আমাকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে দান করেছেন। এটা একমাত্র তাঁরই দান ও এহসান।

শোকর কাকে বলে এবং কখন হয়?

যদি কেউ তার ফরয দায়িত্ব আদায় করে বা ঋন আদায় করে তাহলে কি ঋণদাতার উপর তার শোকর আদায় করা জরুরী? না জরুরী নয়। যেমন, কেউ আমার কাছ থেকে এক হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বলল, দুই মাস পর তা আদায় করব। এটা তার উপর আমার অনুগ্রহ হল যে, আমি তাকে এক হাজার টাকা ঋণ দিলাম। তার দায়িত্ব হল আমার শোকর আদায় করা। পরে যখন সে এই এক হাজার টাকা ফেরত দিবে তখনও তা ঋণ দাতার অনুগ্রহ হিসাবেই থাকবে যে সে দুই মাস পর্যন্ত এক হাজার টাকা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে। তাই ঋণ গ্রহীতা যখন ঋণ আদায় করবে তখন সে ঋণদাতার উপর কোন অনুগ্রহ করছে না যে, সে শোকরিয়া পাওয়ার হকদার হবে বরং সে তো তার দায়িত্ব আদায় করছে।

শোকর তখন আদায় করা হয় যখন মানুষ তার দায়িত্ব থেকে অতিরিক্ত কিছু করে। যেমন, যার উপর এক হাজার টাকা পরিশোধ করার দায়িত্ব ছিল সে যদি এক হাজারের পরিবর্তে খুশিমনে নিজ থেকে এক হাজার দুইশত টাকা আদায় করে তাহলে তার শুকরিয়া আদায় করা জরুরী। কারণ সে নিজের পক্ষ থেকে দায়িত্বের অতিরিক্ত কিছু অনুগ্রহ করেছে।

সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহর শোকর আদায় করে তখন তার অর্থ হয় আল্লাহর উপর একাজ জরুরী ছিল না এবং আমি এ নেয়ামতের হকদার ছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ একমাত্র তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে তা দান করেছেন। তাই শোকরের মধ্যে স্বীকারোক্তিও শামিল রয়েছে যে, আমি এই নিয়ামতের যোগ্য নই। আর যে ব্যক্তি নিজের অযোগ্যতার স্বীকারোক্তি দেয় সে কি করে তাকাব্বুরে লিপ্ত হতে পারে? কখনো পারে না । এজন্য যখনই আল্লাহর কোন নেয়ামত পাবে আল্লাহর শোকর আদায় করবে। ইনশাআল্লাহ এতে তাকাব্বুর সমূলে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার উপায়

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, যখন শয়তা[illegible] দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত হয়ে বলল,

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ
وَلَاتَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ (سورة الاعراف-١٧)

যেহেতু আদম আমাকে ধ্বংস করেছে তাই তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমি আদম সন্তানের সামনের দিক থেকে আসব, পেছনের দিক থেকে আসব এবং ডান দিক থেকে আসব, বাঁদিক থেকে আসব এবং তাদেরকে গোমরাহ করব। (সব শেষে বলছে) আপনি তাদের অধিকাংশকেই শোকর গুজার হিসাবে পাবেন না। (সূরা আরাফ-১৭)

আমাদের হযরত বলতেন শয়তান যেহেতু অনেক অভিজ্ঞ ছিল তাই তার জানা ছিল যে মানুষ শোকরগুজার হবে। তার উপর আমার ষড়যন্ত্র চলবে না। (এজন্য এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তাদেরকে শোকর থেকে দূরে রাখবে) এ

থেকে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায়কারী হবে তার উপর শয়তানের ষড়যন্ত্র চলবে না।

সংকট কালেও আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর

সর্বদা আল্লাহর নেয়ামতরাজির উপর তার শোকর আদায় কর। আর আল্লাহর নেয়ামত দু'টি একটি নয়। বরং প্রতি মুহূর্তে তার অসংখ্য নেয়ামতের বারি বর্ষণ হয়েই চলেছে।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا (سورة ابراهيم- ٣٤)

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতরাজি গণনা করতে চাও তবে তা গোণে শেষ করতে পারবেনা। (সূরা ইবরাহীম-৩৪)

মানুষ যেহেতু না-শোকর তাই সামান্য কষ্ট বা পেরেশানীতে পড়লে সারাক্ষণ সে তাই গেয়ে বেড়ায়। আর ঠিক বিপদের মুহূর্তেও তাকে আল্লাহপাকের যেসব নেয়ামত বেষ্টন করে রেখেছে সেগুলোর কোন আলোচনা করে না। এবং সেদিকে সামান্য খেয়ালও সে করে না। না হয় বিপদের মুহূর্তেও আমরা আল্লাহর এত এত নেয়ামতে নিমজ্জিত থাকি যা গণনা করা সম্ভব নয়।

শোকর আদায়ের একটি অভিনব ভঙ্গি

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর এক নানা ছিলেন। হযরতের তারবিয়াতে তাঁরও অনেক বড় ভূমিকা ছিল। তিনি বড় যোগ্য এবং অনেক বুযুর্গের সান্নিধ্য প্রাপ্ত ছিলেন। হযরত বলেন, 'আমি ছোট বেলা রাতে আমার নানাকে দেখতাম এবং এটা দেখে আমার বড় আশ্চর্য লাগত, তিনি ঘুমের আগে বিছানায় বসতেন এবং খুব আবেগ ও মুহব্বতের কণ্ঠে বলতে থাকতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

লাগাতার অনেক সময় পর্যন্ত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এরকম বলতে থাকতেন। যখন আমার কিছুটা জ্ঞান-বুদ্ধি হল তখন একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি রাতে ঘুমের আগে এগুলো কি করেন?' তিনি বললেন, আসলে সারা দিনই তো গাফলতের ঘোরে কেটে যায়, আল্লাহর শোকর আদায় করার সুযোগ হয় না, তাই আমি ঘুমের আগে বিছানায় বসে আল্লাহর এক একটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করে করে সেগুলোর শোকর আদায় করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই বাড়ী দান করেছেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আপনি সুস্থতা দান করেছেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আপনি রিযিক দান করেছেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আপনি এই আরামদায়ক বিছানা দান করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আপনি সব ধরণের বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আপনি স্ত্রী দান করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আপনি সন্তান দান করেছেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ এভাবে আমি এক একটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করে করে তার শোকর আদায় করি। যাতে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের হাজার না হোক অন্তত লক্ষ ভাগের এক ভাগও যেন আদায় হয়।

ঘুমাবার আগে শোকর আদায় করে নাও

হযরত রহ. বলতেন, তোমরাও এমন কর, রাতে ঘুমাবার আগে সকল নেয়ামতের শোকর আদায় করে নাও। সামান্য খেয়াল করলেই দেখবে শত-সহস্র নেয়ামতের কথা স্মরণ হবে। শুধু তাই নয় মাত্র একটি নেয়ামতের কথাও যদি চিন্তা করতে থাক, তাহলে দেখবে তা এত বেশি এবং এত বড় মনে হবে যে, সারা যিন্দেগীও যদি সেজদায় পড়ে থাক, তবুও তার শোকর আদায় হবে না। এই যে দুটি চোখ আল্লাহ দান করেছেন। এর মধ্যে থেকে একটি চোখের কথা চিন্তা করে দেখ। এটা কত বড় নেয়ামত। সামান্য একটু বালু যদি চোখে পড়ে তখন বুঝা যায় এটা কেমন নেয়ামত। এই একটি নেয়ামতের কথাই চিন্তা করে দেখ! শুধু এর যথাযথ শোকরও আদায় করা সম্ভব নয়।

অহংকার থেকে বাঁচার ছোট একটি কার্যকরি চিকিৎসা

আমাদের হযরত রহ. বলতেন, আরে মিয়া! তাকাব্বুর অনেক খারাপ জিনিস, বড় বড় চিকিৎসকদেরকেও ঘুরপাকে ফেলে দেয়। এর চিকিৎসা করা সহজ কাজ নয়। তবে আমি তোমাদেরকে ছোট্ট কিন্তু খুবই ক্রিয়াশীল একটি চিকিৎসা বাতলে দিচ্ছি। এটার উপর আমাল করলে ইনশাআল্লাহ্ এই তাকাব্বুরে লিপ্ত হবে না। আর যদি লিপ্ত হয়ে থাক তাহলে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসবে। চিকিৎসাটি হল, আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকর আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোল। প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে চলা-ফেরায়, ওঠা-বসায় আল্লাহর শোকরের বুলি জপ। মৌসুম ভালো তো বল

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

সুন্দর বাতাস চলছে তো বল–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

যে কোন ভাল বিষয় সামনে আসে তাতেই আল্লাহর শোকর আদায়ের অভ্যাস গড়। যত বেশি শোকর আদায় করবে ততই তাকাব্বুর থেকে দূরে থাকবে। উচ্চারণে এটা অনেক ছোট্ট মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব হল এটা অনেক বড় কাজের কথা। এটার উপর আমল করাও খুব কঠিন নয়। শুধু খেয়াল এবং চর্চা করার বিষয়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

চৌদ্দতম মজলিস

অহংকারের প্রকারসমূহ ও তার চিকিৎসা

অহংকারের প্রকারসমূহ ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

অহংকারের প্রকারসমূহ

হযরত থানভী রহ. বলেন–

> 'কিবিরের প্রকার এত বেশি যা গননা করার মত নয়। এবং তার অধিকাংশই এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যা বিজ্ঞ দৃষ্টি শক্তির অধিকারী ছাড়া কেউ তা ধরতে পারে না। এমনকি অক্ষর জ্ঞানের আলেমদেরকেও এসব ক্ষেত্রে সেই বিজ্ঞজনদের প্রশ্নহীন অনুসরণ করতে হয়।' (আনফাসে ঈসা-১৫৪)

যেমন আগেও আমি একথা বলেছি যে, কিবির এমন এক রোগ স্বয়ং রোগীও টের পায় না যে, সে এ রোগে ভুগছে এবং কিবিরের কোন কোন প্রকার এতই সুক্ষ্ম যে রোগী মোটেও অনুভব করতে পারে না তার মধ্যে এ রোগ আছে। এমন শায়েখ যিনি বুযুর্গ এবং বিজ্ঞ মুহাক্কিক তিনিই ধরতে পারেন যে, তার এ রোগ আছে কি নেই। এবং এই রোগের চিকিৎসা কী?

অহংকারের বিভিন্ন চিকিৎসা

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন। হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর নিয়ম ছিল কেউ এসলাহের জন্য আসলে প্রথমে তার কিবিরের চিকিৎসা করতেন। হযরত থানভী রহ. বিভিন্নজনের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসার ব্যবস্থা দিতেন। যেমন কারো মধ্যে দেখলেন তাকাব্বুর আছে তাহলে তাকে বললেন, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর মসজিদে দাঁড়িয়ে বলবে, 'ভাই আমার মধ্যে তাকাব্বুরী আছে, আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ যেন

আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দান করেন।' এখন এটা খুব স্বাভাবিক যে, একজন মানুষ যার অন্তরে তাকাব্বুর আছে তাকে যখন ভরা মজলিসে এই ঘোষণা দিতে হবে, তখন তার অন্তরে বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। একাজ যখন শায়খের নির্দেশে করা হয় তখন তা অন্তরে এমন শক্তিশালী আঘাত করে যার ফলে সমস্ত তাকাব্বুর খতম হয়ে যায়।

অথবা মনে করুন অহংকারী ব্যক্তির জন্য এই চিকিৎসা ঠিক করলেন যে, তুমি মুসল্লিদের জুতা ঠিক করবে। মোটকথা! তিনি একেকজনের জন্য একে চিকিৎসা দিতেন। প্রত্যেকের বেলায় একই চিকিৎসা কার্যকরী হয় না। কারণ একেক জনের রোগ একেক ধরণের। সকলের স্বভাব রুচি ও অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। রোগের উৎস ও কারণও ভিন্ন ভিন্ন,তাই একই চিকিৎসা সকলের বেলায় কার্যকরি হয় না। যেমন, ডাক্তার সাহেব একই সিরাপ সকলের জন্য লিখে দিলো।

অথবা কেউ মনে করল যে হযরত যেহেতু অমুককে এই রোগের এই চিকিৎসা দিয়েছেন, তাই আমি এই চিকিৎসা অবলম্বন করি, এটা ঠিক নয়। কারণ শায়খ প্রত্যেকের অবস্থা বুঝে তার উপযোগী চিকিৎসা দেন। যা অন্যের জন্য উপযোগী নয়।

নিজের চিকিৎসা নিজে করা

এক লোক দেখল যে, হযরত থানভী রহ. একজনকে এই চিকিৎসা দিয়ছেন যে, তুমি নামাযীদের জুতা ঠিক করবে। তখন সে নিজের চিকিৎসার জন্য শায়খের কাছে না বলে, নিজেও মুসল্লীদের জুতা ঠিক করতে শুরু করল। হযরত থানভী রহ. যখন খবর পেলেন যে অমুকে নিজ থেকেই নিজের এই চিকিৎসা শুরু করেছে, তখন তাকে ডাকলেন এবং বললেন, এভাবে চিকিৎসা হয় না। বরং আমার তো মনে হয় এভাবে মানুষের জুতা ঠিক করার দ্বারা তোমার অহংকার আরো বেড়ে যাবে; কমবে না। কারণ তোমার মাথায় শয়তান একথা ঢুকিয়ে দিবে যে, দেখ! তুমি কত বিনয়ী সুতরাং এটা কখনো ঠিক নয় যে, নিজেই নিজের (তাকাব্বুরের) চিকিৎসা শুরু করবে। বরং আল্লাহ যাকে এই জ্ঞান দান করেছেন তিনিই একাজ করতে পারেন।

কোন শায়খের তারবিয়াত গ্রহণ করা

সাধারণত যতক্ষণ মানুষ নিজেকে কোন শায়খের সামনে নিষ্পেষিত না করে, ততক্ষণ এ জ্ঞান অর্জিত হয় না। শায়খ যখন সামান্য সামান্য কারণে তাকে দলিত-মথিত করে দেন, তখন এর মাধ্যমে অন্তর থেকে কিবিরও বের হয়ে যায় এবং এই হাকীকতও সামনে এসে যায় যে, অহংকারের চিকিৎসা কী? আমাদের যেসব বুযুর্গের নামে আমরা বেঁচে আছি। যেমন হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী রহ., হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., প্রমুখ তাঁরা সকলেই নিজেকে শায়খের সামনে নিষ্পেষিত করেছেন। নিজে নিজেই তারা পীর বা শায়খ হয়ে যাননি।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ. এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. যখন দরসে নেজামীর পড়া-শোনা শেষ করে আলেম হয়েছেন মাত্র। (আমি আগেও একথা বলেছি যে, ইলম তাকাব্বুর পয়দা হওয়া অন্যতম কারণ। কেননা আলেম হওয়ার পর একথা মাথায় ঢুকে বসে যে, আমি অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি, আমি অনেক কিছু জানি।) যাইহোক! হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. যিনি তোমার আমার মত আলেম নন যে, কোন রকম কাঁচা-আধা পাকা পড়াশোনা করে আলেম হয়ে গেছেন। বরং তাঁর পড়া-শোনা ও যোগ্যতা ছিল অনেক বেশি এবং অনেক মজবুত। তখন থানাভবনের খানকায় তিনজন বুযুর্গ বসতেন। একজন হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানভী রহ., দ্বিতীয়জন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ., এবং তৃতীয়জন হযরত হাফেজ যামেন শহীদ রহ.। এঁদেরকে'আফতাবে' ছালাছা তথা 'কুতুবত্রয়' বলা হত। এই তিনজন আল্লাহর অলী তখন এ খানকায় বসতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ থানভী রহ. আলেম ছিলেন। তাঁর রচীত একটি পুস্তিকায় হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর দৃষ্টি পড়ল। যাতে এমন কোন কথা লেখা ছিল, যা হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে সঠিক বলে মনে হচ্ছিল না। তাই তিনি ভাবলেন, এ বিষয়ে হযরত

শায়খ মুহাম্মাদ থানভী রহ.-এর সঙ্গে মুনাযারা করবেন। এবং এই উদ্দেশ্যে থানাভনের দিকে রওয়ানা হলেন।

থানাভনে যেহেতু প্রথমে হযরত হাজী সাহেবের কামরা ছিল এবং আগে থেকে তার সঙ্গে গাঙ্গুহী রহ.-এর পরিচিয়ও ছিল, তাই তাঁকে সালাম করার জন্য প্রথমে তাঁর কামরার সামনে দাঁড়ালেন। হাজী সাহেব রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর দিলেন শায়খ মুহাম্মাদ থানভী রহ.-এর কাছে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন যাচ্ছ? উত্তর দিলেন, তার সঙ্গে মোনাযারা করতে হবে। হযরত হাজী সাহেব রহ. বললেন, তাওবা তাওবা, তিনি এত বড় আলেম আর তুমি মাত্র পড়া-শোনা শেষ করেছ, এখনই তুমি এত বড় আলেম এবং বুযুর্গের সঙ্গে মোনাযারা করতে যাচ্ছ? হযরত গাঙ্গুহী রহ. আরজ করলেন, তিনি তার পুস্তিকায় এমন ভুল কথা লিখে দিয়েছেন। হযরত হাজী সাহেব রহ. তাকে শান্ত করলেন। আর এই শান্ত করার মাঝেই আল্লাহ তার রূপ পাল্টে দিলেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর উপর হাজী সাহেবের এমন দৃষ্টি পড়ল যে, মোনাযার যে ইচ্ছা অন্তরে ছিল তা তো শেষ হলই সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাজী সাহেবের হাতে বাইয়াতও হয়ে গেলেন।

তোমাকে সব কিছু দিয়ে দিলাম

তারপর চল্লিশ দিন তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অথচ যখন গাঙ্গুহ থেকে এসেছেন তখন ভেবেছিলেন কিছুক্ষণ পরই চলে আসবেন। এজন্য কোন কাপড়ও সঙ্গে নেননি। পরনে যে এক জোড়া কাপড় ছিল তাই ধুয়ে দিতেন এবং শুকিয়ে আবার তাই পড়তেন। এভাবে সেখানে চল্লিশ দিন কাটিয়ে দিলেন। এ সময় হযরত হাজী সাহেব রহ. তাঁকে খুব দলিত ও মথিত করলেন, ফলাফল এই দাঁড়াল যে যখন চল্লিশ দিন পর ফেরত গেলেন তখন হযরত হাজী সাহেব রহ. তাকে বললেন, 'মিয়া রশীদ আহমাদ! আমার কাছে যা কিছু আমানত ছিল তার সব তোমার নিকট সোপর্দ করে দিলাম।'

এটা কোন সাধারণ 'মাকাম' নয় যে, শায়খ একথা বলবেন, আমার কাছে যা কিছু ছিল চল্লিশ দিনে আমি তোমাকে সব দিয়ে দিলাম। আল্লাহ তাঁকে এই মহান মর্যাদা ও মাকাম দান করেছিলেন।

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর 'আজব হালত'

এরপর তিনি যখন গাঙ্গুহ ফিরে গেলেন তখন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভাব-নিমগ্ন ও তন্ময়তায় নিমজ্জিত ছিলেন। এমনকি অনেকদিন পর্যন্ত হযরত হাজী সাহেবকে চিঠিও লিখেননি। তখন হযরত হাজী সাহেব রহ. নিজে চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় বৎস! অনেক দিন পর্যন্ত জানতে পারিনি কেমন আছ, কি অবস্থায় আছ। চিঠি লিখে সার্বিক অবস্থা জানাবে।'

লক্ষ করুন! এই চিঠি শায়খ নিজে মুরীদকে লিখছেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. এই চিঠির উত্তরে লিখলেন।

'হযরত! অনেক দিন হল চিঠি লিখতে পারিনি। বড় ত্রুটি হয়ে গেল। তবে চিঠি এজন্য লিখিনি যে, নিজের অবস্থা লিখতে লজ্জাবোধ হচ্ছিল। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গেল কিন্তু এখনও যে, দুরাবস্থা আমার তা কীভাবে লিখি, এ জন্য লজ্জাবোধ হচ্ছিল। অবশ্য আপনার দোয়া ও দৃষ্টিতে আগের এবং এখনকার মাঝে এই পার্থক্য মনে হচ্ছে যে,

১. শরীয়ত তবীয়তে পরিণত হয়ে গেছে।

অর্থাৎ, মানুষের জন্মগত ও প্রকৃতিগত চাহিদাগুলো দেখা দেয়ার পর যেমন তা পূরণ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না, তেমনি শরীয়তের দাবী ও চাহিদা যখন সামনে আসে তখন তা আদায় না করা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি হয় না।

২. প্রশংসাকারী নিন্দাকারী (এর প্রতি মানসিক অবস্থা) এক হয়ে গেছে।

অর্থাৎ, যে প্রশংসা করে এবং যে নিন্দা করে উভয়ই আমার কাছে বরাবর হয়ে গেছে। প্রশংসাকারী এবং নিন্দাকারীর মাঝে কোন পার্থক্য মনে হয় না। না কারো প্রশংসায় মনে উত্তেজনা জাগে, আর না কারো নিন্দায় মনে কোন পরিবর্তন আসে।

৩. শরীয়তের কোন বিষয়ে কোন আপত্তি হয় না।

এই চিঠি যখন হযরত হাজী সাহেবের কাছে পৌছল তখন তিনি তা মাথার উপর রাখলেন এবং বললেন—

সে যেই অবস্থার কথা চিঠিতে লিখেছে তা তো আমারও এখন পর্যন্ত অর্জিত হয়নি।

যাই হোক! এই যে এমন শায়খ এবং এমন মুরীদ তাদের এ অবস্থা এমনি এমনিতেই হয়ে যায়নি। বরং কিছু মাড়াই ও মর্দন খাওয়ার পরই তাঁরা এমন হয়েছেন।

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর আরেকটি ঘটনা

ঐ চল্লিশ দিনের অবস্থানকালে একদিন এ ঘটনা ঘটল যে, হযরত হাজী সাহেব রহ. মুরীদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীকে ডেকে বললেন, আজ তুমি আমার সঙ্গে খানা খাবে। তাই খাবারের সময় তিনি উপস্থিত হলেন। দস্তরখানে দু'টি পেয়ালা ছিল। একটাতে ছিল গোস্ত, অপরটিতে ডাল। হযরত নিজের সামনে গোস্তের পেয়ালা রাখলেন এবং ডালের পেয়ালা হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর সামনে রাখলেন, যেন এদিকে ইঙ্গিত করছিলেন যে, আমি গোস্ত খাব আর তুমি ডাল খাবে। এমন সময় হযরত হাফেজ যামেন শহীদ রহ. এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হযরত! এটা কেমন কথা! আপনি নিজে কোপ্তা খাচ্ছেন আর তাকে ডাল খাওয়াচ্ছেন ?

হযরত হাজী সাহেব উত্তর দিলেন, আরে এতো আমার অনুগ্রহ যে তাকে আমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি। উচিত তো ছিল রুটিতে ডাল দিয়ে দিতাম আর সে বাইরে গিয়ে সিঁড়িতে বসে খেয়ে নিত।

একথা বলার পর তিনি হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একথার প্রভাবে তার চেহারায় কোন পরিবর্তন এসেছে কি না? দেখলেন, না কোন পরিবর্তন আসেনি। তখন বুঝলেন, আলহামদু লিল্লাহ কিবিরের ব্যাধি বের হয়ে গেছে। মোটকথা! ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য এভাবে মাড়াই করা হয়। এবং এতেই চিকিৎসা হয় এবং সংশোধন আসে। সবার সাধ্য নয় নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে যে, আমার চিকিৎসা কিভাবে হবে?

শায়খকে দিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণ করো

জনৈক ব্যক্তি আব্বাজানের কাছে আসত। তবে সে নিজেই নিজের চিকিৎসা ঠিক করত, নিজেই সিদ্ধান্ত নিত যে, আমার মধ্যে তাকাব্বুর আছে

এবং নিজেই নিজের চিকিৎসা ঠিক করত। একবার আব্বাজান তাকে ধরলেন এবং বললেন, এভাবে তোমার নফস ও রিপু আরো মোটা তাজা হচ্ছে। এবং তোমার তাকাব্বুর আরো বেড়ে চলেছে। হযরত থানভী রহ. বলেন, 'তাকাব্বুরের' অসংখ্য প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের বিধান ভিন্ন, চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্ন– তাই চিকিৎসার জন্য নিজেকে কোন শায়খের নিকট সোপর্দ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। শায়খ প্রথমে দেখবেন তার মধ্যে তাকাব্বুর আছে কি নেই। কারণ অনেক সময় বাস্তবে তাকাব্বুর থাকে না বরং তাকাব্বুরের সন্দেহ থাকে। আবার অনেক সময় বাস্তবে তাকাব্বুর থাকে কিন্তু তা তাকাব্বুর বলে মনে হয় না। এজন্য শায়খ প্রথমে নির্ণয় করবেন তাকাব্বুর আছে কি না। নির্ণয় করার পর চিকিৎসাও তিনিই ঠিক করবেন।

প্রশ্নহীনভাবে শায়খের অনুসরণ কর

প্রশ্নহীনভাবে শায়খের অনুসরণ করা জরুরী। এমনটি যারা আলেম এবং একাডেমিক শিক্ষা সমাপনকারী, কুরআন হাদীস ও ফিক্হ সব পড়েছেন, বাহ্যত যদিও তিনি সব জানেন, তবুও এসব আলেমকেও মুহাক্কিক শায়খের অনুসরণ করতে হয়। যখন শায়খ বলবেন, তোমার মধ্যে কিবির আছে, তখন এটা বুঝে নিতে হবে যে, হ্যাঁ, আমার মধ্যে কিবির আছে এবং তার মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে হবে। কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ নেই। কোন আপত্তি করলে ধ্বংস অনিবার্য। কেউ খুব সুন্দর বলেছেন যে,

تلمیذے کہ چوں و چرا نکند و مریدے کہ چوں و چرا کند

ہر دو را بصحرا باید فرستاد

যে ভাল ছাত্র সে 'কি ও কেন' প্রশ্ন করবে আর ভালো মুরীদ হল, যে 'কি ও কেন' প্রশ্ন করবে না। এর ব্যতিক্রম হলে তাকে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, যে ছাত্র আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন করছে সে যদি 'কি ও কেন' প্রশ্ন না করে তবে তাকে বহিষ্কার কর। কারণ সে ছাত্র হওয়ার যোগ্য নয়। তার কাজই হল বুঝার জন্য 'কি ও কেন' প্রশ্ন করবে। যে কোন সন্দেহ

হলেই তা শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করবে। আর যে ব্যক্তি কোন শায়খের মুরীদ হয়ে প্রশ্ন করবে এটা কেন করেছেন? এটা কী জন্য করলেন? তাহলে তাকেও বাহিষ্কার করে দাও। কারণ সে মুরীদ হওয়ার যোগ্য নয়। ছাত্রের বৈশিষ্ঠ্য হল, সে 'কি ও কেন' প্রশ্ন করে সমাধান করে নিবে। যে ছাত্র কোন প্রশ্ন করে না চুপ করে বসে থাকে, সে হল বোকা। সবকের হক সে আদায় করে না। আর মুরীদের বৈশিষ্ট্য হল সে চুপ করে বসে থাকবে, কোন প্রশ্ন করবে না। যদি সে 'কি ও কেন' প্রশ্ন করে তাহলে এর অর্থ বুঝতে হবে তার মধ্যে সমস্যা আছে।

এজন্য যে ব্যক্তি অক্ষরজ্ঞানের আলেম তার জন্য এটা বেশি প্রয়োজন পড়ে যে, সে প্রশ্নহীনভাবে শায়খের কথা মেনে নিবে। কারণ ইলমের মধ্যে উচ্চভাব বিদ্যমান। তাই যার মধ্যে ইলম আসে তার মধ্যে এমনিতেই বড়ত্বের অনুভূতি চলে আসে। সে মনে করে আমার মধ্যে এই পূর্ণতা বিদ্যমান। তাই অধিকাংশ সময় ইলমের সাথে তাকাব্বুর এসেই যায়। যতক্ষণ না তার তারবিয়াত হয় এবং শায়খের হাতে দলিত-মথিত হয়।

মরহুম ভাই যাকী কাইফী রহ.-এর ঘটনা

আমার সবচেয়ে বড় ভাই ছিলেন মরহুম যাকী কাইফী রহ.। যিনি কবিও ছিলেন। ছোটকালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে কাফিয়া-শরহেজামী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর পড়া ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে গেলেন। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাইজান! আপনি লেখা-পড়া সম্পূর্ণ না করে মাঝখানে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, বড় মিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। বড় মিয়া বলতে হযরত মিয়া সাইয়্যেদ আসগর হোসাইন রহ. উদ্দেশ্য। যিনি 'মিয়া সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এবং কাশফ ও কারামাতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঘটনাটি কি ছিল? ভাইজান বললেন, একবার আমি দারুল উলূম দেওবন্দ যাচ্ছিলাম। পথে মিয়া সাহেবের বাড়ী ছিল এবং হযরত মিয়া সাহেব রহ. তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। আর আমাদের আব্বাজন রহ.-এর তারবিয়্যাতের সুফল এই ছিল যে, হযরত মিয়া সাহেব রহ. বাড়ীতে থাকতে তার বাড়ির পাশ দিয়ে

চলে যাব আর তাকে সালাম দিয়ে তার দোয়া নিয়ে যাব না, এটা কখনো হতে পারত না। তাই আমি মনে করলাম, তাঁকে সালাম দিয়ে দোয়া নিয়ে তারপরই মাদরাসায় যাই। মিয়া সাহেব বাদাম বা এজাতীয় কিছু কাছে রাখতেন এবং ছোটরা তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে তাদেরকে তা দিতেন।

ইলম অহংকার সৃষ্টির কারণ

আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং গিয়ে সালাম করলাম। হযরত মিয়া সাহেব রহ. সালামের উত্তর দিলেন। তারপর আমি দোয়া চাইলাম। 'হযরত আমার জন্য দোয়া করে দিন, আল্লাহ্ যেন আমাকে ইলম দান করেন।' বড় মিয়া বললেন, না ভাই, না। ইলম খুব খারাপ জিনিষ, আমি তোমার জন্য দোয়া করব না। তখন আমি খুব পেরেশান হলাম। হায় আল্লাহ্! ইনি বলছেন, ইলম খুব খারাপ জিনিস। তারপর তিনি নিজের ব্যাপারে বলতে লাগলেন দেখ, মিয়া সাহেব আগে দারুল উলূমে মূলসেরীতে ছেঁড়া-ফাড়া চাটাইয়ে বসত আর এখন চকিতে বসে পড়ায়। এবং মিয়া সাহেবকে এখন বলে দেখ যে, মিয়া সাহেব নিচে বসে পড়ান, দেখবে মিয়া সাহেবের মেজায খারাপ হয়ে যাবে। মিয়া! ইলম তো তাকাব্বুর পয়দা করে। এ কারণে আমি তোমার জন্য ইলমের দোয়া করব না। সেদিন থেকেই আমার এ আশঙ্কা হয়ে গিয়েছিল যে, বড় মিয়া তো আমার ভবিষ্যতের ঠিকানা সুস্পষ্ট করে দিলেন। এই ইলম তো আমার পূর্ণতায় পৌছাবে না। কারণ তিনি হলেন কাশফ ও কারামতের অধিকারী বুযুর্গ। আল্লাহ হয়তো তাঁর অন্তরে একথা খুলে দিয়েছেন যে, ইলমের পূর্ণতায় পৌছা আমার তাকদীরে নেই। আর তিনি তা ছোট শিশুকে সুন্দরভাবে কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, ইলম তাকাব্বুর পয়দা করে। সুতরাং ইলম দ্বারা যদি তাকাব্বুরী পয়দা হয়ে যায়, তাহলে ঐ ইলম থেকে একজন মানুষের জন্য জাহেল থাকা এবং একজন উম্মি বেদুঈনের মত জীবন যাপন করা হাজারো গুণ ভাল। কারণ তাতে আল্লাহর কাছে তাকাব্বুরের আযাব অন্তত ভোগ করতে হবে না। আর ইলমের সঙ্গে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় তাকাব্বুর

পয়দা হয়ে যায়। এর সামাধান হলো, নিজের লাগাম কোন শায়খের হাতে তুলে দেয়া। এছাড়া আর কোনই উপায় নেই। তিনি দেখবেন যে, তার মধ্যে কি রোগ আছে এবং কোন রোগের কি চিকিৎসা হতে পারে।

ইলম দুমুখী তলোয়ার

আমার আব্বাজান রহ. বলতেন, ইলম হল দুমুখী তলোয়ার। যদি আল্লাহ এই ইলমের নূর দান করেন এতে বরকত দান করেন এবং একে উপকারী বানান তাহলে তো সুবহানাল্লাহ এ ইলম এক বিস্ময়কর বিষয়, কিন্তু আল্লাহ না করুন! যদি এই ইলমে আল্লাহ প্রদত্ত নূর ও বরকত না থাকে এবং এর উপকারিতা না থাকে বরং তা মানুষকে কিবির ও অহংকারে লিপ্ত করে দেয় তাহলে এই ইলমের চেয়ে ধ্বংসাত্মক জিনিষও আর কিছু নেই। মুহতারাম আব্বাজান বলতেন, খাবার যত তৈলাক্ত মানসম্মত ও সুস্বাদু হয়, নষ্ট হওয়ার পর তা ততই খারাপ এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয়। খাবার যদি খুব সাধারণ হয় এবং তাতে তৈল না থাকে, তাহলে তা নষ্ট হলেও খুব সামান্য দুর্গন্ধ হয়। কিন্তু তৈলাক্ত উন্নত খাবার নষ্ট হলে পুরো মহল্লা দুর্গন্ধময় করে ফেলে। এমনিভাবে মানুষ যত বেশি উপর থেকে পড়ে যাবে তত বেশি আঘাত পাবে। তদ্রূপ এই ইলম যদিও সর্বোচ্চ মানের বিষয় কিন্তু যদি এটা নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষকে তাকাব্বুর ও অহংকারে লিপ্ত করে দেয় তাহলে এই ইলম মানুষের জন্য বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আলেমদের জন্য কোন শায়খের মাধ্যমে নিজের ইসলাহ ও সংশোধন করানো বেশি জরুরী।

শয়তানের একটি ঘটনা

আমি মুহতারাম আব্বাজানের কাছে শুনেছি, জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে শয়তান অনেকগুলো গাড়ি নিয়ে কোথায়ও যাচ্ছে। যেমন ফেরিওয়ালা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ফেরি করে মালামাল বিক্রি করে। যখন গাড়িগুলোর ভেতরে লক্ষ করল, তখন দেখল কোনটায় পায়খানা ভর্তি, কোনটায় গোবর ভর্তি আর কোনটায় পেশাব ভর্তি। সে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করল, আরে এগুলো কি? শয়তান এক গাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল, এগুলো তাকাব্বুর, আরেকটি দেখিয়ে বলল, এগুলো পদমর্যাদার লোভ, অপরটির দিকে দেখিয়ে বলল এগুলো হিংসা ইত্যাদি।

এ বিষয়গুলোই নাপাকরূপে দেখা যাচ্ছে। সে পুনরায় শয়তানকে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? শয়তান উত্তর দিল, বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। সে বলল, আরে! পয়সা দিয়ে এগুলো তোমার কাছ থেকে কে কিনবে? শয়তান বলল, আমার মাল কোন বাজারে বিক্রি হবে এবং কারা এর খরীদদার তা আমার ভালো করেই জানা আছে। এই তাকাব্বুর এবং পদমর্যাদার লোভ, মৌলবীদের কাছে নিয়ে বিক্রি করব, তারা এ দুটির প্রতি খুব আগ্রহী, এগুলো খেতে তারা খুব স্বাদ পায়। হুব্বে জাহ' বা পদমর্যাদার লোভের অর্থ হল, এমন মর্যাদাপূর্ণ সুখ্যাতি যার ফলে মানুষ আমার সামনে মাথা নত করবে, আমার ভক্ত হয়ে যাবে, আমার প্রশংসা করবে। এগুলো সব হুব্বে জাহের অন্তর্ভূক্ত। এই হুব্বে জাহ' বিক্রি করার সবচেয়ে ভালো বাজার হল মৌলবী সাহেবগণ। সেখানে গিয়ে এগুলো বিক্রি করব এবং তারা খুব স্বাদ নিয়ে তা খাবে।

আমি কিছু একটা হয়ে গেছি মনে করা

এই ইলমের সত্ত্বার মধ্যেই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, তা উচু হওয়ার বাসনা করে । এজন্য তা আলেমের মধ্যে তাকাব্বুর সৃষ্টি করে। ইলমের আরেকটি সমস্যার দিক হল, মানুষ সাধারণত আলেমে দীনের সম্মান করে থাকে। কেউ হাতে চুমু খায়, কেউ পায়ে চুমু খায়, কেউ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাদিয়া নিয়ে আসে, কেউ দাওয়াত করে। এসব কারণে আলেম নিজের ব্যাপারে এমন মনে করতে থাকে যে, আমি কিছু একটা হয়ে গেছি। এত মানুষ যখন আমার সম্মান করছে, আমার পিছনে ঘুরছে, তাহলে আমার মধ্যে অবশ্যই কিছু আছে।

এক লোভীর ঘটনা

আলেমের একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত থানভী রহ. লিখেছেন, 'আশআব তাম্মা' অনেক লোভী এক মানুষ ছিল। রাস্তা দিয়ে কোথায়ও যাচ্ছিল, শিশুরা তাকে খেপিয়ে তোলার জন্য তার পিছনে লেগেছে। তখন সে শিশুদেরকে তার পিছু ছাড়াবার জন্য বলল, আরে তোমার এখানে কি

করছ? অমুক জায়গায় তো মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে। শিশুরা যখন তার কথায় সেদিকে দৌড় দিল, তখন সে নিজেও শিশুদের পিছনে দৌড়াতে লাগল। মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেন দৌড়াচ্ছ? সে উত্তর দিল– সব শিশুরাই যখন দৌড়াচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই হয়তো মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে। আমাদের অবস্থা ও ঠিক এরকম। প্রথমে তো নিজের সামান্য ইলম দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেই। তারপর মানুষ যখন ভক্ত হয়ে যায় এবং কেউ হাতে চুমু খায়, কেউ দাওয়াত দেয়, কেউ হাদিয়া নিয়ে আসে, কেউ আল্লামা উপাধি দেয়– তখন আমার মাথায়ও এই ধারণা আসে যে, এত মানুষ যখন আমার পিছনে ঘুরছে আমার ভক্ত হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমার মধ্যে এমন কোন গুণ ও বৈশিষ্ট আছে, যার কারণে মানুষ এমন করছে। কবি তো বলেছেন–

زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو

মাখলুকের যবানকে আল্লাহর জিহ্বা মনে কর।

সুতরাং এসব কারণে একজন আলেম আরো বেশি তাকাব্বুরের শিকার হয়ে যায়।

ইলমের শোকর আদায় কর

তাই যারা ইলমে দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অথবা যাদেরকে আল্লাহ্ অন্য কোন গুণ দান করেছেন তার ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক থাকা চাই, যাতে তা রোগে পরিণত না হয়ে যায়। আর যদি রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে এক্ষুণি তার চিকিৎসা করে নেয়া জরুরী। চিকিৎসার উপায় হল, ইলমের উপর আল্লাহর শোকর আদায় করা। হে আল্লাহ! আমি এই ইলমের যোগ্য ছিলাম না। তবুও আপনি দয়া ও অনুগ্রহ করে আমাকে ইলম দান করেছেন। হে আল্লাহ! আপনার শোকর। এই শোকরের সাথে সাথে একথা স্মরণ করবে যে, এই ইলম তার দানমাত্র। আর তিনি যখন চাইবেন তখন তা ফেরত নিয়ে নিবেন। তার উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে– لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا যার ফলে তারা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর আবার তা ভুলে যায়। (নাহল-৭০)

অর্থাৎ, সবকিছু জানা ছিল পরে সব হারিয়ে গেছে, এখন তার কিছুই জানা নেই। এই হল মানুষ। যদি মানুষের মাথার স্ক্রু সামান্য ঢিলা হয়ে যায়, তাহলে এক সেকেন্ডের মধ্যেই তার সব জ্ঞান গরিমা সব গবেষণা খতম হয়ে যায়। সুতরাং কি আছে তার গর্ব অহংকারের? কি আছে তার গরিমা করার, দম্ভ করার ?

আলেম ও শায়খের পার্থক্য

এ জন্যই হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এবং হযরত নানুতবী রহ. যারা ছিলেন ইলমের পাহাড় তারাও নিজের ইসলাহ্ ও সংশোধনের জন্য হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর কাছে গিয়েছেন। যিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় একজন পূর্ণাঙ্গ আলেমও নন। হযরত নানুতবী রহ. কে যখন মানুষ প্রশ্ন করেছিল, হযরত! এটা কেমন উল্টা কথা যে, আপনি তার কাছে গেলেন অথচ তার আপনার কাছে আসার কথা ছিল। আপনি আলেম, তিনি আলেম নন।

এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত নানুতবী রহ. বলেছিলেন, আমাদের এবং তার উদাহরণ হল, যেমন কোন মানুষের মিষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ জনা-শোনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান আছে অথবা কারো চমচমের ব্যাপারে জানা আছে যে, এটা সর্বপ্রথম কে তৈরী করেছে? কোথায় কোথায় এটা প্রসিদ্ধ? কোন কোন দেশে এটা খাওয়া হয়? কি কি দ্বারা তৈরী হয়? কিভাবে তা বানানো হয়? তা কত প্রকার? এবং তাকে বলা হলে চমচমের উপর সে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে দিবে। কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কখনো চমচম খেয়েছ? বলবে, না! আমি কখনো তা খাইনি। আরেকজন যিনি চমচমের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। কে তা আবিষ্কার করেছে? কিভাবে তা তৈরী করা হয়? কিছুই সে জানে না। কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা সে চমচম খায়। এরপর নানুতবী রহ. বললেন, এবার বল কে ভালো? কে চমচম সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ? যে চমচম সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে পারে সে? না যে সকাল-সন্ধ্যা চমচম খায় সে? উত্তর স্পষ্ট, যে সকাল-সন্ধ্যা চমচম খায় সেই ভালো, যদিও সে চমচমের গুণ বৈশিষ্ট্য কিছুই বলতে পারে না।

তারপর নানুতবী রহ. বললেন, আমাদের অবস্থা হল ঐ ব্যক্তির মত যে চমচমের পুরো ইতিহাস জানে, শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ জানে, কিন্তু কখনো তা খেয়ে দেখেনি। আর হাজী সাহেব রহ. হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি সকাল সন্ধ্যায় সেই চমচম খেয়ে থাকেন। আমরা তো শুধু চমচমের ইতিহাস পড়েছি। যখন হাজী সাহেবের কাছে গিয়েছি, তখন তিনি চমচম আমাদের মুখে তুলে দিলেন। নাও! চমচম খেয়ে দেখ। আর এজন্যই আমরা হাজী সাহেবের কাছে গিয়েছি।

সারকথা হল, আলেমদের জন্য এটা বিশেষভাবে জরুরী যে, তারা কোন শায়খের কাছে গিয়ে নিজের বাতেনের সংশোধন ও তারবিয়াত গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

পনেরতম মজলিস

অহংকারের আরেকটি চিকিৎসা

অহংকারের আরেকটি চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّابَعْدُ

'হযরত থানভী রহ. বলেন, 'অহংকারের আরেকটি চিকিৎসা হল, আল্লাহ সুবহানাহুর বড়ত্বকে সামনে রাখা এবং স্মরণে রাখা। যখন কিবিরের আশঙ্কা হয় তখন তো অবশ্যই বরং উত্তম হল প্রতিদিনই এ কাজের জন্য একটি সময় ঠিক রাখা।'

অর্থাৎ, কিবিরের একটি চিকিৎসা হল, মানুষ আল্লাহর বড়ত্বের কথা স্মরণ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৈন্যতা ও হীনতার কথাও স্মরণ করবে। এমনিভাবে এক বুযুর্গের ঐ কথাও স্মরণ করবে যা তিনি জনৈক মুতাকাব্বিরকে বলেছিলেন যখন সে বলেছিল, তুমি জান আমি কে? তখন সেই বুযুর্গ তার উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ আমি জানি তুমি কে? তোমার স্বরূপ হল—

أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ وَآخِرُكَ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

অর্থাৎ, তোমার শুরু হল এক ফোঁটা নাপাক বীর্য এবং তোমার শেষ একটি দুর্গন্ধময় লাশ আর এ দুয়ের মাঝে কিছু দিন তুমি কিছু নাপাকী বহন করে বেড়াচ্ছ। তোমার মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনও তোমাকে কাছে রাখতে প্রস্তুত হবে না। কোথাও মাটির নিচে পুঁতে দিবে। কারণ তোমাকে ঘরে রাখলে সারা ঘর তুমি দুর্গন্ধময় করে দিবে। আর এই শুরু শেষের মাঝে কিছুদিন তুমি দুনিয়াতে ঘুরাফেরা করছ তাও প্রতি মুহূর্তে কিছু নাপাকী বহন করে বেড়াচ্ছ।

চামড়ার আবরণ

আল্লাহ্ এসব ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার উপর চামড়ার পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। এই চামড়ার আবরণ কোথায়ও সামান্য ফুটো হলে, তা থেকে যতসব নাপাকি ও দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। কোথাও থেকে রক্ত, কোথাও থেকে পুঁজ, কোথাও থেকে মল বা মুত্র। পুরো শরীরেই শুধু পঁচা দুর্গন্ধ আর পঁচা দুর্গন্ধ। কিন্তু আল্লাহ্ দয়া করে এগুলোর উপর চামড়ার পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন– যার কারণে সেগুলো দেখা যায় না। হযরত থানভী রহ. বলেন, যখনই তোমার অন্তরে নিজের বড়ত্বের কথা আসবে তখনই একথা একটু চিন্তা করে দেখ যে, আমার শুরু কী? আমার শেষ কী? এবং আমার অস্তিত্বের হাকীকত কী?

মলত্যাগের অবস্থা চিন্তা কর

হযরত থানভী রহ. বলেন, কিবির দমন করার আরেকটি কার্যকরি ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছি। তাহল, যখন মনে তাকাব্বুর আসে তখন তোমার ঐ অবস্থার কথা চিন্তা কর, যা মলত্যাগের সময় তুমি অবলম্বন কর। চিন্তা করে দেখ, তোমার তখন কি অবস্থা হয়? কি সূরত হয়? এতে তোমার সব তাকাব্বুর ধরাশায়ী হবে এবং এটা বুঝে আসবে যে, আমার নিজের হাকীকত এবং স্বরূপ কী?

মোটকথা! আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের কথা এবং নিজের দৈন্য ও হীনতার কথা স্মরণ করবে। মানুষ কিসের গর্ব করবে? কিসের বড়াই? কিসের অহংকার করবে? কোন জিনিস না তার নিজের, না কোন জিনিস তার শক্তি বলে অর্জিত। না কোন জিনিস ধরে রাখার ক্ষমতা তার আছে। যা আছে তা সবই তো অন্যের দান।

আরো একটি চিকিৎসা

হযরত থানভী রহ. বলেন,

> ‘অহংকারের চিকিৎসার একটি অংশ হল নিজে ইচ্ছা করেই এমন কাজকর্ম করবে যা সমাজের লোকদের দৃষ্টিতে নিচু কাজ মনে করা হয়। এটা ছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা যথেষ্ট নয়।’

অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় এমন কাজ-কর্ম অবলম্বন করবে যা সাধারণভাবে মানুষ হীন ও অবমাননাকর মনে করে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম করতেন।

হযরত উমর রাযি.-এর নিজের চিকিৎসা

হযরত উমর ফারুক রাযি. একবার একটি শানদার জুব্বা পরিধান করে খুতবা দিলেন। জুব্বাটি তাঁর খুব পছন্দ হল। নিজেকে আপাদ মস্তক ভালো লাগল। কিছুক্ষণ পরই জুব্বাটি খুললেন এবং পানির মশক নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে পানি পৌঁছে দিতে লাগলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি এ কি করছেন? তিনি বললেন, যেহেতু আমার মধ্যে আত্মগর্ব এবং আত্মতুষ্টির চিন্তা এসেছে, তাই আমি তার চিকিৎসা করছি।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ও তার গভর্ণরী

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। একবার বাহরাইনের গভর্ণর ছুটিতে যাচ্ছিলেন। তার পরিবর্তে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে গভর্ণর বানানো হল। যেহেতু তিনি দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং সারা জীবন 'কালাল্লাহ' কালার রাসূল' (কুরআন হাদীসের পড়াশোনায়) অতিবাহিত করেছেন, তাই সারাদিন গভর্ণরী কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে সন্ধ্যাবেলা একটি লাকড়ীর বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারের উপর দিয়ে যেতেন এবং এই ঘোষণা করতে থাকতেন, সরে দাড়াও ভাই, আমীরুল মুমিনীন আসছেন, সর ভাই সর, আমিরুল মুমিনীন আসছেন। এটা বলে তিনি এই দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, যে, দেখ! আমীরুল মুমিনীনের কি অবস্থা– কাঠের বোঝা মাথায় করে আসছেন। একাজ তিনি এজন্য করতেন যাতে গভর্ণরীর দায়িত্বের কারণে অন্তরে অহংকার পয়দা না হয়ে যায়।

তালিবে ইলমদের জুতা বহন করা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. যিনি 'কুতুবুল ইরশাদ' যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং এযুগের আবু হানিফা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তার ঘটনা হযরত থানভী রহ. 'আরওয়াহে ছালাছা' কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত

একবার সবক পড়াচ্ছিলেন এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। তালেবে ইলমদের বললেন, ভিতরে চল। তালেবে ইলমরা সবাই নিজ নিজ কিতাব নিয়ে ভেতরে চলে গেল আর হযরত সবার জুতা একত্র করে সবগুলো নিয়ে ভেতরে গেলেন, যাতে তাদের জুতাগুলো বৃষ্টিতে নষ্ট না হয়।

তিনি দুই কারণে তাদের জুতা উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এক নিজের চিকিৎসার জন্য। যাতে নিজের মধ্যে তাকাব্বুরের সামান্যতম গন্ধও না থাকে। দ্বিতীয় কারণ ছিল মানুষ যখন নফসের এই চিকিৎসা করে নেয় তখন তার নফস পবিত্র ও আলোকিত হয়ে যায়। আর আল্লাহওয়ালাদের নফস যখন পবিত্র ও আলোকিত হয়ে যায়, তখন তালিবে ইলমদের বা অন্য কারো জুতা বহন করা তাদের কাছে অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রম কিছু মনে হয় না যে, আমি আমার ছাত্রদের জুতা বহন করছি। বরং তাও তাদের অন্যান্য কাজের মতই স্বাভাবিক মনে হয়।

সাইয়েদ সুলাইমান নদভীকে হযরত থানভী রহ.-এর নসীহত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর কাছে হযরত সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ. তাশরীফ আনলেন। পুরো হিন্দুস্তানে তখন যার ইলমের চর্চা চলছিল। সীরাতুন্নবী গ্রন্থের লেখক, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিকদের অন্যতম এবং রাজনৈতিকভাবেও তখন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব তিনি। হযরত সাইয়েদ সুলাইমান নাদভী রহ.-এর নিজের বিবরণ। 'আমি যখন হযরত থানভী রহ.-এর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি তখন আরয করলাম, হযরত! আমাকে কিছু নসীহত করে দিন। হযরত থানভী রহ. বলেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, ইয়া আল্লাহ! এত বড় আলেম আমাকে বলছেন নসীহত করে দিন! হে আল্লাহ! তুমি এমন কথা আমার অন্তরে ঢেলে দাও, যা তার উপকারে আসে। তখন অনিচ্ছাকৃতভাবেই আমার অন্তরে একথা আসল যে, আমাদের এখানে তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি জিনিসই প্রধান, আর তাহল নিজেকে মিটিয়ে দেয়া। হযরত সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ. বলেন, একথা বলার সময়

হযরত থানভী রহ. আমার হাতে একটা ঝাকি মারলেন এবং এ ঝাকি আমার অন্তরে এমন আঘাত করল যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার কান্না কান্না ভাব হয়ে গেল।

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, এরপর হযরত সাইয়েদ সুলাইমান নাদভী সাহেব নিজেকে এমনভাবে মিটিয়ে দিলেন যে, অনেক কম মানুষের দৃষ্টিই এমন দৃষ্টান্ত দেখেছে। এত বড় আলেম নিজেকে এমনভাবে মিটিয়ে দিয়েছেন। যে, আমি একদিন হযরত সাইয়েদ সুলায়মান নদভীকে দেখেছি তিনি হযরত থানভী রহ.-এর মজলিসের বাইরে মানুষের জুতা ঠিক করছেন।

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, একবার আমি দেখেছি হযরত থানভী রহ. বসে রচনার কাজ করছেন। আর হযরত সুলায়মান নদভী রহ. দূরে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে দেখছেন, যেখানে থানভী রহ. তাকে দেখছেন না। আমি হঠাৎ করে তার পেছন গিয়ে বললাম, হযরত এখানে কি করছেন? কি দেখছেন? হঠাৎ আমার প্রশ্নে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না কিছু না, তারপর আমি যখন বার বার অনুরোধ করলাম তখন বললেন, আমি দেখছিলাম যে, সারা জীবন যেগুলোকে ইলম মনে করেছি সেগুলো এখন দেখি সবই জাহালত ও মূর্খতা। আসল ইলম তো এই বড় মিয়ার কাছে। এরপর আল্লাহ হযরত সাইয়েদ সুলায়মান নদভীকে এমন মর্যাদা ও মাকাম দান করলেন যে, তার ব্যাপারে স্বয়ং তার শায়খ হযরত থানভী রহ. বলছেন–

از سلیماں گیر اخلاص عمل ☆ داں تو ندوی را منزہ از دغل

অর্থাৎ, সুলায়মানের কাছ থেকে তোমরা আমলের ইখলাস শিখ, নদভীকে তোমরা আত্মিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র মনে কর।

হযরত থানভী রহ. সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রহ.-কে উদ্দেশ্য করে এই কবিতা বলেছিলেন, যা হোক! সারকথা হল, কিছু হতে হলে নিজেকে মিটিয়ে দিতে হবে। তাহলেই কিছু হওয়া সম্ভব।

সূচীপত্র

مٹادے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہئے

کہ دانہ خاک میں ملکر گل گلزار بنتا ہے

যদি মর্যাদা চাও তবে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দাও, একটি শষ্য নিজকে মাটির সঙ্গে বিলীন করেই তবে ফুলবাগানে পরিণত হয়।

কারো দুয়ারে গিয়ে মাড়াই ও মর্দন খাওয়া ছাড়া এ জিনিস অর্জিত হয় না। এজন্যই বলা হয়, কোন শায়খের তত্ত্বাবধানে একাজ করতে হবে।

হযরত মুফতীয়ে আযম রহ. এর তাওয়াযু

আমাদের শায়খ ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. এর চেম্বার প্রথমে করাচীর রাবেস রোডে ছিল। তখন আমার আব্বাজান মুফতীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এর বাড়িও চেম্বার থেকে সামান্য দূরে একই এলাকায় ছিল। হযরত ডা. আরেফী সাহেব রহ. বলেন, আমি একদিন চেম্বারে বসাছিলাম। আমার কাছে আরো কিছু লোক বসাছিলো। (তার কাছে যেমন শারিরীক রোগের রোগী আসত, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক রোগের রোগীও আসত)। আমি দেখলাম, মুফতী সাহেব আমাদের সামনে দিয়ে একটি দুধের হাঁড়ী নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। আমি চিন্তা করলাম, হায় আল্লাহ! ইনি হলেন মুফতীয়ে আযম আর ইনি এভাবে একটা হাঁড়ী নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আরো যারা চেম্বারে ছিল আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম এই যে মানুষটি হাঁড়ী হাতে করে যাচ্ছেন, তিনি কে জান? তারা বলল, না! জানি না। আমি বললাম ইনি হলেন পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম। দেখুন হাতে দুধের পাত্র নিয়ে তিনি এমনভাবে যাচ্ছেন যেমন একজন সাধারন মানুষ যায়।

তার কখনো বড়ত্বের কল্পনাও আসেনি

আল্লাহতায়ালা মুহতারাম আব্বাজানকে তাওয়াযুর এমন উঁচু মাকাম দান করেছিলেন যে, সত্য কথা হল এমন বিনয়ী মানুষ আমি আর দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। একটা পর্যায় আছে যখন মানুষ ইচ্ছা করে করে বিনয় অবলম্বন করে। কিন্তু তার বিনয় একদম স্বাভাবিক ছিলো, যা এমনিই হতো, ইচ্ছা

ফর্মা নং-১৭

করে অবলম্বন করতে হতনা। কারণ তার মনে একথা বদ্ধমূল ছিল যে, আমি তো কিছুই না, আমি তো আল্লাহর তুচ্ছ এক বান্দা মাত্র। নিজের বড় হওয়ার কথা কখনো তার কল্পনায়ও আসেনি। এজন্য খুব সাধারণ থেকে সাধারণ কাজ করতেও তিনি কোন দ্বিধার সম্মুখীন হতেন না। আমি নিজে দেখেছি তিনি পাগড়ীতে করে বাজার থেকে আলু কিনে নিয়ে আসছেন।

হযরত মুফতীয়ে আযমকে হযরত মাদানী রহ.-এর নসীহত

দেওবন্দেও একদিন তিনি এভাবে হাঁড়ী নিয়ে দুধ আনতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহ. দেখে ফেলেন। পরদিন যখন তিনি দারুল উলূমে গেলেন তখন মাদানী রহ. তাকে বললেন, দেখুন ভাই মৌলভী শফী! আল্লাহ তোমাকে তাওয়াযুর অনেক উচু মাকাম দান করেছেন। তবে এত বেশি তাওয়াযু করো না। কারণ এখন তুমি দারুল উলূমের মুফতী হয়ে গেছ। আর এ ধরণের কাজে অনেক সময় সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ওজন কমে যায়। এজন্য এত তাওয়াযু না করা চাই। কিন্তু আবাবাজান মনে করতেন, আমি তো কিছুই না। আমি আবার কি খেয়াল করব যে, কোন কাজ করব আর কোন কাজ করব না।

মাঝে-মধ্যে খালি পায়ে চলা-ফেরা কর

আমাদের শায়খ হযরত আরেফী রহ. বলতেন– মাঝে মধ্যে খালি পায়ে চলা-ফেরা কর এবং অন্যের জুতা সোজা কর। হযরত থানভী রহ. 'আরওয়াহে ছালাছা' নামক পুস্তিকায় লিখেছেন , হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. যখন দেখতেন কোন তালিবে ইলমের মধ্যে তাকাব্বুর আছে এবং চিকিৎসা করা জরুরী তখন তাকে তিনি আদেশ করতেন তুমি দৈনিক পাঠকক্ষের সামনে ছাত্রদের জুতা ঠিক করে রাখবে। আর যখন অন্য কোন তালিবে ইলমকে দেখতেন তার মধ্যে বিণয় আছে তখন তার জুতা নিজে ঠিক করে দিতেন।

হীন কাজও শায়খের নির্দেশেই করতে হবে

এই যে, বলা হয় এই পথে হীন ও তুচ্ছ কাজ করতে হয় তাও কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে করা যাবে না, কারণ নিজের সিদ্ধান্তে করলে অনেক সময় তাকাব্বুর পয়দা হয় দেমাক বৃদ্ধি পায়। তাই একাজ শায়খের তত্ত্বাবধানে করা জরুরী। শায়খ বললে করবে অন্যথায় করবে না।

এক ব্যক্তি কোন কিতাবে পড়েছে যে মানুষের জুতা ঠিক করার দ্বারা তাকাব্বুর দূর হয়। ফলে সে মুহতারাম আব্বাজানের মজলিসে এসে মানুষের জুতা ঠিক করতে আরম্ভ করল। আব্বাজান তাকে নিষেধ করলেন যে, একাজ করো না। তারপর তিনি নিষেধ করার কারণ বর্ণনা করলেন, তার অবস্থা এমন যে, সে যদি জুতা ঠিক করতে থাকে তাহলে তার মধ্যে তাকাব্বুর আরো বেড়ে যাবে। সে মনে করবে, দেখ! আমার মাধ্যে কত তাওয়াযু আমি মানুষের জুতা ঠিক করি। এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন, এই কাজ– কারো তত্ত্বাবধানে করতে হয়।

অহংকার ও শোকরের পার্থক্য

হযরত থানভী রহ. বলেন–

নেয়ামতের উপর অহংকার করা কিবির। আর নেয়ামতকে আল্লাহর দান মনে করে নিজের অযোগ্যতাকে স্মরণে রাখা হল শোকর। যেমন আগেও একথা বলেছি যে, তাকাব্বুরের উত্তমতর চিকিৎসা হল, বেশি বেশি শোকর আদায় করা। অর্থাৎ, আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা। একথাটিই হযরত থানভী রহ. উপরোক্ত বাক্যে বলেছেন যে, নেয়ামত প্রাপ্তির উপর গর্ব করা, নেয়ামতের কারণে নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে ছোট মনে করা হল অহংকার। আর এমন মনে করা যে, আমি তো এই নেয়ামতের যোগ্য ছিলাম না, আল্লাহ একমাত্র তার দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে তা দান করেছেন। একথা স্মরণ করা হল শোকর এবং এই শোকরই তাকাব্বুরের চিকিৎসা।

এটা নেয়ামতের প্রকাশ

একেই বলে 'তাহদীসে নেয়ামত' তথা নেয়ামতের প্রকাশ। অর্থাৎ, এভাবে আল্লাহর নেয়ামতের উল্লেখ করা যে, আল্লাহই আমাকে এ নেয়ামত

দান করেছেন এটা কিবির নয়, বরং এটি ইবাদতও বটে। আর নিজের বড়ত্বের কথা বলে নিজের কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করাই হল অহংকার, যা অনেক বড় গোনাহ।

মানুষের অভ্যন্তরে এই গোনাহ খুবই সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে। এর সীমারেখা খুবই অস্পষ্ট এবং বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সীমারোখার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। একদিকে অহংকার অপর দিকে 'তাহদীসে নেয়ামত'। যদি কেউ 'তাহদীসে নেয়ামত' তথা আল্লাহর নেয়ামত ও তাঁর দান হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিজের কোন গুণের আলোচনা করে তাহলে এটা হবে ইবাদত। পক্ষান্তরে কেউ নিজের বড়ত্বের কথা চিন্তা করে যদি নিজের কোন গুণের কথা আলোচনা করে তাহলে এটা কিবির যা কবীরা গোনাহ্। তবে এটির সীমারেখা নির্নয় করা যে, এটা কিবির? না 'তাহদীসে নেয়ামত'? যার তার সাধ্য নয়।

তাহদীসে নেয়ামতের হুকুম

'তাহদীসে নেয়ামত' এমন বিষয় যার নির্দেশ আল্লাহপাক কুরআনে কারীমে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিচ্ছেন–

وَاَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থাৎ, আপনার উপর আপনার প্রভুর যে নেয়ামত এসেছে সেগুলো মানুষের কাছে বয়ান করুন। আপনি বলুন! আমাকে আল্লাহ এই নেয়ামত দান করেছেন। এই তাহদীসে নেয়ামতের জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কথা বলেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন-

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَافَخْرَعَلَيْهِ

আমি আদম সন্তানের সর্দার। তবে এর উপর আমার কোন অহংকার নেই।

আমি আদম সন্তানের সর্দার। আমার একথা তাহদীসে নেয়ামত। আল্লাহ আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন যে, আমাকে তিনি সকল আদম সন্তানের

সরদার বানিয়েছেন। কিন্তু এই 'তাহ্দীসে নেয়ামত' আবার কিবির পর্যন্ত পৌঁছে না যায়, এজন্য সঙ্গে সঙ্গেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলে দিয়েছেন "وَلاَ فَخْرَ" অর্থাৎ আমি একথা অহংকারবশত বলছি না, যাতে অন্যের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হয়। দেখুন এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তাহ্দীসে নেয়ামতের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতের আলোচনা করছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ আশংকাও করছেন যে, এখানে আবার যেন সীমা লজ্ঘণ না হয়ে যায়। তাই সঙ্গে সঙ্গেই একথা ও সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছেন যে, وَلاَ فَخْرَ এটা আমার অহংকার নয়।

তাহ্দীসে নেয়ামতের আলামত

তাহ্দীসে নেয়ামতের একটি আলামত আছে। তা হল তাহ্দীসে নেয়ামতের পর মাথা আরো নত হয়ে আসে এবং তাওয়াযু পয়দা হয়। আল্লাহর দরবারে আরো দৈন্যতা, হীনতা ও অক্ষমতার অনুভূতি জাগে। কারণ বান্দা এতে আল্লাহর সামনে একথার স্বীকারোক্তি দেয়, হে আল্লাহ! আমি এই নেয়ামতের যোগ্য ছিলাম না। আমি এই নেয়ামত অর্জনে অক্ষম ছিলাম। কিন্তু আপনি একমাত্র নিজ দয়ায় তা আমাকে দান করেছেন। একথার স্মরণ ও স্বীকারোক্তিতে আরো বিনয় সৃষ্টি হয়।

মক্কা বিজয়কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

মক্কা বিজয়ের সময় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী হয়ে মক্কায় প্রবেশ করছেন এবং সেই শহরে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করছেন যে শহরের লোকেরা তাকে হিজরত তথা নিজ জন্মভূমি ছেড়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছিল। যেই শহরের লোকেরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। যেই শহরের লোকেরা তাঁর চলার পথে কাটা বিছিয়ে ছিল। যেখানের লোকেরা তার প্রতি নাপাক গলিজ পদার্থ ছুড়ে মেরেছিল। যারা তার উপর পাথর বর্ষণ করেছিল। মাত্র আট বছরের ব্যাবধানে সেই শহরবাসীর উপর বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই বিজয়ী হলে আজ তার বুক টান টান থাকত মাথা উঁচু থাকত কিন্তু এই মহাবিজয়ী মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে মাথা নিচু করে প্রবেশ করলেন যেন তার থুতনি বুকে লেগে যাবে। চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, আর মুখে কুরআনের এই আয়াত উচ্চারিত হচ্ছে–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। আপনার উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করে দেন এবং আপনাকে সোজা পথ পদর্শন করেন।

(সূরা ফাতাহ-১-২)

এটা হল 'তাহদীসে নেয়ামত' বা নেয়ামতের বহি:প্রকাশ। কারণ যবানে

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

(নিঃসন্দেহ আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি)

তেলাওয়াত করে তিনি আল্লাহর নেয়ামতের আলোচনা করছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এ বিজয় দান করেছেন। আর এই নেয়ামতের কথা স্মরণ করার ফলে নিজের মধ্যে বিনয় নিজের অক্ষমতা দৈন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহর প্রতি আরো বেশি মনোনিবেশ হচ্ছে। এগুলোই তাহদীসে নেয়ামতের আলামত।

তাকাব্বুরের আলামত

পক্ষান্তরে নিজের বড়ত্ব ও তাকাব্বুরের আলামত হল নিজের কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের আলোচনার দ্বারা মাথা উঁচু হয়ে আসে এবং বুক টান টান হয়ে যায়। নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে হয় এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে হয়, তার সাথে তাচ্ছিল্যের আচরণ হয় কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই হয় যে, সে মনে মনে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করে।

এখন এই তাকাব্বুর আর তাহদীসে নেয়ামতের মাঝে সীমা নির্ণয় করা যে, কোথায়, তাহদীসে নেয়ামতের সীমা শেষ হয়ে তাকাব্বুর শুরু হয়ে

গেল, এটা সহজ কথা নয়। এখানে এসেই শায়খের প্রয়োজন দেখা দেয়। যিনি বলে দিবেন যে, তুমি যেটাকে 'তাহদীসে নেয়ামত' মনে করছ এটা 'তাহদীসে নেয়ামত' নয় এটা তাকাব্বুর। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তুমি এটাকে 'তাহদীসে নেয়ামত' বলে মনে করছ।

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

যাঁদের আল্লাহ্ তায়ালা নিজের নফসের নেগরানী করার তাওফীক দান করেন তারা পদে পদে নফসের হিসাব নেন। কোথায়ও যাতে নফস পদস্খলিত হয়ে না যায়। আমি আমার শায়খ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর কাছে হযরত থানভী রহ.-এর এই ঘটনা শুনেছি যে, একবার হযরত থানভী রহ. কোন মসজিদ ওয়াজ করছিলেন। অনেক মানুষ ওয়াজ শুনছেন। খুব খোলা মনে ওয়াজ করছিলেন। যেন উলূম ও মাআরিফের দরিয়া প্রবাহিত হচ্ছিল। ওয়াজের মাঝে হযরতের মনে কি যেন আসল। বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে বিশেষ একটি কথা বলব। আর আমি 'তাহদীসে নেয়ামত' হিসাবে বলব যে, এই কথা আপনারা আমার কাছেই শুনবেন অন্য কারো কাছে শোনবেন না। এখনো একথা বলে শেষ করেননি। এর মধ্যেই মাথা নত করলেন এবং বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি এটা কি বললাম। এবং এটাকে আমি 'তাহদীসে নেয়ামত' নাম দিয়ে দিলাম?! অথচ এটাতো নিজের বড়ত্বের প্রকাশ হল যে, একথা আমার কাছেই শুনতে পাবেন অন্যের কাছে পাবেন না। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।

আসলে এই কাজ একমাত্র সেই করতে পারে যার অন্তরে এই মিটার লাগানো আছে, যে মিটার মেপে চলেছে যে, কোন কথাটি আমার সীমার ভিতরে আছে আর কোন কথাটি সীমালঙ্ঘন করে চলেছে। এজন্য এত বড় মানুষ এত বড় বুযুর্গ ও মুহাক্কিক একথা বলছেন যে, আমি 'তাহদীসে নেয়ামত' তো বলেছি, কিন্তু বাস্তবে তা তাকাব্বুর হয়ে গেছে। তাহলে বুঝুন! আপনার আমার হিসাব কোন কাতারে হবে? না জানি আমরা কত অসংখ্যবার 'তাহদীসে নেয়ামত' বলে নিজের গুণ বয়ান করছি কিন্তু বাস্তবে তা তাকাব্বুর ও অহংকারের শামিল হচ্ছে।

নেয়ামত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ বৃদ্ধি

এজন্য তাহ্দীসে নেয়ামতের আলামত রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। তাহ্দীসে নেয়ামতের ফলে আমার মধ্যে বিনয় আসছে, কি আসছে না? । আল্লাহ্র প্রতি আমার একাগ্রতা ও মনোনিবেশ বাড়ছে, কি বাড়ছে না? যদি এগুলো হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা তাহ্দীসে নেয়ামত। আর একজন মুমিনের নিদর্শনই হল তাকে যতই নেয়ামত দান করা হয় ততই তার শির আল্লাহ্র সামনে সেজদাবনত হয়ে আসে। নিজের হীনতা ও দৈন্যতা তার কাছে ততই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, নিজের অক্ষমতা অপরাগতা ও বন্দেগীর অনুভব-অনুভূতি বেড়েই চলে। তাই আল্লাহ্ তাকে যে নেয়ামতই দান করে সে বলে উঠে, হে আল্লাহ! আমি তো এই নেয়ামতের যোগ্য ছিলাম না। আপনিই তো তা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে দান করেছেন। ফলে নেয়ামত যত বৃদ্ধি হতে থাকে আল্লাহ্র প্রতি তার মনোনিবেশও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হযরত সোলায়মান আ.-এর শোকর

হযরত দাউদ আ. কে এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত সোলায়মান আ. কে আল্লাহ্ অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। হযরত সোলায়মান আ. কে আল্লাহ্ এমন রাজত্ব দান করেছিলেন যা মানবেতিহাসে তার আগেও কেউ পায়নি এবং পরেও কারো ভাগ্যে জোটেনি। তার রাজত্ব ছিল মানুষের উপর, জিনের উপর, পশু পাখির উপর, পরিবেশের উপর এবং আগুন পানি ও বাতাসের উপর। এসব নেয়ামত দান করে আল্লাহ্ বলেছিলেন–

اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

হে দাউদ বংশের লোকেরা! তোমরা শোকরানা স্বরূপ নেক কাজ কর। তবে আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুজার বান্দার সখ্যা খুবই কম।

(সূরা সাবা-৩)

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত দাউদ আ. এটা ঠিক করে রেখেছিলেন যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটি মুহূর্তও যেন এমন অতিবাহিত না হয় যে সময় তার ঘরে কেউ না কেউ আল্লাহ্র যিকির ও শোকরে মশগুল না থাকে। এ জন্য তিনি চব্বিশ ঘন্টা সময়কে ঘরের সকলের উপর ভাগ করে দিয়েছিলেন

যে, এসময় থেকে এসময় পর্যন্ত অমুক– আল্লাহর যিকির ও শোকরে মগ্ন থাকবে। এসময় থেকে এসময় পর্যন্ত অমুক– আল্লাহর যিকির ও শোকরে মগ্ন থাকবে। দেখুন যতই আল্লাহ তাকে নেয়ামত দান করছেন ততই তাঁর আল্লাহর শোকর ও তাঁর প্রতি মনোনিবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি দোয়া করছেন–

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ أَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

(النمل ۱۹٠)

হে প্রভু! আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার শোকরিয়ায় আমাকে সার্বক্ষণিকভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আর আমাকে তাওফীক দান করুন, এমন নেক কাজ করার যার উপর আপনি খুশি হবেন। আমাকে আপনি দয়া করে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। (সূরা: নামল-১৯)

সুতরাং একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল যতই নেয়ামত দান করা হবে ততই সে বিনয়ী হবে। তার মধ্যে নিজের দৈন্যতা ও অক্ষমতার অনুভূতি জাগবে এবং আল্লাহর প্রতি বেশি মনোযোগী হবে।

দুষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য

পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকদের স্বভাব হল, তাকে যতই নেয়ামত দেয়া হবে ততই তার দম্ভ অহংকার ও ফেরাউনী স্বভাব বৃদ্ধি পাবে। আরব কবি মুতানাব্বী কোন কোন সময় কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেন। এক কবিতায় তিনি বলেন–

إِذَا أَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلَكْتَهٗ + وَإِنْ اَنْتَ اَكْرَمْتَ اللَّئِيْمَ تَمَرَّدَا

অর্থাৎ, একজন ভদ্র মানুষকে তুমি যদি সম্মান কর, তার সঙ্গে ভাল আচরণ কর, তাহলে তুমি তার মালিক হয়ে যাবে, আর সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে। কারণ সে তোমার সদাচারের কথা ভুলবে না বরং তার উত্তম প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি একজন দুষ্ট ও নীচু লোকের সম্মান কর তাহলে তার দৃষ্টতা ও অসাধুতা আরো বেড়ে যাবে। সে যেই সম্মানের উপযুক্ত ছিল না তুমি তাকে সেই সম্মান করেছ, এটাকে সে

সুযোগ মনে করবে। এতে তার দেমাক চরে যাবে এবং দম্ভ ও অহংকার বেড়ে যাবে।

এই একই অবস্থা প্রতিটি মানুষের যদি সে নেয়ামত পেতে থাকে এবং এ নেয়ামতের কারণে আল্লাহর সামনে তার মাথা নত হতে থাকে, তাহলে এটা এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, এই বান্দা শোকরগুজার। এখন যদি সে আল্লাহর কোন নেয়ামতের প্রকাশ করে বলে– আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে এই ভয় থাকে যে, না আবার এটা আমার তাকাব্বুর হয়ে গেল কি না? তাহলে বুঝা যাবে এটা তাহ্দীসে নেয়ামতের অন্তর্ভূক্ত। আর নেয়ামত পেয়ে যদি সে মাথা উঁচু করে বলে যে, আমি এমন, আমি এই করেছি, আমি সেই করেছি, তাহলে সে এটাকে যতই 'তাহদীসে নেয়ামত' বলে দাবী করুক না কেন? বাস্তবে এটা অবশ্যই তাকাব্বুর। কখনো 'তাহদীসে নেয়ামত' নয়।

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

এটা তো হল তাহদীসে নেয়ামতের আলামত মাত্র। তবে মানুষ এই আলামত নিজের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারে না এবং এর দ্বারা কোন কিছু যথাযথভাবে শনাক্ত করতে পারে না। এজন্য শায়খের প্রয়োজন দেখা দেয়।

তাই কখনো কোন নেয়ামতের আলোচনা করলে নিজের শায়খকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে যে, আমি অমুক সময় অমুক পরিস্থিতিতে এই নেয়ামতের আলোচনা করেছি, আমার এটা ঠিক হয়েছে কি না? না সীমা লঙ্ঘণ হয়েছে। তখন শায়খ বলে দিবেন, এ পর্যন্ত ঠিক ছিল, বা এ পর্যন্ত ঠিক ছিল না। এভাবে যখন বার বার শায়খকে জানাবে এবং শায়খ দিক নির্দেশনা দিবেন, তখন ধীরে ধীরে নিজের মধ্যেও একটা অনুমান ও যোগ্যতা সৃষ্টি হতে থাকবে, যার দ্বারা এক সময় সে নিজেই অনুভব করতে পারবে যে, আমার পদক্ষেপ কতটুকু ঠিক হচ্ছে আর কতটুকু ভুল হচ্ছে। এবং কোনটা তাকাব্বুর আর কোনটা 'তাহদীসে নেয়ামত'। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার এবং এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ষোলতম মজলিস

গোনাহ্গারকে তুচ্ছ মনে করবেন না

গোনাহগারকে তুচ্ছ মনে করবেন না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

গোনাহগারকে তুচ্ছ মনে করবেন না

হযরত থানভী রহ. বলেন–

> যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বা গোনাহ করে তার উপর তুমি রাগ করতে পার বা অসন্তুষ্ট হতে পার। এটা জায়েয। তবে কখনো তাকে তোমার নিজের চেয়ে খারাপ মনে করবে না। কখনো যদি কাউকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয় তবে সাবধান! কখনো নিজেকে তার চেয়ে উত্তম মনে করবে না। কারণ হতে পারে সে গোনাহগার আল্লাহর কাছে রাজপুত্রের মর্যাদা রাখে আর তুমি চাকর-জল্লাদের মর্যাদা রাখ। এটা খুব স্বাভাবিক কথা যে, রাজা জল্লাদের হাতে রাজপুত্রের শাস্তি দিলেও জল্লাদ কখনো রাজপুত্রের চেয়ে মর্যাদাবান হতে পারে না। (আনফাসে ঈসা-১৫৫)

অর্থাৎ , কোন মানুষ হয়তো কোন খারাপ কাজ বা গোনাহের কাজে লিপ্ত। এক্ষেত্রে তার উপর রাগ করতে পার অসন্তুষ্ট হতে পার এবং তার কাজকে ঘৃণা করতে পার। কারণ তার একাজ ঘৃণাযোগ্য। তবে তাকে নিজের চেয়ে খারাপ বা অনুত্তম মনে করো না। অর্থাৎ, একদিকে তার খারাপ কাজকে খারাপ মনে করতে হবে, আবার অপর দিকে তাকে নিজের চেয়ে খারাপ বা অনুত্তম মনে করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হল, এ বিপরীত মুখী দু'টি বিষয় কীভাবে একত্র হতে পারে?

পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়

বিষয়টিকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, পাপাচারকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়। অর্থাৎ, পাপীর সত্ত্বাকে ঘৃণা করো না বরং তার পাপ কাজকে ঘৃণা কর। কুফুরকে ঘৃণা কর কাফেরের মানব সত্ত্বাকে নয়। পাপীকে মনে কর সে একজন রোগী। কারো যখন কোন রোগ হয়, তখন কি মানুষ রোগীকে ঘৃণা করে? কখনো নয়। বরং মানুষ রোগকে ঘৃণা করে। আহা! তার এমন খারাপ রোগ হয়ে গেল। আর রোগীর প্রতি মানুষ করুণা করে। আহা! বেচারার এমন খারাপ রোগ হয়ে গেল। এমনিভাবে কেউ যদি কোন খারাপ কাজে বা গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার কাজকে ঘৃণা কর তাকে ঘৃণা করো না এবং তার উপর করুণা কর।

গোনাহগার করুণার যোগ্য

আমার শশুর (জনাব শরাফত) সাহেব (আল্লাহ তাকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখুন। আমীন।) যখন তিনি এমন কোন লোকের আলোচনা করতেন যে লোক কোন খারাপ কাজ বা গোনাহে লিপ্ত, তখন বলতেন, অমুক বেচারা বেদআতে লিপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তার জন্য 'বেচারা' (অসহায়) শব্দ ব্যবহার করতেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তি করুণার যোগ্য। কারণ সে অসুস্থ। তাই তার খারাপ কাজ ঘৃণ্য আর তার ব্যক্তি ও সত্ত্বা করুণাযোগ্য। সুতরাং সে যখন করুণার পাত্র, ঘৃণার পাত্র নয় তাই তাকে নিজের চেয়ে খারাপ মনে করার কোন সুযোগ নেই। বিশেষত এই দৃষ্টিকোন থেকে যে হতে পারে, আল্লাহ তাকে এই গোনাহ থেকে মুক্ত হয়ে তাওবা করার সুযোগ দিবেন, ফলে সে কোথায় থেকে কোথায় পৌছে যাবে, আর আমি অভাগা এখানেই পড়ে থাকব। এজন্য কাউকে নিজের চেয়ে খারাপ মনে করো না।

শয়তান কীভাবে পথহারা করে?

যাদেরকে আল্লাহ দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখেন, যেমন আমাদেরকে রেখেছেন, এটা আল্লাহ আমাদের কোন প্রার্থনা, যোগ্যতা ও অধিকার ছাড়াই

আলহামদু লিল্লাহ্ এমন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে-সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন, যারা দীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। কিন্তু দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই মানুষগুলো যখন এমন কাউকে দেখে, যে দীনের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত, তখন অনেক সময় তাদেরকে দেখে তাদের ব্যক্তি ও সত্ত্বার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং নিজের ভালো হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। মনে হয় আমি তার চেয়ে ভাল। এখানেই শয়তান সুযোগ পায় এবং তার পথ রোধ করে। এজন্য একথা মনে রাখতে হবে যে, কখনো যেন কারো ব্যক্তি বা সত্ত্বার প্রতি ঘৃণা না জন্মায়। ঘৃণা যেন তার বদ আমলের উপর হয় এবং তার উপর করুণা হয়। সঙ্গে এটাও চিন্তা করতে হবে যে, হতে পারে একসময় আল্লাহ্ তাকে তাওবার তাওফীক দান করবেন আর সে আমার চেয়ে অনেক অগ্রসর হয়ে যাবে।

হযরত থানভী রহ. এর তারবিয়ত

হযরত থানভী রহ.-এর খানকায় এমন পীরাগীরী ছিল না যে, কেউ তারবিয়াত ও সংশোধনের জন্য আসল আর তাকে কিছু অযীফা দিয়ে বসিয়ে দেয়া হল, এবং সে বসে বসে এখন অযীফা আদায় করতে থাকল, যার ফলে তার নফস ভিতরে ভিতরে আরো ফুলে উঠল। বরং সেখানে যখন কেউ তারবিয়াতের জন্য আসত তখন তার বাস্তব তারবিয়াত করা হত। আর এ তারবিয়াতের জন্যই কখনো ধমক, কখনো রাগ কিংবা কখনো শাস্তির প্রয়োজন হত। এজন্য হযরত থানভী রহ. শক্ত মানুষ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর তার কাছে একদিকে যেমন বড় বড় আলেম ও বিজ্ঞজনেরা তারবিয়াতের জন্য আসতেন, অপরদিকে একেবারে গ্রাম্যমূর্খ শিক্ষা-দীক্ষাহীন সরল মানুষেরাও আসত। হযরত সকলের আখলাকী তারবিয়াত করতেন এবং পরস্পরের সামাজিক বিষয় ও লেন-দেনে নিয়ম বহির্ভূত কিছু হলে শাসন করতেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সঙ্গে তার মতো করেই আচরণ করতেন।

তুমি গরু হলে আমি কসাই

একবার এক গ্রাম্য লোক এসেছে। সে যখন নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ করল তখন তাকে বুঝালেন এবং শাসন করলেন। সে বলল, হযরত আমি

তো একটা গরু। উত্তরে হযরত বললেন, তুমি যদি গরু হও, তাহলে আমি কসাই। এভাবে সবার সাথে তার মতো করে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতেন এবং সকলকে তার উপযোগী পন্থায় তারবিয়াত করতেন।

একটি হাস্যকর ঘটনা

একবার হযরত থানভী রহ. হাউজে অজু করছিলেন। এমন সময় একগ্রাম্য লোক বড় একটা তরমুজ নিয়ে এল। এসে বলল, নাও! মৌলভী সাব তোমার জন্য এনেছি, কোথায় রাখব? হযরত অজু করা অবস্থায় বললেন, আমার মাথার উপর রাখ। লোকটি তরমুজটি নিয়ে ঠিকই হযরতের মাথার উপর রেখে দিল। মানুষ দৌড়ে এল, দেখ! কেমন বেয়াদবী করছে। হযরত থানভী রহ. বললেন, রাখো রাখো ভাই! দোষ আমারই কারণ আমিই তাকে বলেছিলাম। আমার মাথার উপর রাখ।

এবার বুঝুন কি কি ধরণের মানুষ হযরতের দরবারে আসত। তাই তাদের তারবিয়াতের জন্য অনেক সময় তিনি রাগও করতেন এবং বলতেন রাগ করা আমার দায়িত্ব। কারণ এটাই সততার দাবী। যদি রাগ না করি তাহলে আমানতের খেয়ানত হবে।

আমার দৃষ্টান্ত

কিন্তু হযরত থানভী রহ. একথা ও বলতেন যে, যখন আমি কারো উপর রাগ করি তখনও আলহামদু লিল্লাহ! আমার মাথায় একথা উপস্থিত থাকে যে, আমার দৃষ্টান্ত হল ঐ জল্লাদের মত যাকে রাদশাহ হুকুম করেছেন শাহজাদাকে দোররা মারার। আর জল্লাদ বাদশার হুকুমে শাহজাদাকে দোররা মারছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে জল্লাদ রাজপুত্রকে দোররা মারছে ঠিক সেই মুহূর্তেও সে নিজেকে শাহজাদা থেকে উত্তম মনে করতে পারে না। কারণ সে জানে যে, এ হল শাহজাদা আর আমি হলাম জল্লাদ। আর তাকে মারা হল বাদশাহর হুকুমের গোলামী মাত্র, আলহামদু লিল্লাহ! আমি যখন কাউকে ধমক দেই এবং কোন কাজের উপর কাউকে শাসন করি তখনো একথা আমার স্মরণে থাকে যে, এ হল শাহজাদা আর আমি হলাম জল্লাদ। আমি তার চেয়ে উত্তম নই।

শাসনের মুহূর্তে দোয়া করা

দ্বিতীয়ত, আমি যেই মুহূর্তে শাসন করি এবং পাকড়াও করি সেই মুহূর্তে অন্তরে এই দোয়া করতে থাকি যে, আল্লাহ্ আমাকে এভাবে ধরো না। আখেরাতে আমাকে এভাবে পাকড়াও করো না।

এবার দেখুন যে ব্যক্তি এই নিয়তে শাসন করে যে, খারাপ কাজ থেকে বারণ করা ও তার সংশোধন করা জরুরী এবং এ কাজের জন্য আমি আদিষ্ট, এমনিভাবে প্রত্যেক ধমকের সময়, প্রতিবারের শাসন ও রাগের সময় এ বিষয়গুলো স্মরণ রাখে, তাহলে তার রাগ ও শাসন সওয়াবের কাজ না হয়ে অন্য কিছু কি হতে পারে? যাই হোক এভাবেই এ দু'টি বিষয় একত্র হতে পারে যে, রাগ ও করছে তার খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টিও হচ্ছে কিন্তু তাকে নিজের চেয়ে অনুত্তম মনে করবে না। এবং নিজেকে তার চেয়ে উত্তম মনে করবে না। তবে এ বিষয়গুলো অনুশীলনের দ্বারা এবং নিজেকে অন্যের সামনে নিষ্পেষিত করার মাধ্যমেই একমাত্র আল্লাহ্র বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে অর্জিত হয়ে থাকে।

অহংকার ও সীমাতিরিক্ত তাওয়াযুর চিকিৎসা

হযরত থানভী রহ. বলেন–

'যারা দ্বীনের কাজ করে তাদের দু'টি রোগ সৃষ্টি হয়। এক অহংকার। দুই সীমাতিরিক্ত তাওয়াযু। অহংকার হল, কিছু অযীফা পরেই আত্মতুষ্টি ও আত্মহংকারে ভুগতে থাকা। এবং নামায পড়ে বেনামাযীদেরকে তুচ্ছ মনে করতে থাকা। এর চিকিৎসা হল, এই কথা বুঝার চেষ্টা করা যে এই তাকাব্বুরের কারণে অনেক বড় বড় আবেদের পদস্খলন ঘটেছে। তারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি। শয়তান ও বালআম বাউরের ঘটনা এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। সীমাতিরিক্ত তাওয়াযু হল, এমন তাওয়াযু করা যার ফলে নিজের নেক আমলের অবমূল্যায়ন হয়। যেমন এমন ভাবা যে আমি নামাযতো পড়ি কিন্তু তাতে খুশূ-খুযূ নেই। যিকির করি, কিন্তু তাতে নূর নেই। (সুতরাং আমার

এসব আমলের কোনই মূল্য নেই) এটা কেমন যেন আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করারই নামান্তর। এর চিকিৎসা হল, একথা ভাববে এবং বলবে হে আল্লাহ! আপনার শোকর আপনি আমাকে যিকির ও নামাযের তাওফীক দান করেছেন । না হয় আপনার বন্দেগী করার সাধ্য আমাদের কোথায়?

দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করা

এই বাণীতে হযরত দুটি বিপরীতমূখী রোগের আলোচনা করেছেন। যারা দীনের কাজ করে। শয়তান তাদেরকে দীন দ্বারাই প্রতারিত করে। শয়তানের প্রথম চেষ্টা তো থাকে, কোন মানুষ যেন দীনের কাজে লাগতেই না পারে। বরং সে যেন নফসের কামনা-বাসনা পুরণ করা ও গোনাহের কাজে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, দীনের কাজ করার কথা আর চিন্তায়ও না আসে। না নামাযের কথা, না রোযার কথা, না হজ্ব বা যাকাতের কথা। কোন কিছুর কথাই কোন ভাবেই যেন তার মনে না আসে। বরং সে শুধু গোনাহ আর নফসানিয়াতে মজে থাকে। তারপর যদি কোন মানুষ দীনের কাজে লেগেই যায় তাহলে সে চেষ্টা করে তার কাজগুলা বরবাদ করার। এবং এজন্য সে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। সেই পন্থাগুলোর মধ্য হতে দু'টি পন্থার কথা হযরত তার উপরোক্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।

অহংকারের মাধ্যমে প্রতারিত করা

প্রথম পন্থা হল, শয়তান মানুষের মনে অহংকার-আত্মগরিমার কুমন্ত্রণা দেয়। সে বলে, দেখ! তুমি তো অনেক উপরের মানুষ। তুমি কামেল হয়ে গেছ। তুমি তো অনেক খুশূ-খুযূ সহকারে নামায পড়। তুমি নামায ও জামাতের পাবন্দ হয়ে গেছ। দেখ কত মানুষ তো নামাযই পড়ে না। যাবতীয় পাপাচার ও অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থাকে। এই কুমন্ত্রার ফলে অন্তরে নিজের বড়ত্ব এবং অন্যের প্রতি তুচ্ছতা সৃষ্টি হয়।

কামারের দৃষ্টান্ত

আরবীতেএকটি প্রবাদ আছে–

صَلَّى الْحَائِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ

কামারের অবস্থা হল সে দুই রাকাত নামায পড়ল আর অহীর অপেক্ষায় বসে গেল।

আজ আমাদের অবস্থাও এমন হয়ে গেছে। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে যদি একটু ইবাদত করার সুযোগ হয় তাহলে বাস! দেমাগ চতুর্থ আসমানে পৌঁছে যায়। আমি অনেক বড় আবেদ-যাহেদ, মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়ে গেছি। এটাই হল কিবির। এর চিকিৎসার কথাই হযরত বলছেন যে,

> ‘এর চিকিৎসা হল, এই কথা চিন্তা করা যে তাকাব্বুরের কারণে অনেক বড় বড় আবেদের পরস্খলন হয়েছে ফলে তারা গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। শয়তান ও বালআম বাউরের ঘটনা এর জলন্ত দৃষ্টান্ত।’

অর্থাৎ, মানুষ এই চিন্তা করবে যে, যদি আমি তাকাব্বুরে লিপ্ত হয়ে যাই তাহলেতো আমার এই সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যেমনটি শয়তানের বেলায় ঘটেছে। কারণ শয়তান প্রথমে অনেক ইবাদত করত। এমনকি এর কারণে তার উপাধি হয়ে গিয়েছিল ‘তাউসুল মালাইকা’ (ফেরেশতাদের ময়ূর)। কিন্তু সেই ইবাদতের ফলে তার মাথায় তাকাব্বুর ও অহংকার ঢুকে পড়েছিল। যার কারণে আল্লাহপাক যখন তাকে হযরত আদম আ. কে সেজদা করার আদেশ করলেন, তখন সে অস্বীকার করে বসল। এবং এই যুক্তি পেশ করল যে, তাকে আপনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন আর আমাকে আগুন দিয়ে তৈরি করেছেন। সুতরাং আমি তার চেয়ে উত্তম। আমি কেন তাকে সেজদা করব? এই তাকাব্বুরের কারণে দরবারে এলাহী থেকে চিরদিনের জন্য শয়তান বিতাড়িত হল। নাউযুবিল্লাহ।

বালআম বাউরের ঘটনা

হযরত থানভী রহ. দ্বিতীয় উদাহরণ দিয়েছেন বালআম বাউরের। বালআম বাউর হযরত মূসা আ.-এর যমানার লোক ছিল। সেও অনেক বড় আবেদ ও যাহেদ ছিল। এবং 'মুস্তাজাবুদ দাওয়া' (যার দোয়া আল্লাহ্ সবসময় কবুল করেন) হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। সে যখন দোয়া করত, আল্লাহ্পাক তৎক্ষণাত তা কবুল করে নিতেন। এজন্য মানুষ তার কাছে এসে তাকে দিয়ে দোয়া করাত। আল্লাহ্ই তাকে এই মাকাম ও মর্যাদা দান করেছিলেন। সে বসবাস করত আমালেকা নামক এলাকায়। সেই এলাকার বাসিন্দারা যেহেতু কাফের ছিল এজন্য হযরত মূসা আ. তাদের উপর আক্রমন করার ইচ্ছা করলেন। যখন তারা জানতে পারল যে, মূসা আ. তাদের উপর আক্রমণ করবেন, তখন তারা বালআম বাউরের কাছে গিয়ে বলল, আপনি তো অনেক বড় আবেদ-যাহেদ আল্লাহ্ আপনার দোয়া কবুল করেন। তাই আপনি দোয়া করুন মূসা আ. যেন পরাজয় বরণ করে।

বালআম বাউর তাদের উত্তর দিল, না! আমি এ দোয়া করব না, কারণ তিনি আল্লাহ্র উচ্চস্তরের একজন নবী। আর তার সঙ্গে যেসব সৈন্য সামন্ত আছে তারা সবাই ঈমানদার। আমি তাদের বিরুদ্ধে পরাজয় বরণের দোয়া করতে পারব না। তারা তার একথা মানল না বরং বার বার অনুরোধ করলো। এক পর্যায়ে সে বলল, আচ্ছা আমি এস্তেখারা করে দেখি। তারপর সে এস্তেখারা করল এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার এস্তেখারায় উত্তর আসল মূসা আ. একজন নবী, তার বিরুদ্ধে তুমি কীভাবে বদদোয়া করবে? সে লোকদেরকে জানিয়ে দিল, আমি এস্তেখারা করেছি, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে বদদোয়া করতে নিষেধ করেছেন।

পরের দিন তারা আবার আসল। এবার তারা ঘুষ হিসেবে কিছু হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসল। এসে বলল, এই হাদিয়াগুলো রাখুন এবং দোয়া করে দিন। এখন তার উচিত ছিল পুণরায় সেই একই কথা বলে দেয়া, যা সে এস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পেয়েছিল। তাহলেই ঘটনা

শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এবার যেহেতু কিছু হাদিয়া-তোহফা পেয়েছে এজন্য আরেকবার এস্তেখারা করার কথা মাথায় আসল। এবার তাদেরকে বলল, আচ্ছা! আমি আরেকবার এস্তেখারা করে দেখি। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন এস্তেখারা করল এবার আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসল না। তবুও তাদেরকে নিষেধ করে দিল। না, বদ দোয়া করব না। তারা প্রশ্ন করল, আচ্ছা! আপনি যে দ্বিতীয়বার এস্তেখারা করলেন এর কি জবাব পেয়েছেন? সে বলল, এর কোন জবাব আসেনি। তখন তারা বলল, বাস তাহলে তো কাজ হয়ে গেছে। আল্লাহ যদি আপনাকে তা থেকে বিরত রাখার ইচ্ছা করতেন, তাহলে তো অবশ্যই নিষেধ করতেন। যখন নিষেধ করেননি বুঝা গেল আপনাকে অনুমতি দিচ্ছেন। লোকেরা এই অপব্যাখ্যা করল এবং বালআম বাউরও তা গ্রহণ করল অবেশেষ সে মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করল। নাউযুবিল্লাহ।

যেহেতু এই বদদোয়া ছিল একজন নবীর বিরুদ্ধে এই জন্য আল্লাহ তা কবুল করেননি। তারপর সে লোকদেরকে বললো, আমি তোমাদের কথায় তো বদ দোয়া করে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ এ দোয়া কবুল করেননি। কারণ আমি আগেই তা এস্তেখারা করে বুঝেছি। এরপর লোকেরা বলল, আপনি গোনাহ যা করার তা তো করেই ফেলেছেন। আর আপনার বদ দোয়াও কবুল হল না, এবার বলুন, আর কী উপায় আছে আমাদের? কারণ তাদেরকে যে কেন মূল্যে পরাস্ত করতেই হবে।

এখন সে চিন্তা-ভাবনা করে বলল, আমি এমন একটা কৌশল তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি যাতে মূসা আ. এর সৈন্যদল নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করবে। কৌশল হল, তোমরা তোমাদের যুবতী রূপসীদের সাজিয়ে প্রস্তুত করে তাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। কারণ তারা অনেকদিন হয় বাড়ি থেকে এসেছে। যুবতীরা যখন তাদের ভিতরে প্রবেশ করবে তখন নিশ্চয় কেউ না কেউ গোনাহে লিপ্ত হবে। আর গোনাহে লিপ্ত হলেই আল্লাহর আযাব আসবে। এভাবে তোমরা তাদেরকে ধ্বংস

করতে পার। পরামর্শ পেয়ে তারা এই কাজই করল। যুবতীদেরকে মূসা আ. এর সৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ফলে তারা কেউ কেউ যখন গোনাহে লিপ্ত হয়ে গেল। এমনকি এ ঘটনাও লেখা হয়েছে যে, আমালেকার রাজকন্যা বনী ইসরাঈলের কোন সরদারের নিকট পৌছে গেলে সে তাকে নিয়ে হযরত মূসা আ. এর কাছে গিয়ে বলল, এই রাজকন্যা কি আমার জন্য হারাম? হযরত মূসা আ. বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই হারাম। সে বলল, হারাম হলেও আজ আমি তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। এরপর সে তাকে নিয়ে গেল এবং অন্যায় কর্মে লিপ্ত হল। তারপর হযরত হারূন আ. এর সন্তানদের কেউ গিয়ে তাদের দুইজনকে বর্শা মেরে হত্যা করল। এই ঘটনার পর তাদের অন্যায়ের শাস্তি হিসাবে তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দিল। যেমন হাদীসে এসেছে–

اِنَّهٗ بَقِيَّةُ رِجْزٍ اُرْسِلَ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

এই যে মহামারী এ তো সেই আযাবের অবশিষ্টাংশ যা বণী ইসরাঈলদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

এসব কিছু ঘটেছিল বালআম বাউরের শলা-পরামর্শ ও অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে। কারণ সেই তাদেরকে এই অপকৌশল শিখিয়েছিল। চিন্তা করে দেখুন যেই বালআম বাউর এত বড় আবেদ ও আলেম এবং 'মুস্তাজাবুদ দাওয়া' ছিল কিন্তু তার অন্তর যখন সামান্য অন্য দিকে মোড় নিল তখন তার কি করুণ পরিনতি হল?। নিম্নোক্ত আয়াতে তার এই ঘটনা ও পরিণতির কথা আলোচিত হয়েছে–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ (اعراف ١٧٥)

অর্থঃ আর এদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শোনান যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ প্রদান করেছিলাম পরে সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের

হয়ে গেল। অতএব শয়তান তার পিছে লেগে গেলো, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তরভুক্ত হলো। আর যদি আমি ইচ্ছে করতাম তাহলে ঐ আয়াতসমূহের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করে দিতাম কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলো। এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগলো। ফলে তার অবস্থা (ঐ) কুকুরের মতো হলো। যদি তুমি তাকে আক্রমণ করো তাহলেও হাপাতে থাকে আর যদি (নিজ অবস্থায়) ছেড়ে দাও তবুও হাপাতে থাকে।

(সূরা : আরাফ-১৭৫)

যে কোন মুহূর্তে অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে

হযরত থানভী রহ. এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলছেন, বালআম বাউরের ঘটনা এর একটি দৃষ্টান্ত। অথচ সে কতবড় আলেম, আবেদ ও মুস্তাজাবুদ দাওয়া ছিল। মানুষ তার কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য দোআ চাইতো। কিন্তু অবেশেষে তার এই করুণ পরিণতি হল। দিল পরিবর্তন হতে সময় লাগে না। তবে আল্লাহতায়ালা অন্ধকারের দিকে কারো দিল এমনিতেই পরিবর্তন করে দেন না যে, একজন বসে আছে আর তার দিল পরিবর্তন হয়ে সে কাফের হয়ে গেল। বরং বান্দা নিজেই কিছু কর্মকাণ্ড এমন করে যার ফলে তার দিলে পরিবর্তন এসে যায়। সে নিজের ইবাদতের ব্যাপারে তাকাব্বুর ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে যায়। আর এই তাকাব্বুরের কারণেই অনেক বড় বড় আবেদকে পর্যন্ত পদস্খলিত করা হয়েছে।

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা

হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শারানী রহ. হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ব্যাপারে একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি অনেক বড় একজন আল্লাহর অলী ছিলেন। একবার তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, একটি আলো ঝলমলিয়ে উঠল এবং পুরো পরিবেশ আলোকিত হয়ে গেল। সেই আলো থেকে আওয়াজ আসছে–

‘হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার ইবাদতের হক আদায় করে

দিয়েছ। এ পর্যন্ত তুমি যা ইবাদত করেছ তা যথেষ্ট। আজ থেকে তোমার উপর নামায রোযা ফরয নয়। সব ইবাদতের দায়িত্ব তোমার উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হল।'

যেন স্বয়ং আল্লাহ্ এসে বলছেন, হে আব্দুল কাদের! তোমার ইবাদত এমনভাবে কবুল হয়েছে যে, তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য ইবাদতের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে দেয়া হল।

তিনি যখন এই আলো দেখলেন এবং এই আওয়াজ শোনলেন, তৎক্ষণাত উত্তর দিলেন–

হতভাগা কোথাকার! ভাগ এখান থেকে! আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ? যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবাদতের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়নি। এবং আমরণ তার উপর থেকে ইবাদতের বোঝা উঠিয়ে নেয়া হয়নি আর আমি আব্দুল কাদেরকে ইবাদত থেকে ছুটি দেয়া হবে। আমার উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব উঠিয়ে নেয়া হবে? কক্ষনো হতে পারে না আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছ?

দেখুন! শয়তান কত বড় আক্রমণ করেছে। এই মুহূর্তে যদি তার অন্তরে নিজের ইবাদতের প্রতি সামান্য অহংবোধ সৃষ্টি হয়ে যেত, তাহলেই কিন্তু পদস্খলন ঘটে যেত। যেসব লোক কাশফ ও কারামতের অপেক্ষা করে এবং তাতে আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত হয় তাদের ধ্বংস করার জন্য এ হাতিয়ার খুব মোক্ষম ছিল। কিন্তু তিনি তো ছিলেন শায়খ আব্দুল কাদের রহ.। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেললেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকেও তো ইবাদতের দায়িত্ব উঠিয়ে নেয়া হয়নি। তাহলে আমার উপর থেকে কী করে উঠিয়ে নেয়া হতে পারে?

শয়তানের দ্বিতীয় আক্রমণ

এর কিছুক্ষণ পর আবার একটি আলো ঝলমলিয়ে উঠল এবং তার থেকে আওয়াজ আসল–

‘হে আব্দুল কাদের! আজ তোমার ইলম তোমাকে রক্ষা করল। না হয় তোমার মত কত আবেদকে আমি এই আক্রমণে ধ্বংস করেছি তার কোন হিসাব নেই।’

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এবার বললেন–

‘বদমাশ কোথাকার। আমাকে আবার ধোঁকা দিচ্ছ। আমার ইলম আমাকে বাঁচায়নি। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ আমাকে বাঁচিয়েছে।’

এই দ্বিতীয় আক্রমণ ছিল প্রথমটার চেয়ে আরো কঠিন ও জঘণ্য। কারণ এর দ্বারা শয়তান তাঁর মধ্যে ইলমের অহংকার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয় আক্রমণের জঘন্যতা

হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলছেন, প্রথম আক্রমণটা এত মারাত্মক ছিল না। কারণ যার কাছে শরীয়তের সামান্য জ্ঞানও আছে সেও একথা বুঝতে পারবে যে জীবনে যতক্ষণ হুঁশ-জ্ঞান আছে ততক্ষণ কোন মানুষের উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব উঠিয়ে নেয়া হতে পারে না। কিন্তু এই দ্বিতীয় আক্রমণটা খুবই মারাত্মক। কত মানুষ না জানি এই আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়েছে। কারণ এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল নিজের ইলমের উপর অহংকার সৃষ্টি করা যা খুবই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়।

অন্তর থেকে অহংকার বের করে দাও

তাই হযরত থানভী রহ. বলছেন, এই অহংকারের চিকিৎসা হল, এই কথা চিন্তা করা যে, কত বড় বড় আলেম, আরেফ, মুত্তাকী ও ইবাদতগুজার যখন এই অহংকারে লিপ্ত হয়েছে তখন তাতে কতই না মন্দ পরিণতির শিকার হয়েছে, নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং অন্তর থেকে এই অহংকার বের করে দাও। যদি তুমি দীনের কাজে লেগে থাক তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, তুমি দুনিয়ার সবাইকে তুচ্ছ ভাবতে থাকবে, মনে করবে সবাই জাহান্নামী হয়ে গেছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যে বলবে দুনিয়ার সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে তাহলে বুঝা যাবে সেই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসে পতিত। যে ব্যক্তি নিজের দোষক্রটি দেখে না অন্য সবার দোষ খুঁজে বেড়ায়, সবাইকে তুচ্ছ মনে করে, আসলে সেই সবচেয়ে তুচ্ছ ও সবচেয়ে ধ্বংসে নিপতিত।

অংকারের চিকিৎসা– আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ

যখন মনে নিজের ইবাদত, ইলম, যুহ্দ ও সাদকা খায়রাতের খেয়াল আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করো এবং বল, হে আল্লাহ! আপনার তাওফীকেই আমি এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছি। এ জন্য আমি আপনার শোকর আদায় করছি। এ কাজ করা আমার সাধ্যে ছিল না। এভাবে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করেই শয়তানের অনিষ্ট থেকে পারিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এর পাশাপাশি নিজের যাবতীয় দোষ-ক্রটির কথাও স্মরণ কর। যখন এই দুটি বিষয়– অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ এবং নিজের দোষ-ক্রটির স্মরণ একত্র হবে তখন আর তা তাকাব্বুর সৃষ্টি হতে দিবে না।

সীমাতিরিক্ত তাওয়াযু

মোটকথা! হযরত থানভী রহ. একথা বলছেন যে, যারা দীনের কাজ করে তাদের মধ্যে একদিকে তাকাব্বুর পয়দা হয়ে যায়। আবার অন্যদিকে কোন সময় সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ, সীমাতিরিক্ত তাওয়াযু পয়দা হয়ে যায়। তাওয়াযু ভাল জিনিস তবে তাও সীমার মধ্যে থাকতে হবে। সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাও ক্ষতিকর হয়ে যায়।

সীমাতিরিক্ত তাওয়াযুর একটি ঘটনা

এ ব্যাপারে হযরত থানভী রহ. তার ওয়াজে নিজের দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি রেল গাড়ীতে করে সফর করছি। আমার কাছে আরো কিছু লোক বসা। যখন খাবারের সময় হল, তারা নিজেদের খাবার বের করল। দস্তরখান বিছাল। এবং সবাই মিলে খাওয়া

আরম্ভ করল। আমরা যেভাবে তাওয়াযুর সঙ্গে বলি, আসুন ভাই! আপনিও চারটা ডাল ভাত খেয়ে নিন, সেরকম তাদের একজন তার পাশে বসা লোককে তাওয়াযু করে বলছে, আসুন ভাই! আপনিও কিছু গু-মুত খেয়ে নিন। সে তাওয়াযুবশত নিজের খাবারকে গু-মুত বলছে। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহর নেয়ামতকে এভাবে তাওয়াযু করে গু-মুত বলা সীমাতিরিক্ত তাওয়াযু। কারণ তাওয়াযুর ফলে এমন করা যার দ্বারা আল্লাহর নেয়ামতের না শোকরী অবমান ও অবমূল্যায়ন হয় তা খুবই খারাপ কাজ। যা মূলত না শোকরীর নামান্তর, এ যেন তাকদীর এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর আপত্তি উত্থাপন। এজন্য এটা খুবই জঘণ্যতর বিষয়।

নিজের নামাযকে ঠোকর মারা বলো না

এই সীমাতিরিক্ত তাওয়াযু মানুষকে তার মধ্যে হাতাশা সৃষ্টি করে এবং তাকে নিরাশ্রয় করে দেয়। যেমন, আপনি এই বাক্যটি অনেকের মুখে শুনে থাকবেন যে, 'আরে ভাই আমার আবার নামায কিসের আমি তো ঠোকর মারি।' এভাবে নামাযকে ঠোকর মারা বলা সীমাতিরিক্ত তাওয়াযুর অন্তর্ভূক্ত। এমন করা ঠিক নয়। বরং এখানে আল্লাহর শোকর আদায় করা চাই যে, তিনি তাঁর দরবারে হাজিরা দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। কত মানুষ আছে যাদের আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার তাওফীকও হয় না। তুমি কেন এ নামাযের না শোকরী এবং অবমূল্যায়ন করছ? একথা ঠিক যে, তোমার নামাযে অনেক ভুল, অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু এ ভুল-ত্রুটি তো তোমার। সুতরাং প্রথমে তুমি তাঁর তাওফীকের শোকর আদায় কর তারপর তোমার ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহকে বল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নামায আদায়ের তাওফীক দান করেছেন কিন্তু আমি তার হক আদায় করতে পারিনি। আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এভাবে প্রথমে তাঁর তাওফীকের শোকর আদায় কর, তারপর নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এমন বলো না যে, আমার নামায তো হয় ঠোকর খাওয়া মাত্র। এমন বলা কিছুতেই ঠিক নয়।

ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ইস্তেগফার কর

যখন তুমি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ইস্তেগফার করবে তখন যিনি তোমাকে একাজের তাওফীক দান করেছেন তিনি তোমার ইস্তেগফার কবুল করে ঐ ইবাদতে পূর্ণতা দান করবেন– ইনশাআল্লাহ। এমন মানুষ কে আছে যে আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় করতে পারে? তোমার-আমার তো কোন কথাই নেই স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতভর তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যার পা ফুলে যাচ্ছে তিনি বলছেন–

مَاعَبَدْنَا حَقَّ عِبَادَتِكَ مَاعَرَفْنَا حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

আপনার ইবাদতের হকও আদায় করতে পারিনি আপনার যথাযথ মারেফাতও লাভ করতে পারিনি। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে একথা বলছেন, সেখানে আমরা কি করে তার ইবাদতের হক আদায় করব? তাঁর মহান সত্ত্বার দিকে তাকালে তো আমাদের ইবাদত ত্রুটিযুক্তই মনে হবে। কিন্তু তিনি যখন তাঁর দুয়ারে আসার এবং তার কুদরতি পায়ে সেজদা করার তাওফীক দান করেছেন তখন তার ব্যাপারে কেন এই ধারণা কর যে, তিনি এই সেজদা কবুল করবেন না। কিভাবে তুমি এর অবমূল্যায়ন করে বল, যে এটা অপবিত্র সেজদা? যখন তুমি তার এ তাওফীকের উপর শোকর আদায় করে ইস্তেগফার করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি অপরাধী, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি তুমি নিজ রহমতে ক্ষমা করে দাও, তাহলে অবশ্যই তিনি এ ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন– ইনশাআল্লাহ।

হযরত আরেফী রহ.-এর একটি ঘটনা

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর কাছে এসে যখন কেউ একথা বলত, আমি আর কি নামায পড়ি কিছু ঠোকর মারি আর কি! তখন তিনি একথায় খুবই ভয় পেতেন। একদিন এক লোক এসে বলল, হযরত! আমার আবার নামায কিসের! কিসের সেজদা! আমি যখন সেজদা করি তখন আমার মনে রিপু ও কামের বিভিন্ন অশ্লীল ও অপবিত্র চিন্তা-ভাবনা আসতে থাকে। আমার এই নামায তো কোনভাবেই আল্লাহর সামনে পেশ

করার মত নয়। একথা শুনে হযরত বললেন, আচ্ছা তোমার এ কামভাব ও রিপুর চিন্তা-ভাবনাওয়ালা সেজদা তো খুবই অপবিত্র তাই না? সে বলল, হ্যাঁ। অবশ্যই তা অপবিত্র সেজদা। এবার হযরত বললেন, আচ্ছা এই সেজদা যেহেতু অপবিত্র তাহলে আল্লাহর পরিবর্তে আমাকে তুমি এ সেজদা কর। কারণ এতো আল্লাহকে করার উপযোগী নয়। সে বলল, হযরত! এ আপনি কেমন কথা বলছেন। আমি আপনাকে সেজদা করব? হযরত বললেন, কেন? এটা যখন অপবিত্র সেজদা আল্লাহকে করার উপযুক্ত নয়, তাহলে আমাকে করতে অসুবিধা কোথায়? সে বলল, এটা হতে পারে না। এই সেজদা আমি অন্য কাউকে করতে পারি না। এবার হযরত বললেন, এই সেজদা যখন অন্য কোথায় করা যাবে না, তাহলে বোঝা গেল এই সেজদাও একমাত্র তার জন্যই। এই কপাল তাকে ছাড়া অন্য কারো দুয়ারে লাগতে পারে না, এই সেজদা অন্য কোথায়ও হতে পারে না, এই মাথা অন্য কোথায়ও নত হতে পারে না, এ সেজদা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনিই একমাত্র এই সেজদার হকদার ও উপযুক্ত।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইসলাহী মাজালিস

দ্বিতীয় খণ্ড

সতেরতম মজলিস

মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়

মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ،وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ- أَمَّابَعْدُ

আল্লাহর সাথে অহংকারের একটি রূপ

হযরত থানভী রহ. তাঁর একটি বাণীতে বলেছেন :

'অহংকার যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে এবং তার শিকড় মজবুত হয়ে যায়, তখন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সাথেও অহংকার করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: হয়ত সে খুব অনুনয়-বিনয়ের সাথে দু'আ করছিল, কান্নার আকৃতি বানিয়ে কাঁদছিল, হঠাৎ সামনে কোন ব্যক্তি এসে গেল; ফলে সে কান্নাকাটি ছেড়ে দিল। যাতে ঐ দর্শকের সামনে তার অসম্মান না হয়। এটা আল্লাহর সাথে অহংকার। কেননা সে অন্য মানুষের সামনে আল্লাহর জন্য অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতির আকৃতি বানাতেও অসম্মান বোধ করে। অতএব মাখলূকের জন্য কোন আমল বা ইবাদত ছেড়ে দেয়াটাই অহংকার।'

(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫৭)

মানুষ কিংবা মাখলূকের সাথে অহংকার তো নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর সাথে অহংকার করা নিকৃষ্টতম অহংকার। মনে করুন জনৈক ব্যক্তি দু'আর মধ্যে ক্রন্দন করে অথবা কান্নার ভান করে। বাস্তবিক পক্ষে এটা হল মহান আল্লাহর সামনে স্বীয় অক্ষমতার প্রকাশ। এটি একটি প্রশংসনীয় আমল। কিন্তু অন্য কারো সামনে এ আমল করতে গিয়ে যদি সে মনে করে যে. আমার অসম্মান হচ্ছে!! তাহলে এটার অর্থ এই দাঁড়াল যে,

সে মহান আল্লাহর সামনে নিজ অক্ষমতার প্রকাশকে অবমাননাকর মনে করছে! নাউযুবিল্লাহ। এটা হল ভয়াবহ পর্যায়ের অহংকার।

মাখলূকের জন্য আমল ছেড়ে দেয়া

উল্লেখিত বাণীটির শেষে হযরত থানভী রহ. এই মূলনীতি বয়ান করে দিয়েছেন যে, 'সুতরাং মাখলূকের জন্য কোন আমল বা ইবাদত বর্জন করাটাই অহংকার।

যেমনিভাবে মাখলূকের জন্য কোন আমল করলে সেটা 'রিয়া" বা প্রদর্শনীর মধ্যে গণ্য হয়। অর্থাৎ মাখলূকের খাতিরে এ জন্য আমল করে যে, মাখলূক আমাকে দেখে ইবাদতগুযার মনে করবে। এ আমলটি 'রিয়া' বরং এটা শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তেমনিভাবে মাখলূকের জন্য কোন আমল ছেড়ে দেয়াও জায়েয নেই। কারণ হয়ত এটা 'রিয়া' হবে, অথবা 'অহংকার' হবে।

আল্লাহর সাথে অহংকারের উদাহরণ

উদাহরণস্বরূপ: নামাযের সময় হয়ে গেল। আর আপনি ঐ সময়ে এমন স্থানে আছেন যেখানে নামাযের পরিবেশ নেই। এখন যদি সেখানে নামায আদায় করতে আপনি এ জন্য লজ্জা পান যে, লোকজন আমাকে নামায পড়তে দেখে না জানি কী মনে করবে? নাউযুবিল্লাহ। মাখলূকের জন্য এই আমল ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই। বর্তমানে এ জাতীয় অবস্থা খুব বেশি সামনে আসে। উদাহরণ স্বরূপ: যারা বিমানে সফর করেন, তারা মনে করে নিয়েছেন যে, বিমানে নামায মাফ!! আর নামায পরিত্যাগের কারণ শুধু এটাই যে, সবাই তো বসে আছে!! এখন যদি আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ি, তাহলে একটি বিশ্রী দৃশ্যের (?) অবতারণা হবে। নাউযুবিল্লাহ।

নামায তো মহান আল্লাহর দরবারে নিজ অক্ষমতা প্রকাশের একটি পদ্ধতি। এখন যে ব্যক্তি এ সময় নামায পরিত্যাগ করছে সে মাখলূকের সামনে এই অক্ষমতা প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। সে এটাকে অপমানজনক মনে করছে!! এটাই হল আল্লাহর সাথে অহংকারের রূপ।

এসব স্থানে নামায ছাড়বেন না

অমুসলিম দেশগুলোতে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। সেখানে এ দৃশ্যটি প্রায়ই দেখা যায় যে, যেখানে অমুসলিমদের আসা যাওয়া বেশি অথবা যেখানে অমুসলিমদের বসবাস বেশি, সেখানে অনেক মুসলমান নামায আদায় করতে সংকোচ বোধ করেন। এ জন্য সংকোচ বোধ করেন যে, যদি আমরা এখানে নামায পড়ি তবে আমরা তাদের সামনে তামাশার বস্তুতে পরিণত হব!! এখন এসব অমুসলিমদের কারণে নামায ছেড়ে দেয় যে, নামায আদায় করলে তারা আমাদের ব্যাপারে ঠাট্টা-মশকরা করবে। এটাই হল আল্লাহর সাথে অহংকার। বাস্তবিক পক্ষেও কিছু স্থান এমন আছে যেখানে নামায আদায় করলে মানুষ তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়। আর লোকজন এসে দেখতে থাকে এটা কী হচ্ছে?

স্পেনের বিমানবন্দরে নামায

এখন যেহেতু মুসলমান সবস্থানে পৌঁছে গেছে, এজন্য আলহামদু লিল্লাহ নামায আর অতটা অপরিচিত নেই। আমার তো এমন সব স্থানেও নামায পড়তে হয়েছে, যেখানের একজন মানুষও কালিমা পড়নেওয়ালা ছিল না। কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি আফসোস স্পেনে হয়েছে। সেই স্পেন যেখানে মুসলমানগণ আটশত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছে! আটশত বছর পর্যন্ত যে দেশের ইথারে ইথারে আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়েছে। যখন আমি সে দেশের বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম তখন নামাযের সময় ছিল। নামায পড়ার জন্য একটি কোনা তালাশ করলাম যাতে সেখানে নামায আদায় করতে পারি। আমার সাথে আমার এক বন্ধুও ছিলেন। এক কোনায় আমরা উভয়ে নামায শুরু করে দিলাম সেই কোনাটাও খুব দৃশ্যমান ছিল না। কেননা মানুষ নামায আদায় করার জন্য সাধারণতঃ এমন কোনাই তালাশ করে যেটা কিছুটা আড়ালে থাকে। কিন্তু আমি দুনিয়াতে মানুষের জন্য নামায কে এত অপরিচিত এবং এত অচেনা আর কোথাও অনুভব করিনি, যতটুকু সেখানে অনুভব করেছি। প্রথমে তো আমাদেরকে নামায পড়তে দেখে দু'চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে যান। এরপর তারা অন্যান্যদেরকে ডেকে ডেকে

আনছিলেন যে, দেখো এটা কী হচ্ছে!! তারপর তো আমাদেরকে দেখার জন্য মানুষের এমন ভীড়ই লেগে যায়, যেন তারা এ দৃশ্য কখনোই দেখেনি।

আমার এ জন্য অনুশোচনা হচ্ছিল যে, আমার আমেরিকা-ইউরোপের এমন অনেক দেশ যেগুলো কুফরের বড় বড় কেন্দ্রভূমি সেখানেও নামায পড়ার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সেখানের কোথায়ও নামায এত অপরিচিত মনে হয়নি, যত বেশি অপরিচিত স্পেনের বিমানবন্দরে মনে হয়েছে।

এখন যদি মানুষ এ কারণে নামায ছেড়ে দেয় যে, যদি আমি এখানে নামায পড়ি তবে লোকজন আমাকে তামাশার বস্তু বানাবে এবং খারাপ মনে করবে, অথবা নামায আদায়ের দ্বারা আমার অসম্মান হবে। তবে এটা ভয়াবহ চিন্তা-ভাবনা এবং এটা 'আল্লাহর সাথে অহংকার'।

এসব পরিস্থিতিতে নামায বিলম্বে আদায় করবে

অনেক স্থানে নামাযকে বিলম্বে আদায় করা জরুরী হয়ে পড়ে। এর কারণ হল, সেখানে নামায পড়া হলে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্বের আশংকা দেখা দিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি ট্রেন বা জাহাজে সফর করছেন। আর নামায পড়ার জন্য এ পরিমাণ জায়গা লাগে যতটুকু জায়গায় মানুষ সেজদা করতে পারে। কিন্তু নামায পড়ার জন্য এ পরিমাণ স্থান হাসেল করতে হলে অন্য মানুষকে কষ্ট দিতে হয় অথবা কাউকে তার আসন থেকে উঠাতে হয়, এ কষ্ট থেকে অন্যান্যদেরকে বাঁচানোর জন্য যদি মানুষ নামাযকে বিলম্বিত করে তবে এটা জায়েয আছে। কেননা অপরকে কষ্ট দিয়ে নামায পড়লে অমুসলিমদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব হবে। আর লোকজন ভাববে যে, ইসলাম এমনই এক ধর্ম যা মানুষদেরকে কষ্ট দেয়!!

এ জন্য এসব পরিস্থিতিতে নামায বিলম্বিত করা জায়েয। এতে কোন সমস্যা নেই।

অপর একটি দিক

যাই হোক। একটি দিক তো এই যে, লোকজন প্লেনে নামায আদায় করতে এ জন্য ঘাবড়ায় যেন অন্যান্যদের সামনে তামাশার পাত্রে পরিণত

হতে না হয়। আর নামায পড়ার দ্বারা যেন আমাদের অসম্মান (?) না হয়!! নাউযুবিল্লাহ। এটা তো আল্লাহর সাথে অহংকার করা হল। অপর একটি দিক যা নিম্নোক্ত ঘটনার মাধ্যমে সামনে এসেছে। ঘটনা হল এই : একবার আমি প্লেনের সফর করছিলাম। প্লেনও ছোট ছিল। আর সফরও মাত্র এক ঘন্টার ছিল। নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। তবে প্লেন থেকে অবতরণ করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমরা আরামে নামায পড়তে পারতাম। কিন্তু আমার কয়েকজন বন্ধু যারা আমার সাথে ছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে প্লেনে নামায আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করা হচ্ছিল। তারা বলছিলেন: আমরা এখানেই উযু করব, আযান দিব এরপর জামাআতের সাথে নামায আদায় করব। ফলে যখন তারা উযু করার ইচ্ছা করল তখন প্লেনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নিষেধও করলেন যে, এখানে উযু করা মুশকিল হবে। কিন্তু তারা সেই নিষেধ উপেক্ষা করে বলল: আমরা উযু করবই। যাইহোক দুজন মানুষ বাথরুমে গিয়ে এমন ভাবে উযু করলেন যে, বাথরুমের পুরো ফ্লোর ভিজে গেল! এবং তা পানিতে ভরে গেল। অথচ মানুষ যখন উযু করবে তখন এমন ভাবে উযু করা উচিৎ, যেন পরবর্তী আগন্তুকদের বাথরুম ব্যবহার করতে কষ্ট না হয়। কিন্তু ঐসব বন্ধুরা এটার কোন পরোয়াই করলেন না। এরপর তারা আযান দিলেন আর বললেন যে, আমরা জামাআতের সাথে নামায আদায় করব!!

এখন কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে, এদের সবার মধ্যেই এরা কাতার বানিয়ে নামায আরম্ভ করে দেয়। তবে যেহেতু প্লেনের দায়িত্বশীল লোকজন মুসলমান ছিলেন; ফলে তারা এদেরকে কিছু না বলে খাতির করেছেন বটে; কিন্তু সবাই বলাবলি করছিল যে, দেখো! এরা কী কাণ্ডটা ঘটাল!!

এখন যদি এক ঘন্টা পরে আরামের সাথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে উযু করে নামায পড়া হত, তাহলে এতে কী সমস্যা ছিল? অথচ এদের ঐ কার্যকলাপের ফলে এক হাঙ্গামা সৃষ্টি হল। যদ্দরুন বাথরুম আলাদাভাবে নষ্ট হল। এখন যে-ই বাথরুমে যাচ্ছে সে-ই তাদেরকে গালমন্দ করছে যে, এরা এ কাজ করেছে। লোকজনের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি, এখন নামায স্থগিত রাখুন। আর আমিও প্লেন থেকে নেমে নামায পড়ব। কিন্তু তারা আমার কথায় একেবারেই কর্ণপাত করল না!! এই হল আরেকটি দিক।

বিমানে উযু করার পদ্ধতি

এই দ্বিতীয় অবস্থায় আমরা অনেকে জড়িয়ে পড়ি এবং এ ব্যাপারে আমাদের (মনে অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার প্রতি) লক্ষ্য থাকে না, প্লেনের দায়িত্বশীলগণ সব সময় প্লেনে উযু করতে লোকজনকে নিষেধ করে থাকেন। যদি কারো ব্যাপারে তারা এটা বুঝতে পারেন যে, এ ব্যক্তি বাথরুমে গিয়ে উযু করবে, তবে তারা তাকে আটকে দেন। কেননা তারা জানেন যে, যখন এ ব্যক্তি উযু করবে তখন পুরো বাথরুম নষ্ট করে আসবে।

আমি অধিকাংশ সময় বিমানে সফর করতে থাকি। এবং বিমানের বাথরুমে সব সময় উযু করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে উযু করতে নিষেধ করেনি। এর কারণ হল: যখন আমি উযু করি তখন এ ব্যাপারে খুব লক্ষ্য রাখি যেন পানির সামান্য ছিঁটাও ফ্লোরে না পড়ে। এবং বাথরুমের ওয়াশ বেসিন সম্পূর্ণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, যাতে পরবর্তী আগন্তুকের কষ্ট না হয়। এ জন্য যদি আমরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সামান্য উদ্যোগী হই, তাহলে সেটা কোন কঠিন কাজ নয়। কেননা বাথরুমে তোয়ালে, টিস্যু পেপার, টয়লেট পেপার সব কিছু থাকে। মানুষের উচিৎ ফরাশ এবং ওয়াশ বেসিন এসকল পেপার দিয়ে পরিস্কার করে দেয়া। কিন্তু আমরা মনে করি: ব্যস! আমি তো আল্লাহর ওয়াস্তে উযু করে এসেছি (?) এখন পরবর্তী আগন্তুকের কী অবস্থা হবে সে ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই!!

দু' প্রকারের গোনাহ

অথচ এই বাথরুম নোংরা করার ফলে অন্যান্যদেরকে কষ্ট দেয়ার পৃথক গুনাহ হবে। আর মানুষদেরকে ইসলাম এবং দীনের প্রতীকী ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করার গোনাহ ভিন্নভাবে হবে। নাউযুবিল্লাহ।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

অর্থাৎ, 'তোমরা লোকজনের জন্য দীনকে সহজ করো, মুশকিল

বানিয়োনা, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও এবং তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।' (সহীহ বুখারী-কিতাবুল ইলম)

বর্তমানে আমরা এসব ব্যাপারকে দীন থেকে বেরই করে দিয়েছি। আজ আমাদের মসজিদের গোসলখানা ও বাথরুমগুলোর অবস্থা একটু পর্যবেক্ষণ করুন। এগুলোর অবস্থা এতই শোচনীয় থাকে যে, ভিতরে প্রবেশ করাই মুশকিল। আর প্রবেশ করা এ জন্যই মুশকিল হয়ে থাকে যেহেতু এখানে যারা থাকেন তারা সবাই মুত্তাকী-পরহেযগার!! উলামায়ে কেরাম, সূফীয়ায়ে ইযাম!! পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এজন্য তাদের বাথরুম নোংরা। সেখানে প্রবেশ করা মুশকিল। ঐ আলেমদের এ ব্যাপারে কোন লক্ষ্যই নেই যে, এটাও গোনাহের কাজ বা নাজায়েয কাজ।

এটা কবীরা গোনাহ

আমার মরহুম আব্বাজানের ঘটনা আমার মনে পড়ল। সেটা হল : একবার আমরা বাথরুম ব্যবহার করার পর সেটা পরিস্কার না করে পানি না ঢেলে বের হয়ে আসি। আব্বাজান রহ. এটা জানতে পেরে আমাদেরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: ' তোমরা কি মনে করেছো এটা সামান্য ব্যাপার? তোমাদের এ কাজটি কবীরা গোনাহ। কেননা অন্যকে কষ্ট দেয়া কবীরা গোনাহ। অথচ তোমরা মনে করছো আমরা কোন অন্যায় করিনি'!!

অমুসলিমদের উন্নতির কারণ

দেখুন! এই যারা কাফের ও অমুসলিম আছে তাদের কুফর নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য কাজ। কিন্তু তারা এমন কিছু বিষয় গ্রহণ করেছে যেগুলো আমাদের ছিল। ঐসব বিষয় অবলম্বন করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার লাইনে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করেছেন।

আমার মরহুম সম্মানিত পিতা খুব কাজের কথা বলতেন তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই বাতিল তো ধ্বংসশীল ' (সূরা ইসরা-৮১)

সুতরাং বাতিলের উত্থানের কোন যোগ্যতা নেই। অতএব যদি তোমরা কখনো দেখো যে, এই বাতিল উত্থান হচ্ছে, সম্মান অর্জন করছে তাহলে বুঝবে যে, কোন না কোন হক্ব জিনিস তার সাথে জুড়ে গেছে যেটা ঐ বাতিলকে উপরে উঠিয়ে দিয়েছে। হকের সাহায্য ছাড়া বাতিল কখনো উপরে উঠতে পারে না।

অতএব বর্তমানে দুনিয়ায় যে সব জাতির উন্নতি দৃশ্যমান হচ্ছে চাই তারা আমেরিকান হোক বা ইউরোপিয়ান অথবা অন্য কোন জাতি, এই উন্নতি তাদের কাফের বা বাতিলপন্থী হওয়ার কারণে হচ্ছে না বরং তারা কিছু এমন ভাল কাজ অবলম্বন করেছে যেমন পরিশ্রম, আমানতদারী, সততা, উত্তম সামাজিকতা ইত্যাদি। যা মূলতঃ ইসলামেরই শিক্ষা, এসব বিষয় অবলম্বনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উন্নতি দান করেছেন। আর বলেছেন যে, ঠিক আছে, তোমরা ভাল কাজ করেছো। এর পুরস্কার আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিব কিন্তু আখেরাতে তোমাদের কোন অংশ নেই। ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

অর্থাৎ 'আর আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।' (সূরা শূরা আয়াত নং ২০)

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার আমি ইংল্যান্ডে ট্রেনের সফর করছিলাম। এবং বার্মিংহাম থেকে এডিনবরা যাচ্ছিলাম। পাঁচ-ছয় ঘন্টার সফর ছিল। রাস্তায় আমার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। যখন সেখানে গেলাম তখন দেখলাম যে বাথরুমের বাইরে 'ব্যস্ত' লেখা সাইনবোর্ড ঝুলানো আছে। ফলে আমি আমার আসনে ফিরে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আমি আবার গেলাম। দেখলাম যে তখনও 'ব্যস্ত' কথা লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে। যদ্দরুন আমি পুনরায় আমার সীটে ফিরে আসলাম। কিছুক্ষণ পর যখন আবার গেলাম তখন দেখলাম যে, এবার 'খালী' লেখা বোর্ড লাগানো আছে। কিন্তু একজন মহিলা বাইরে অপেক্ষমান। আমি মনে করলাম যে, সম্ভবতঃ এ মহিলা জানেন না

যে বাথরুম খালী আছে। এজন্য আমি ঐ মহিলাকে বললাম : 'বাথরুম খালী আছে, আপনি যেতে চাইলে যেতে পারেন।' প্রতিউত্তরে ঐ মহিলা বললেন : হ্যাঁ, এটা খালী আছে তবে আমি অপেক্ষা করছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এখন কিসের জন্য অপেক্ষা? মহিলা বললেন: আমি এইমাত্র বাথরুম সেরে বের হয়েছি। কিন্তু যখন আমি প্রয়োজন থেকে ফারেগ হয়েছি ঠিক ঐ সময় ট্রেন ষ্টেশনে থেমে গেছে। আর নিয়ম হল : ট্রেন ষ্টেশনে থেমে থাকা অবস্থায় 'ফ্লাশ' করা নিষেধ। এজন্য আমি ঐ সময় 'ফ্লাশ' করতে পারিনি। এখন আমি ট্রেন চলার অপেক্ষা করছি। যাতে এটা ষ্টেশন ছেড়ে গেলে 'ফ্লাশ' করতে পারি, অতঃপর আমি আমার সীটে গিয়ে বসব এজন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

আমাদের কর্মপদ্ধতি

যখন আমি ঐ মহিলার এ কথা শুনলাম, তখন আমার দারুণ একটি নসীহত লাভ হল যে, দেখো! এটাই তো সেই শিক্ষা যা আমাদের আব্বাজান রহ. আমাদেরকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ 'ফ্লাশ' না করে বাথরুম থেকে চলে আসা কবীরা গোনাহ। কেননা এর ফলে অন্যান্য মানুষের কষ্ট হয়।

ঐ মহিলা এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন যেন ষ্টেশনে 'ফ্লাশ' না হয়। আমাদের এখানে কেউ কি এটার ইহতিমাম করবে? অথচ প্রতিটি বাথরুমে একথা লেখা থাকে 'যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকবে অতক্ষণ পর্যন্ত এটা ব্যবহার করবেন না।' কিন্তু কেউ এদিকে খেয়াল করেনা!! এটা এ জন্যই লেখা থাকে যেহেতু প্লাটফর্মে সব সময় লোকজন আসা যাওয়া করতে থাকে। গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকার মুহূর্তে যদি কেউ বাথরুম ব্যবহার করে, তবে প্লাটফর্মে ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে পড়বে। যদ্দরুন মানুষের কষ্ট হবে। আর এটা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। কিন্তু আমরা কেউ এ ব্যাপারে লক্ষ্য করি না।

একটি কাজে কয়েকটি গুনাহ

এমন কাজ করার পরও কেউ এটা মনে করে না যে, আমি কোন গোনাহ করেছি। অথচ ঐ একটি কাজে কয়েকটি গোনাহ শামেল হয়ে যায়। একটি

গোনাহ তো এই যে, যখন আপনার কারণে এমন স্থানে আবর্জনা ছড়াল, যা মানুষের চলাচলের পথ। তাহলে এর দ্বারা নিশ্চয়ই মানুষের কষ্ট হবে। দ্বিতীয় গোনাহ্ এই যে, যেহেতু এ গাড়ী আপনার মালিকানাধীন নয় বরং আপনি ভাড়া দিয়ে এটাকে সফরের জন্য ব্যবহার করছেন অতএব যেসব শর্ত সাপেক্ষে আপনাকে গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে ঐসব শর্ত মেনে চলা আপনার জন্য জরুরী। যদি আপনি এসব শর্তের বিরুদ্ধাচারণ করেন তবে এটা 'ভাড়াচুক্তি'র বিরোধিতা হবে যদ্দরুন আপনার জন্য এ গাড়ী ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

বান্দার হক নষ্ট করার গোনাহ্

এ দুটি গোনাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে। এখন আপনার এ আমল দ্বারা যখন বহু মানুষের কষ্ট হবে অথচ আপনার জানাও নেই কে কে কষ্ট পেল? তখন আপনি কার কার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন? এ জন্য এটা মারাত্মক গোনাহের কাজ। কিন্তু এ গোনাহকে গোনাহই মনে করা হয় না!! এই হল আমাদের আরেক দিক। এ ব্যাপারে খুব চিন্তা করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদেরকে সহীহ্ ফিকির দান করুন এবং সহীহ্ বুঝ নসীব করুন। আমীন।

মসজিদগুলোর ইস্তিঞ্জাখানার অবস্থা

ইসলাম। যা মূলতঃ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। আজ আমরা আমাদের কার্যকলাপের দ্বারা এ ধর্মকে 'আবর্জনার ধর্ম' বানিয়ে ফেলেছি।

ইংল্যান্ডে বিশেষভাবে এ দৃশ্য দেখা যায়, আপনি সারা দেশের যেখানেই যান না কেন, অফিস্ হোক কিংবা বিনোদন স্পট সর্বত্র আপনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম পাবেন। ইল্লা মাশাআল্লাহ! কিন্তু যদি আপনি কোন মসজিদের বাথরুমে প্রবেশ করেন তবে নাউযুবিল্লাহ! সেটাতে প্রবেশ করাই মুশকিল। স্রেফ হাতে গোনা কয়েকটি মসজিদ ব্যতীত যা খুব সুন্দরভাবে নির্মিত। এসব মসজিদে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা ভাল। কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ মসজিদে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা খারাপ। আর এখন তো শুধু

লন্ডন শহরেই আড়াইশ'-তিনশ' মসজিদ আছে। অথচ এমন একটি সময়ও ছিল যখন নামায পড়ার জন্য কোন জায়গা পাওয়া যেতনা। কিন্তু এসব মসজিদে পরিচ্ছন্নতার ইহতিমাম নেই। পুরো লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে নোংরা এলাকা হল মসজিদের বাথরুমগুলো। এর মাধ্যমে আমরা ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করছি। যে, ধর্ম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম ছিল, সে ধর্মকে আমরা আবর্জনার ধর্ম বানিয়ে পেশ করছি!!

জনৈক ইংরেজ নওমুসলিমের ঘটনা

আমার আব্বাজান রহ. একটি ঘটনা শুনাতেন। সেটা হল : দিল্লী জামে মসজিদে জনৈক ইংরেজ মুসলমান হয়ে গেলেন, এখন মুসলমান হওয়ার পরে নামায পড়ার জন্য জামে মসজিদে আসতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে, উযুখানার নালা নোংরা হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি দেখতে থাকলেন। যখন অন্য আর কেউ পরিস্কার করল না, তখন একদিন তিনি নিজেই ঝাড়ু নিয়ে এলেন এবং পানি ঢেলে সেটা পরিস্কার করা আরম্ভ করলেন। এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সে যখন দেখল যে, ঐ ইংরেজ নও মুসলিম নালা পরিস্কার করছে তখন বলল : এই ইংরেজ মুসলমান তো হয়েছে ঠিক, কিন্তু এখনও তার থেকে ইংরেজ সুলভ বদঅভ্যাস (?) যায়নি!! তার কথার উদ্দেশ্যে হল : এই যে তিনি সাফাঈ করছেন এটা ইংরেজ সুলভ অভ্যাস!! নাউযুবিল্লাহ।

ভাই! এই যে আমাদের কর্ম কৌশল, এটা তো নাজায়েযই বটে। এর পাশাপাশি যেহেতু এর মাধ্যমে ইসলামের ভুল চিত্র মানুষের সামনে আসছে। যদ্দরূন লোকজন দীন ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। এজন্য আমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে আরো বেশি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন, যাতে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব না হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাউফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আঠারতম মজলিস

অন্যকে তুচ্ছ ও হীন মনে করা ও তার চিকিৎসা

অন্যকে তুচ্ছ ও হীন মনে করা ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ- أَمَّابَعْدُ

অন্যদেরকে হীন মনে করা

হযরত থানভী রহ. তাঁর একটি বাণীতে ইরশাদ করেন :

'যদি কোন ব্যাপারে অন্যের কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তখন এটা চিন্তা করবে যে, আমার মধ্যেও তো কত দোষ আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দোষও থাকে গুণও থাকে। যদি তার মধ্যে একটি দোষ থাকে তাহলে হতে পারে যে আমার মধ্যে অনেক বেশি দোষ আছে। অথবা আমার মধ্যে একটি মাত্র দোষ আছে কিন্তু সেটা ঐ ব্যক্তির দোষ অপেক্ষা অনেক বেশি নিকৃষ্ট। এরপরও আমি কীভাবে তাকে ছোট মনে করতে পারি? কেন আমার প্রথমে সালাম দিতে লজ্জা লাগে?'
(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫৮)

এখতিয়ার বহির্ভূত খেয়াল আসলে পাকড়াও করা হবে না

যদি কখনো কারো ব্যাপারে এমন খেয়াল আসে। আর এ খেয়াল অনেক সময় এসেও যায় যে, এ ব্যক্তি অমুক ব্যাপারে আমার থেকে পিছিয়ে আছে আর আমি তার থেকে এগিয়ে আছি। তাহলে হঠাৎ এ জাতীয় খেয়াল আসাতে কোন সমস্যা নেই। আর এ জাতীয় এখতিয়ার বহির্ভূত খেয়াল আসার দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নিকট পাকড়াও এর সম্মুখীনও হতে হবে না। কিন্তু বারবার এ খেয়াল আনা এবং এ খেয়াল কে দিলের মধ্যে বসানো অতঃপর সে খেয়ালের চাহিদা অনুযায়ী আমল করা, এসবই অহংকারের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য এর চিকিৎসাও জরুরী।

মেধাবী তালিবে ইলমের অন্তরে নিজ বড়ত্বের খেয়াল

উদাহরণস্বরূপ : এক শ্রেণীতে কয়েকজন তালিবে ইলম পড়াশোনা করেন। এদের মধ্যে একজন ছাত্র খুব মেধাবী ও বুদ্ধিমান এবং দারুণ যোগ্যতাসম্পন্ন। প্রতি পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে। অন্যান্য তালিবে ইলম যারা আছে তাদের মেধা কম, স্মরণশক্তি দুর্বল। এখন যে ছাত্র পড়া লেখায় ভাল তার মনের মধ্যে এই খেয়াল আসছে যে, আমি তার তুলনায় অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু সাথে সাথে সে এটাও চিন্তা করছে যে, যদিও এই একটি গুণে অন্যান্যরা আমার থেকে পিছিয়ে এবং আমি তাদের থেকে এগিয়ে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, তাদের মধ্যে এমন সব গুণ আছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমার জানা নেই। এবং যেগুলোর দিক দিয়ে তারা আমার চেয়ে অগ্রগামী। তাছাড়া এটাও তো আমার জানা নেই মহান আল্লাহর নিকট কোন্ গুণটি বেশি কবূল হয়ে যাবে আর আমি তার থেকে পিছনে থেকে যাব। আর এটাও তো হতে পারে আমার মধ্যে এমন সব খারাপ দিক আছে যেগুলো সম্পর্কে আমার জানাও নেই, অথবা আমার মধ্যে এমন একটি খারাপ অভ্যাস আছে যা ঐ তালিবে ইলমের দুর্বলতার তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক।

দুর্বল তালিবে ইলমের মধ্যে নেকীর শ্রেষ্ঠত্ব আছে

দেখুন! যদি কোন তালিবে ইলম লেখাপড়ায় দুর্বল থাকে কিন্তু সে সৎ হয় এবং ফরয-ওয়াজিব বিষয়সমূহ সঠিকভাবে পালন করে গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে। অপরদিকে অন্য একজন তালিবে ইলম যে খুব মেধাবী, বুদ্ধিমান ও যোগ্যতাসম্পন্ন এবং প্রতি পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু সে গোনাহে লিপ্ত অথবা নামাযে অলসতা করে! এ তালিবে ইলমের যতই যোগ্যতা থাক সব বেকার। কেননা যখন আমলই ঠিক নেই তখন ইলমী যোগ্যতা থাকলেই বা কি ? যদিও এই তালিবে ইলম ইলমী যোগ্যতার দিক দিয়ে অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রসর কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি বদ অভ্যাস আছে যা তার সমস্ত ভাল গুণগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে।

মৌলিক দোষ হল ধর্মহীন হওয়া

বর্তমানে মানুষ ধর্মীয় দিক দিয়ে অপরাধী হওয়াটাকে অপরাধই মনে করে না। নাউযুবিল্লাহ। অথচ আসল দোষ ও দুর্বলতা এটাই। জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট তার ছেলের পরিচয় এভাবে পেশ করছিলেন: আমার ছেলে খুব মেধাবী, বুদ্ধিমান, পড়ালেখায় খুব ভাল। এখন সে অমুক দেশে উচ্চপদে চাকুরী করে!! সেখানে সে সবাইকে নিজ অনুরক্ত বানিয়ে রেখেছে। আমি বললাম : আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দান করুন।

এরপর তিনি বললেন : অবশ্য আমার ছেলেটি সামান্য বে দ্বীন (ধর্মহীন) হয়ে গেছে!!

এই ব্যক্তি ধর্মহীনতার খারাবীটাকে এমনভাবে বর্ণনা করলেন, যেন এটা কোন বড় দোষ নয়! কেমন যেন বলতে চাচ্ছেন অন্য সব ব্যাপারে তো সে ঠিকই আছে! শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে!

ধর্মহীন হওয়ার উদাহরণ

আমি বললাম : ব্যাপারটির উদাহরণ এমনই যেমন এক গ্রামের লোকজন জনৈক ডাক্তার সাহেবকে এক ব্যক্তির রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আনিয়েছে। ডাক্তার সাহেব আসলেন এবং তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চতুর্দিক হতে পর্যবেক্ষণ করলেন। দেখার পরে ডাক্তার সাহেব বলতে লাগলেন: এর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে। এর হাতও ঠিক। কানও ঠিক। নাকও ঠিক। ব্যস। শুধু তার রূহটি বের হয়ে গেছে!!

আমি ঐ ব্যক্তি কে বললাম! আপনি আপনার ছেলের ব্যাপারে যে পরিচয় পেশ করলেন সেটার সাথে এ উদাহরণ পুরোপুরি মিলে যায়। কেননা তার মধ্যে সব কিছু ঠিক আছে শুধু সে সামান্য ধর্মহীন হয়ে গেছে!! নাউযুবিল্লাহ। অথচ দীনের খারাবী এবং বদ আমলীর খারাবী এতই মারাত্মক যে, এর সামনে অন্য সব খারাবী তুচ্ছ।

কাজেই যে ব্যক্তিকে আপনি হীন বা ছোট মনে করছেন এমনও তো হতে পারে যে আপনার মধ্যে এমন কোন দোষ আছে যা তার দোষের তুলনায় আরো নিকৃষ্টতম!!

নিম্ন পর্যায়ের মানুষেরা আল্লাহর নিকট মাকবূল হবেন

আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, তার তুলনায় আপনার মধ্যে দোষ ত্রুটি কম। কিন্তু এটা কি জানা আছে আল্লাহ তা'আলার নিকট কে মাকবূল ? যারা বাহ্যিকভাবে দেখতে শুনতে সাধারণ মানুষ মনে হয় অনেক সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁরা খুব মূল্যবান বিবেচিত হন।

হাদীস শরীফে হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

رُبَّ اَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ

অর্থাৎ, 'এমন অনেক মানুষ আছে যাঁদের মাথার চুল এলোমেলো, মানুষের দরজায় গেলে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয় কিন্তু যদি সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বসে [উদাহরণস্বরূপ: সে বলল আমি কসম করে বলছি : এটা অবশ্যই হবে] তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর কসম পূর্ণ করে দেন।' (সহীহ মুসলিম)

যদিও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট এর মূল্য এত বেশি যে আল্লাহ তা'আলা তার কথার মর্যাদা রক্ষা করেন যে, আমার বান্দা যখন আমার নামে কসম খেয়েছে অতএব এখন আমি তাকে মিথ্যাবাদী বানাবনা।

জান্নাতের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকজন

জান্নাতের উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন লোকদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا

অর্থাৎ, 'তাঁরা এমন মানুষ যখন তাঁরা কোথাও হারিয়ে যায় তখন তাঁদের ব্যাপারে কোন অনুসন্ধানকারীও থাকে না' (সুনানে ইবনে মাজা)

উদাহরণস্বরূপ: এক ব্যক্তি নামায পড়ার জন্য দৈনিক মসজিদে আসত যদি কোন দিন না আসে, তবে তার ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না যে,

অমুক ব্যক্তি দৈনিক মসজিদে আসত আজ সে কোথায় চলে গেল? আর যদি সে কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে লোকজন তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আর বলে: আরে এ তো মৌলভী মানুষ!!

এসব মানুষই জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

কারো বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা করবেন না

অতএব কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন না। কেননা মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা ও মূল্য যে কতটুকু তা তো আমার জানা নেই। এজন্যই বলা হয়েছে: কোন মানুষকে হীন মনে করবেন না, আর মনে রেখ! কোন মুসলমানের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানো কবীরা গোনাহ ও হারাম কাজ। আর এটা এমনই হারাম যেমন হারাম মদ পান করা ও ব্যভিচার করা। এজন্য যদি কখনো স্বীয় কোন কৃতিত্বের খেয়াল আসে আর অপরের কোন ত্রুটির কথা মনে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এর চিকিৎসা এভাবে করবে যে, কী জানি তার মধ্যে এমন কোন গুণও থাকতে পারে যা আমার জানা নেই। কী জানি আমার মধ্যে এমন কোন দোষও থাকতে পারে যা তার ঐ ত্রুটি অপেক্ষা বেশি মারাত্মক। আমার তো জানা নেই মহান আল্লাহর নিকট এ ব্যক্তি কতটা মাকবূল?

আল্লাহ তা'আলার নিকট ঘৃণিত মানুষ

আর যে সব মানুষকে বাহ্যিকদৃষ্টিতে খুব সম্মানী ও মর্যাদাশীল মনে করা হয়, মহান আল্লাহর নিকট এদের সামান্য একটি পশম পরিমাণ মূল্যও নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর বাস্তব উদাহরণ হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

হাদীস শরীফে এসেছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ اَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ

অর্থাৎ 'ঐ সব মানুষ যাদেরকে আমি ঘৃণা করি এবং যারা কিয়ামতের দিন অমার থেকে দূরে থাকবে তারা হল ঐ সব লোক যারা কথা বেশি বলে, মুখ চিবিয়ে কথা বলে আর অহংকার করে।'। (তিরমিযী শরীফ)

অর্থাৎ, ঐ সব বক্তা যারা দুনিয়াতে মজলিস গরম করে ফেলত। খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলত। জ্বালাময়ী ও আগুন ঝরানো বক্তা হিসেবে যার খ্যাতি ছিল। লোকজন তার আশে পাশে ভীড় জমাত। তাকে তুখোড় বক্তা হিসেবে পসন্দ করত আর তার প্রশংসা করে বলত: ইনি অনেক বড় আলেম, ফকীহ, ওয়ায়েয, খতীব... ইত্যাদি। কিন্তু এসব লোক মহান আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয় ব্যক্তি হবে। নাউযুবিল্লাহ।

কারো ব্যাপারে কোন ফয়সালা করবেন না

কাজেই আল্লাহ তা'আলার নিকট যেমনিভাবে বাহ্যিক গুণাবলী কবুল হওয়ার মাপকাঠি নয় অনুরূপভাবে বাহ্যিক ত্রুটিসমূহও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার আলামত নয়। মানুষ কিসের উপর ফয়সালা করবে? কোন্ জিনিসের উপর হুকুম লগাবে? এ জন্য সব সময় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিৎ। এবং কোন মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে ফয়সালা করা অনুচিৎ। সুতরাং কারো প্রশংসারও প্রয়োজন নেই। সমালোচনারও দরকার নেই।

কাফেরদেরকেও হীন মনে করবেন না

মানুষ যখন প্রথম প্রথম দীনের উপর চলা শুরু করে, তখন তার মধ্যে খুব জোশ্ ও জয্বা থাকে। ফলশ্রুতিতে সে সমস্ত মাখলূকের উপর অভিশাপ আর তিরস্কার আরম্ভ করে দেয়। সে সমস্ত মাখলূককে জাহান্নামী মনে করে আর স্রেফ নিজেকে জান্নাতী মনে করে!!

এটা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। আরে! মুসলমান তো মুসলমান কোন কাফেরকেও নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী বলবেন না। কেননা এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করবেন যার বদৌলতে সে পার পেয়ে যাবে।

কোন কাফেরের ব্যাপারে 'চিরস্থায়ী জাহান্নামী' হওয়ার সিদ্ধান্ত দিবেন না

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. আরেকটি সূক্ষ্ম কথা বলেছেন যা বুঝার মত।

তিনি বলেন : যদি কারো বাহ্যিক কথা-বার্তা এমন হয় যা কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌছতে থাকে, তবে মুফতী ছাহেবের কাজ হল তার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে দেয়া যে, এটা কুফরী কথা। এবং দুনিয়াতে তার সাথে কাফেরদের ন্যায় আচরণ করা হবে। তবে শর্ত হল মুফতী ছাহেব পূর্ণ সতর্কতার সাথে কাজ আঞ্জাম দিবেন। সেই সতর্কতা হল: যদি কারো কথায় ৯৯% কাফের হওয়ার আশংকা থাকে আর মাত্র ১% মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখনো 'কাফের' হওয়ার ফতোয়া দেয়া অনুচিৎ। কিন্তু তার ব্যাপারে কুফরের ফতোয়া দেয়া সত্ত্বেও এটা বলবেন না যে, সে 'চিরস্থায়ী জাহান্নামী'!! কেননা নিঃসন্দেহে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কথা কুফর ছিল কিন্তু হতে পারে তার কথার ভেতরে এমন ব্যাখ্যাও তো হতে পারে যা তাকে আল্লাহর নিকট কুফর থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দিবে।

জনৈক ব্যক্তির মাগফিরাত লাভের ঘটনা

এর উদাহরণ প্রসঙ্গে হযরত থানভী রহ. সহীহ বুখারীর হাদীস পেশ করেছেন। যেটাতে পূর্ববর্তী উম্মতের জনৈক ব্যক্তির ঘটনার উল্লেখ আছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ: পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল। যখন তার ইন্তিকাল এর সময় নিকটবর্তী হল তখন সে অসীয়ত করল: যখন আমি মারা যাব তখন আমার লাশ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে। আর লাশ জ্বলে যখন ছাই হয়ে যাবে, সেই ছাই যেদিন বাতাসের গতি খুব বেশি থাকে ঐ দিন ঐ বাতাসে উড়িয়ে দিবে!!

লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো: 'তুমি এমন অসীয়ত কেন করছ? সে বলল: আসল ব্যাপার হল, আমি অনেক বড় গুনাহগার মানুষ। আর আমি চাই যেন মহান আল্লাহর হাতে ধরা না পড়ি। কেননা যদি আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ধরা পড়ে যাই তাহলে তিনি আমাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিবেন। তার মৃত্যুর

পর তার অসীয়ত অনুযায়ী আমল করা হয়। যখন মহান আল্লাহর সামনে তাকে পেশ করা হল তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : এ ব্যক্তি প্রথমত আমার অস্তিত্বের উপর ঈমান এনেছে, দ্বিতীয়ত সে আমাকে ভয় করে। এমনই ভয় করেছে যে, সে লোকজনকে বলেছে : 'যদি আমি আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাই তবে তিনি আমাকে মারাত্মক আযাব দিবেন।' তার এসব কথাবার্তার কারণে আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

বাহ্যিক কুফর সত্ত্বেও মাফ করার কারণ

এখন বাহ্যিকভাবে তো তার এই অসীয়ত কুফর পর্যন্ত পৌঁছে। কেননা সে বলেছিল : আমি এই অসীয়ত এই জন্য করছি, যাতে আল্লাহর হাতে গ্রেফতার না হই!! এর অর্থ তো এটাই যে, সে আল্লাহর কুদরতকে অস্বীকার করছে। এ জন্যই তো সে বলছে : বাতাসে যেন আমার শরীরের ছাই উড়িয়ে দেয়া হয় যাতে আল্লাহ্ আমাকে একত্রিত করতে না পারেন। অথচ এটা হল প্রকাশ্য কুফর। কিন্তু যেহেতু এই অসীয়তের মূল কারণ ছিল আল্লাহ তাআলার ভয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

এজন্য হযরত থানভী রহ. বলেন : যার থেকে প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পেয়েছে তার বিরুদ্ধে ফতোয়াও কুফরের হবে। কেননা মুফতীর কাজই হল তার বিরুদ্ধে কুফরের হুকুম লাগানো। কিন্তু তার 'স্থায়ী জাহান্নামী' হওয়ার হুকুম লাগাবে না।

মনসূর হাল্লাজের বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া

দেখুন! 'মনসূর হাল্লাজ' যার 'আনাল হক্ব' (আমিই হক্ব) বলার ঘটনা প্রসিদ্ধ। ইনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর শিষ্য বরং সম্ভবতঃ তাঁর খলীফাও ছিলেন।

যখন তাঁর থেকে 'আনাল হক' কথাটা প্রকাশ পেল যা বাহ্যিকভাবে কুফরী কালিমা ছিল, তখন উলামায়ে কেরাম তাঁর ব্যাপারে কুফরের ফতোয়া দিয়ে দেন। অথচ ভিতরে ভিতরে তিনি কক্ষণো কাফের ছিলেন না তার উপর তো কুফরের ছায়াও পড়েনি। বরং বিশেষ অবস্থার প্রাবল্যে তাঁর থেকে এমন

কথা প্রকাশ পেয়েছে যেটার বিভিন্ন ব্যাখ্যাও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যেহেতু ফেতনা ছড়িয়ে পড়ছিল এ জন্য উলামায়ে কেরাম কুফরের ফতোয়া দিয়ে দেন।

ফাঁসির সময় হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর সাথে কথোপকথন

তাকে ফাঁসি দেয়ার সময় বহু মানুষ ফাঁসির দৃশ্য দেখার জন্য এসেছিল। এদের মধ্যে হযরত জুনায়েদ বাদগাদীও রহ. ছিলেন। যখন মনসূর হাল্লাজ হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. কে দেখলেন তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন 'এই যে এত মানুষ এখানে একত্রিত, এরা তো আসল হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ, এরাতো কিছুই জানে না, এ জন্য আমি এদেরকে মাযূর মনে করি। কিন্তু হে জুনায়েদ! আপনি তো আসল হাকীকত সম্পর্কে জানেন, আমি কী বলি আর আমার কী উদ্দেশ্য সেটাও আপনি বুঝেন। তাই আমার জিজ্ঞাসা আপনি কেন এলেন?

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. বললেন : 'আমি এজন্য এসেছি যে, তোমার বিরুদ্ধে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে সেটা সঠিক। আর তোমার এমন পরিণামই হওয়া উচিৎ।' অথচ হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. জানতেন: মনসূরের কথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অন্য কিছু।

উলামায়ে কেরাম দীনের পাহারাদার

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুফতী ছাহেবান ও ফুকাহায়ে কিরামকে দীনের প্রহরী বানিয়েছেন। হক কথা বলা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব। কেউ কুফরী কথা বললে তাঁরা বলে দিবেন এটা কুফরী কথা।

জনৈক ব্যক্তি আমাকে বললেন : আপনারা দীনের ঠিকাদার বনে বসে আছেন। যাকে ইচ্ছা কাফের বানান আবার যাকে ইচ্ছা মুসলমান বানান। আমি তাকে বললাম : আমরা ঠিকাদার তো নই। তবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দীনের পাহারাদার বানিয়েছেন। আর পাহারাদারের কাজ হল তিনি পরিচয় পত্র ছাড়া কাউকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন না। এমনকি

প্রধানমন্ত্রীকেও আটকে দেয়া হবে এবং বলা হবে প্রথমে আপনার পরিচয় পত্র দেখান এবং প্রমাণ করুন যে আপনি প্রধানমন্ত্রী! তবেই আপনাকে ভিতরে যেতে দিব নতুবা ভিতরে যেতে দিব না। অথচ ইনি প্রধানমন্ত্রী আর উনি পাহারাদার!!

এমনিভাবে আমরাও দীনের পাহারাদার অতএব যদি কেউ দীনের মধ্যে প্রবেশ করতে চায় অথচ তার মধ্যে ঐ গুণাবলী নেই তবে আমরা তাকে দীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বাঁধা প্রদান করব, এটা আমাদের কর্তব্য।

কুফরের ফতোয়ার পরে জাহান্নামী হওয়ার সিদ্ধান্ত দিবেন না

অতএব যেসব মুফতী ছাহেব কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সহীহভাবে কুফরের ফতওয়া দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ফতওয়া দেয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে কী আচরণ করবেন? সে কি জান্নাতী হবে নাকি জাহান্নামী? যদি সে জাহান্নামে যায় তবে কি সেখানে চীরকাল থাকবে নাকি কোন এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সেখান থেকে বের করবেন? এ ফয়সালা আমরা করতে পারি না। এবং আমাদের এ ফয়সালায় জড়িয়ে পড়াও অনুচিৎ। কেননা আমাদের কী জানা আছে, কেউ হয়ত বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাফের, কিন্তু তার নিকট এমন সব ব্যখ্যা আছে, যার পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দয়া করবেন। এ জন্য কোন মানুষকে যে কোন সময় তুচ্ছ মনে করা অহংকার এর অংশ।

মহান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে এর থেকে হিফাযতে রাখেন। আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উনিশতম মজলিস

বিশেষ ধরনের পোষাক ব্যবহার করা অহংকার

বিশেষ ধরনের পোষাক ব্যবহার করা অহংকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ- أَمَّابَعْدُ

বেশভূষায় বাড়াবাড়িও অহংকার

হযরত থানভী রহ. তাঁর একটি বাণীতে ইরশাদ করেছেন:

> 'বেশভূষায় বাড়াবাড়ি অবলম্বন করাও অহংকার। বেশ কি? ভূষা কি? ফ্যাশন কি? এসব শয়তানী ধান্দা। নিজেকে কেন এত বড় মনে করবে যে এর জন্য বিশেষ বেশ-ভূষা অবলম্বন করতে হবে। বান্দার কর্তব্য হল সরকার যে উর্দি ও বেশ-ভূষায় রাখেন সেটাতেই থাকা। নিজ মতামত ও ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেয়া।' (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৬৭)

অনেকের এমন অভিরুচি থাকে, তারা মানুষের মধ্যে নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য বিশেষ ধরনের বেশ-ভূষা অবলম্বন করে। উদাহরণস্বরূপ: কেউ বিশেষ কোন পোষাক এ জন্যই নির্ধারণ করল যে, যখন অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করবে তখন ঐ পোষাকেই করবে। যখন বাইরে বের হবে তখন ঐ পোষাকেই বের হবে। আর তার মনের মধ্যে এমন একটা চিন্তা থাকে যে, এর দ্বারা আমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে এবং মানুষের মধ্যে এমন প্রসিদ্ধি হবে যে, এ ব্যক্তি সব সময় ঐ পোষাক পরিধান করে। হযরত থানভী রহ. বলেন : এটাও অহংকারের একটি শাখা।

বিশেষ পোষাকের ইহতিমাম করবেন না

দেখুন! আলাদাভাবে উদ্যোগী না হয়ে যদি কেউ বিশেষ পোষাক পরিধান করে তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এমন ইহতিমাম করা যে, যখনই কাপড় পরিধান করব তখন এমন পোষাকই হতে হবে, অন্য কোন

পোষাক হওয়া যাবে না, যখন টুপি পরিধান করব তখন সেটা এমনই হতে হবে। আমার কাপড় জোড়া সব সময় এমনই হতে হবে। বেশ-ভূষার ব্যাপারে এত বেশি যত্নবান হওয়ার মূল কারণ হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অহংকার। সাথে সাথে এটাও উদ্দেশ্য থাকে, যেন অন্যান্যদের থেকে আমার পৃথক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। আরে ভাই! কিসের বৈশিষ্ট্য ? আর কিসের বেশ-ভূষা? হওয়া তো উচিৎ এমন : 'বন্ধু যে অবস্থায় রাখে সে অবস্থাই ভাল।'

কোন্ ধরনের পোশাক অহংকারের অন্তর্ভূক্ত

এজন্যই আমাদের বুযুর্গানে দীন বিশেষ কোন পোষাকের ইহতিমাম করেননি। বরং কখনো এই পোষাক পরেছেন কখনো ঐ পোষাক পরেছেন যাতে এটা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত না হয়।

আমি এ কথা বলছি না যে, কোন বিশেষ পোষাকের ইহতিমাম করা সব সময়ই অহংকার হয়। কেননা অনেক সময় এমনও হয় যে, কোন মানুষের বিশেষ ইহতিমাম ছাড়াই একটি পোষাক পরিধান করার অভ্যাস থাকে এবং সে ঐ পোষাক পরিধান করতেই থাকে, এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এমনটি করা যে, এর ব্যতিক্রম যেন কক্ষণো না হয় এবং ঐ ব্যতিক্রমকে নিজের অসম্মান মনে করা। এ অবস্থাটি অহংকারের মধ্যে গণ্য হয়।

সারকথা এটাই যে, সাদাসিধে থাকবেন। কোন বিশেষ পোষাক পরিধানের লৌকিকতা অবলম্বন করবেন না। বরং যদি লৌকিকতাহীনভাবে একটি পোষাক পরিধান করতে থাকেন তবে সেটাই পরিধান করতে থাকুন। আড়ম্বরহীনভাবে অন্য কোন পোষাকের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, সেটা পরিধান করলেন, তবে কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং বিশেষ কোন পোষাকের ইহতিমাম করা এটা অহংকারের অন্তর্ভূক্ত।

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. সাদাসিধা পোষাক পরিধান করতেন। কিন্তু সেই পোষাকও নিয়মমাফিক হত।

পোষাকের ব্যাপারে হযরতের সুন্দর অভিরুচি ছিল। সাধারণত তিনি সাদা রং-এর পোষাক পরিধান করতেন।

হযরত থানভী রহ.-এর বড় স্ত্রী যিনি হযরতকে খুব বেশি মহব্বত করতেন। একবার রামাযানুল মুবারকে হযরত থানভী রহ.-এর জন্য একটি শেরওয়ানি তৈরী করলেন। যেহেতু খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন এজন্য তিনি ঐ শেরওয়ানির জন্য খুব আড়ম্বরপূর্ণ কাপড় নির্বাচন করেন যার উপর কাপড়ের বণনের মধ্যে ফুলের কারুকার্য ছিলো। পুরো রামযান সেটাকে নিজে সেলাই করেছেন এবং হযরতকে জানতেও দেননি। ঈদের সামান্য পূর্বে সেটাকে প্রস্তুত করে হযরতের খেদমতে পেশ করেন এবং বলেন, যে এ শেরওয়ানি আমি আপনার জন্য সেলাই করেছি। হযরত সেটা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন! যে, এমন সৌখিন কাপড় তো আমি আজ পর্যন্ত কখনো পরিধান করিনি। কিন্তু তিনি স্ত্রীর সামনে কিছু প্রকাশ করলেন না বরং এ বলে তার প্রশংসা করলেন যে, 'তুমি তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর কাপড় সেলাই করেছ এবং খুব পরিশ্রম করে সেলাই করেছ। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

স্ত্রী বললেন: 'আমি এটা এজন্য সেলাই করেছি যে, আপনি এটা পরিধান করে ঈদগাহে যাবেন।'

হযরত থানভী রহ. বলেন: আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এখন এই শেরওয়ানি পরিধান করে ঈদগাহে যাওয়াও মুশকিল আবার পরিধান না করলেও মুশকিল। পরিধান করে গেলে লোকজন বলাবলি করবে: দেখ! মাওলানা সাহেব কত সৌখিন কাপড় পরে ঈদগাহে এসেছেন। আবার যদি পরিধান না করি তবে স্ত্রীর মন ভেঙ্গে যাবে। কেননা সে পুরো রামযান মাস জুড়ে খুব পরিশ্রম করে এটাকে সেলাই করেছে। পরিশেষে হযরত এটাই ফয়সালা করলেন যে, তার মন ভাঙ্গা ঠিক হবে না। যদি আমি এটা পরিধান করে ঈদগাহে যাই আর লোকজন খারাপ মনে করে তবে করুক। বেশির থেকে বেশি তারা এটাই বলবে যে, মাওলানা সাহেব কত সৌখিন পোষাক পরে এসেছেন। চলো, তাদেরকে বলতে দাও। তিনি ঐ শেরওয়ানি পরিধান করে ঈদগাহে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ঈদের নামায থেকে ফারেগ হওয়ার

পরে এক ব্যক্তি বললেন : হযরত! এ শেরওয়ানি তো আপনার জন্য মানায় না! হযরত রহ. বললেন : হ্যাঁ ভাই, তুমি ঠিক কথাই বলছ, আচ্ছা তুমিই এটাকে নিয়ে যাও, এ কথা বলে ঐ ব্যক্তিকে সেই শেরওয়ানি দিয়ে দিলেন।

তিনি ছিলেন দাসত্বের মূর্তপ্রতীক

এখন আপনি আন্দাজ করুন! এত বড় ব্যক্তিকে যদি নিজ রুচী-ও মেজাযের বিপরীত পোষাক পরে এত বড় সমাবেশে যেতে হয় তাহলে তার মনের অবস্থা কেমন হবে? কিন্তু তিনি মানুষের দিল ভাঙ্গা থেকে বাঁচার জন্য এসব মেনে নিলেন।

যদি তিনি আমাদের মত বেশভূষার পাবন্দ হত কেউ হতেন, তাহলে নিজ স্ত্রীকে এই উত্তর দিতেন যে, 'তোমার পরিশ্রম গোল্লায় যাক। আমি তো এটা পরিধান করে যাব না, এতে আমি মানুষের সামনে অপদস্থ হব।' কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য মিটিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজেকে দাসত্বের মূর্তপ্রতীক বানিয়েছিলেন, এজন্য তাঁর নিকট সাধারণ কাপড় ও সৌখিন কাপড় সব বরাবর ছিল।

যাইহোক, কোন বিশেষ বেশভূষার ব্যাপারে মানুষের এত বেশি গুরুত্বারোপ করা কাম্য নয় যাতে সে ঐ বেশভূষার গোলাম বনে যায়।

অহংকারের যৌক্তিক চিকিৎসা

হযরত থানভী রহ. অহংকারের যৌক্তিক বা জ্ঞানগত চিকিৎসার বয়ান প্রসঙ্গে লিখেন :

> 'অহংকারের ইলমী চিকিৎসা হল: নিজ দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে চিন্তা করবে, আর এমনটিভাববে যে, আমার ত্রুটিগুলো সম্পর্কেতো আমি নিশ্চিতভাবে জানি। আর অন্যান্যদের ত্রুটিগুলোর ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত জ্ঞান আছে। আর যে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে দোষী সে ধারণাপ্রসূত দোষীর চেয়ে নিকৃষ্টতম। এ জন্য আমার উচিৎ নিজেকে সবচেয়ে ছোট মনে করা।'

(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৬৮)

প্রতিটি মানুষ নিজ দোষ ত্রুটির ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিতভাবে জানে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে অপরের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে যা কিছু জানে সেটা হল অনুমান নির্ভর। যদিও সেটা প্রবল ধারণাই হোক না কেন। এখন আপনিই বলুন নিশ্চিত ত্রুটিযুক্ত মানুষ নিকৃষ্টতম? নাকি ধারণাপ্রসূত ত্রুটিযুক্ত মানুষ বেশি নিকৃষ্ট? বলা বাহুল্য যে, নিশ্চিত ত্রুটিযুক্ত মানুষ বেশি নিকৃষ্ট। এজন্য অহংকারী ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে এটা ভাববে যে, আমি তো নিশ্চিত ত্রুটিযুক্ত মানুষ। অতএব আমি তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট। সুতরাং আমার উচিৎ নিজেকে অন্যান্যদের তুলনায় ছোট মনে করা।

এটাই হল অংহকারের যৌক্তিক ও ইলমী চিকিৎসা।

অহংকারের আমলী চিকিৎসা

> 'আর আমলী বা কার্যগত: চিকিৎসা এই যে, যাকে তুমি নিজের চেয়ে ছোট মনে করছ তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করবে, আর এই আমলী চিকিৎসাটি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এটা ব্যতীত কেবলমাত্র ইলমী চিকিৎসা যথেষ্ট নয়। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত, যতক্ষণ পর্যন্ত আমলী চিকিৎসা করা না হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত অহংকার দূর হবে না।' (প্রাগুক্ত)

আপনার অন্তরে অন্য ব্যক্তির কদর নেই, যে কারণে আপনি তাকে তুচ্ছ মনে করছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হল: লৌকিকতামূলক হলেও তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করা। এর দ্বারা অহংকার দূরীভূত হবে।

জনৈক ব্যক্তির চিঠির উত্তরে হযরত থানভী রহ. তাকে লিখলেন : 'তুমি মুসাফিরদের পা টিপে দিবে এর দ্বারা তোমার অহংকার দূর হবে।'

বুযুর্গানে দীনের বিভিন্ন অভ্যাস

আমাদের বুযুর্গানে দীনের অভ্যাসগুলোও আশ্চর্যজনক ছিল, আর তাঁদের রংও ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. খুব রুচিশীল পোষাক পরিধানকারী ছিলেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর কাপড় পরিধান করতেন। জনৈক ব্যক্তির ভাষ্যমতে: 'হযরত তো জামাই বনে থাকতেন।'

এদিকে শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান ছাহেব রহ.-এর উপর নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার রং প্রবল ছিল। তিনি পোষাকের অত বেশি ইহতিমাম করতেন না। কখনো দুই সেলাইবিহীন চাদর পরিধান করছেন। কখনো পাজামা পরিধান করছেন। কখনো লুঙ্গী পরিধান করছেন। এমনকি কেউ তাঁকে চিনতেও পারত না যে ইনিই শাইখুল হিন্দ।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বিনয়

রামাযানুল মুবারকে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর বাসায় সারা রাত তারাবীহ পড়ার অভ্যাস ছিল। বিশ রাকাআত তারাবীহতে সারা রাত পার হয়ে যেত। দৈনিক দশ পারা করে তিলাওয়াত করা হত এবং প্রতি তিন দিনে এক খতম হত। বিভিন্ন হাফেয তারাবীহতে কুরআন শোনাতেন। ঐ হাফেযদের মধ্যে হাফেয মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেবও রহ. একজন ছিলেন। হযরত শাইখুল হিন্দু রহ. তাঁর তেলাওয়াত খুব পসন্দ করতেন। এজন্য অধিকাংশ সময় তাঁকে নামাযে দাঁড় করিয়ে দিতেন।

একদিন মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব রহ. এর শরীর খারাপ হয়ে গেল। এ জন্য তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন: আজকে আমি অসুস্থ থাকার দরূন তারাবীহ পড়াতে পারব না। এ রাতে তারাবীহ সংক্ষিপ্ত হল আর তারাবীহর পরে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. নফল নামায পড়া আরম্ভ করলেন।

মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব বলেন : মসজিদের সাথে একটি কামরা ছিল আমি সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে আমি হঠাৎ অনুভব করলাম কেউ আমার পা টিপে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম যে, সম্ভবত: কোন তালিবে ইলম মনে করেছে আমি অসুস্থ এজন্য পা টিপে দিয়ে আমার খেদমত করছে। আর আমার কাছেও তা ভাল লাগছিল, এজন্য আমি চুপচাপ শুয়ে থাকলাম মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম না কে আমার পা টিপে দিচ্ছে, কিছুক্ষণ পর আমি মুখ ফিরিয়ে দেখতে চাইলাম কে আমার পা টিপে দিচ্ছে? তখন দেখলাম যে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. আমার পা টিপে দিচ্ছেন!! তাঁকে দেখে আমার উপর বিদ্যুতের মত কিছু একটা পতিত হল। আমি সাথে সাথে উঠে বসলাম আর বললাম : 'হযরত! এটা আপনি কী করলেন? হযরত

বললেন : 'এতে সমস্যার কী আছে? তোমার শরীর ভাল ছিল না তাই আমি ভাবলাম যে, তোমার পা টিপে দিব, এতে তোমার আরাম হবে'।

অথচ মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর ছাত্র ছিলেন।

এ দারুল উলূম দেওবন্দ এমনিতে প্রসিদ্ধ হয়নি। আর এ আকাবিরে দেওবন্দ এমনিতেই আকাবিরে দেওবন্দ বনে যাননি। বরং তাঁরা সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) যমানার স্মরণকে তাজা করেছেন। বর্তমানে তো লোকেরা 'মাসলাকে দেওবন্দ' কথাটার মর্মই বুঝে না যে, 'মাসলাকে দেওবন্দ' আসলে কী?

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর বিনয়

'আরওয়াহে ছালাছাহ' গ্রন্থে হযরত থানভী রহ. লিখেছেন : আমাদের কাফেলার সরদার হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. নিজ শিষ্যদের আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বলতেন : 'অন্যের জুতা ঠিক করে দাও অন্যের জুতা বহন করে'। কিন্তু যখন কোন তালিবে ইলমকে দেখতেন যে, সে বিনয়ী এবং তার মধ্যে অহংকার নেই, তখন ঐ তালিবে ইলমের জুতা নিজেই বহন করতেন!!

একবার তিনি সবক পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তালিবে ইলমগণ স্বস্ব কিতাব নিয়ে ভিতরে যেতে লাগলেন তখন হযরত গাংগুহী রহ. তালিবে ইলমদের জুতাগুলো গুটিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন!

বিনয় ও নম্রতার ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) স্মরণ কে তাজা করে দেখিয়েছিলেন। এবং নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের মন মস্তিষ্কে তাকাব্বুর ও অহংকার, ইলম ও জ্ঞান, মাল ও দৌলত, শরীর ও স্বাস্থ্য সর্বোপরি বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত (?) হওয়ার যে খান্নাস ভরা আছে, সে-ই আমাদের সব কিছু বিগড়ে দিয়েছে।

মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদের থেকে এ খন্নাস কে বের করে দিন। আমীন!

ঐক্য স্থাপিত না হওয়ার কারণ হল 'অহংকার'

আজ আমাদের মধ্যে একতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথচ সবাই চেষ্টা করছে যেন ঐক্য হয় কিন্তু ঐক্য হচ্ছে না। আর ঐক্য হলেও কয়েকদিন পরই চৌরাস্তায় পাতিল ফেটে যাচ্ছে এবং সমস্ত ঐক্য চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এমনটি কেন হয়?

এ ব্যাপারে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলেন : ঐক্য স্থাপিত হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দুটি শর্ত পাওয়া না যাবে, অতক্ষণ পর্যন্ত ঐক্য স্থাপিত হবে না, একটি হল ইখলাস। আর অপরটি হল বিনয়। অতএব দুজন অহংকারীর মধ্যে কখনো ঐক্য হতে পারে না। যদি হয়ও তবে সেটা সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের জন্য হবে। যখন ঐ স্বার্থ পুরা হয়ে যাবে, তখন ঐক্যও খতম হয়ে যাবে।

দুই অহংকারীর মাঝে ঐক্যের দৃষ্টান্ত

আমার সম্মানিত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন : দুই অহংকারীর মাঝে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে যে ঐক্য স্থাপিত হয়, সেটার উদাহরণ হল 'গাধার চুলকানি'!! যখন গাধার কোমরে চুলকানি হয়, তখন যেহেতু সে নিজে নিজ শরীর চুলকাতে পারে না। এজন্য সে অপর গাধাকে বলে: তোমার কোমরেও চুলকানি, আমার কোমরেও চুলকানি, এজন্য তুমি আমার নিকটে আস এরপর আমরা একত্রিত হয়ে কোমরের সাথে কোমর ঘষাঘষি করব!! এটাকেই 'গাধার চুলকানি' বলে।

অনুরূপ ভাবে দুই জন অহংকারী ব্যক্তির মাঝে ঐক্যও বাস্তবিক পক্ষে 'গাধার চুলকানি', কেননা এরা নিজ নিজ স্বার্থে সাময়িকভাবে ঐক্য করে। যখন স্বার্থ হাসিল হয়ে যায় তখন একে অপরকে লাথি মেরে পৃথক হয়ে যায়। আর আসল ঐক্য ইখলাস ও বিনয় ব্যতীত স্থাপিত হতেই পারে না।

সমস্ত ঝগড়ার ভিত্তিই হল এই অহংকার। মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে এর থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বিশতম মজলিস

ছোটদের উপর অত্যাচার করে ফেললে কিভাবে ক্ষমা চাবে?

ছোটদের উপর অত্যাচার করে ফেললে কিভাবে ক্ষমা চাবে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -اَمَّا بَعْدُ

একটি বাণীতে হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন :

'অনেক সময় এমন খেয়াল হয় যে, যদি আমরা প্রকাশ্য শব্দে (নিজেদের ছোটদের নিকট) ক্ষমা চাই তবে এরা বে-আদব হয়ে আরো বেশি অবাধ্যতা করবে। আবার অনেক সময় খেয়াল হয় যদি আমরা মাফ চাই, তবে এরা লজ্জিত হবে।

কিন্তু এ ওযর ঐ সময় প্রযোজ্য যখন তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়, এসকল অবস্থায় শুধু তাদেরকে খুশী করে দেয়াই যথেষ্ট। আশা করা যায় এটাই ক্ষমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

আবার অনেক সময় তাদের সাথে (ভবিষ্যতে) সম্পর্ক রাখার ইচ্ছাই থাকে না। উদাহরণস্বরূপ: কর্মচারীকে বিদায় করে দিল। অথবা কর্মচারী নিজেই চাকুরী ছেড়ে চলে গেল। এ পরিস্থিতিতে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে তার কাছে পরিষ্কারভাবে ক্ষমা চাওয়া জরুরী। কেননা এখানে উল্লেখিত অসুবিধা নেই।

এ ক্ষেত্রে যদি ইতস্ত: অনুভব হয়, তবে আমার মতে এর একমাত্র কারণ হল 'অহংকার'। যদিও সে নিজেকে বড় মনে করে না। তবুও অহংকারের চাহিদার উপর তো আমল হল। বেশি থেকে বেশি বিশ্বাসগত অহংকার হবে না কিন্তু কার্য অহংকার তো অবশ্যই হবে। যদি কোন ব্যক্তি অহংকারের এ বিভক্তি কে না মানেন, তবুও এতটুকু তো মানতেই হবে যে,

এটা জুলুম হয়েছে, যার কারণে ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব। অতএব ক্ষমা না চাওয়ার সূরতে যদি অহংকারের গোনাহ নাও হয় তবুও জুলুমের গোনাহ তো অবশ্যই হল।' (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫৮)

ছোটদের উপর বাড়াবাড়ি হয়ে যায়

এ ব্যাপারটি অধিকাংশ মানুষের খুব বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ: কেউ হয়ত অফিসার যার অধীনে লোকজন কাজ করেন। অথবা পিতা-মাতা সন্তানাদির সাথে, কিংবা উস্তাদ শাগরেদের সাথে, পীর সাহেব মুরীদের সাথে। মোটকথা! নিজ অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে এ জাতীয় আচরণ প্রায় সময়ই সংঘটিত হয়। যতটুকু তাম্বীহ করা প্রয়োজন ছিল, দেখা যায় এর চেয়ে বেশি হয়ে যায়। অথবা যতটুকু বকা দেয়া দরকার ছিল তার থেকে বেশি হয়ে যায়। অথবা উপযুক্ত শাস্তি থেকে অধিক শাস্তি দেয়া হল। কিংবা শাস্তির ক্ষেত্রই ছিল না অথচ তাকে ভুল শাস্তি দিয়ে দেয়া হল। এ জাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।

মাফ চাওয়ার ক্ষতি

এখন সহজ সরল কথা তো এটাই যে, যার সাথে আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন তার কাছে মাফ চেয়ে নিবেন যে, ভাই! আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করে দাও। কিন্তু অনেক সময় এমন খেয়াল হয় যে, যদি আমি এ ভাবে প্রকাশ্য ভাষায় তার কাছে মাফ চাই তবে তার মধ্যে আরো বেশি অবাধ্যতার জয্‌বা সৃষ্টি হবে, এ আরো বেশি বে-আদব হয়ে যাবে। ভুল পথে চলবে।

মানুষে মানুষে পার্থক্য

দেখুন! মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়। কোন কোন মানুষতো এমনও আছে, যার সাথে বড় কেউ ঝুঁকে বা নত হয়ে কথা বললে, সে পানির মত নরম হয়ে যায়। এবং এর ফলে সারা জীবনের জন্য তার সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে, যদি তার সাথে বড় কেউ ঝুঁকে কিংবা নত হয়ে কথা বলে তবে সে আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে তার মধ্যে আরো বেশি অবাধ্যতা মাথাচাড়া দেয়।

মুতানাব্বী কবি অনেক সময় খুব জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন। তিনি বলছেন :

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ

وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيْمَ تَمَرَّدَا

وَضْعُ النَّدٰى فِىْ مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعُلٰى

مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ فِىْ مَوْضِعِ النَّدٰى

অর্থাৎ, যদি তুমি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্মান কর, তবে সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে। আর যদি কোন ইতর শ্রেণীর মানুষের সাথে সম্মানজনক আচরণ কর, তবে সে আরো বেশি অবাধ্য হবে। যেখানে তরবারী চালানো দরকার যদি তুমি সেখানে উদারতার আচরণ কর, তবে এটাও এমনই ক্ষতিকর, যেমন উদারতার স্থলে তরবারী চালনা ক্ষতিকর।

যাইহোক! মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়। অনেকে আছেন, যাঁদের সাথে আপনি নম্র আচরণ করলে তারা আপনার প্রতি আরো বেশি মুগ্ধ হবে এবং আর কক্ষণো আপনার অবাধ্য হবে না। আবার কিছু মানুষ এমনও আছে যাদের সাথে নম্র আচরণ করলেই উল্টো তারা অবাধ্য হয়ে যায়!!

এ জন্য অনেক সময় মনের মধ্যে এমন খেয়াল আসে যে, যদি আমি আমার থেকে ছোট ব্যক্তির নিকটে ক্ষমা চাই, তাহলে সে অবাধ্য হয়ে যাবে। এবং আরো বেশি নাফরমানী করবে, তার মন মস্তিষ্কে আরো বেশি শয়তানী পয়দা হবে।

দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটির ব্যাপারে ফয়সালা করে নিন

এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত থানভী রহ. বলছেন : প্রথমে দু'টি ব্যাপারের মধ্য হতে যে কোন একটির ব্যাপারে ফয়সালা করে নিন। সেটা এই যে, যে ছোটর সাথে এ ব্যাপার ঘটেছে, তার সাথে আগামীতে আপনি সম্পর্ক বজায় রাখবেন কি না? এই যেমন : আপনার অধীনস্থ কোন কর্মচারীর সাথে আপনার এমন মু'আমালা সামনে আসল, তাহলে প্রথমে আপনি এ

ফয়সালা করুন যে, একে আপনি আপনার কর্মচারী হিসেবে আর রাখবেন কি না? নাকি তাকে বিদায় করে দিবেন?

তার সাথে সুন্দর আচরণ করুন

যদি ঐ কর্মচারীকে চাকুরীতে বহাল রাখার ইচ্ছা থাকে তবে এমতাবস্থায় তার কাছে প্রকাশ্য শব্দে ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে অন্য কোন শিরোনামে তার মনোরঞ্জন করা উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ: তাকে কোন হাদিয়া-তোহফা দিয়ে দিলেন। অথবা তার সাথে হাসি ঠাট্টা মিশ্রিত মিষ্টি কথা বললেন। অথবা তাকে খানার দাওয়াত দিলেন। যাতে এর পরিণামে সে এটা বুঝে যে, আমার সাথে সুন্দর আচরণ করা হয়েছে। এমন সুন্দর আচরণ করে পূর্ব বাড়াবাড়ির ক্ষতিপূরণ করবেন।

নতুবা ক্ষমা চেয়ে নিন

আর যদি আপনার ইচ্ছা এমন থাকে যে, এখন আর তাকে চাকুরীতে বহাল রাখবেন না বরং তাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিবেন। তাহলে এ অবস্থায় যেহেতু বে-আদব বা অবাধ্য হওয়ার আশংকা করা অর্থহীন বেকার কাজ। এজন্য এ অবস্থায় ঐ কর্মচারীর নিকট প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

কাজেই যখন ঐ কর্মচারীকে অব্যাহতি দিবেন তখন তার নিকট পরিস্কার ভাষায় বলবেন : আমার দ্বারা যেসব বাড়াবাড়ি হয়েছে সেজন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও। বিশেষ কোন মুহূর্তে কোন জুলুম হয়ে থাকলে সেটার জন্য আলাদাভাবে মাফ চেয়ে নিন।

অহংকারের চিকিৎসা

যখন আপনি আপনার কর্মচারীকে একথা বলবেন যে, 'অমুক সময় আমার দ্বারা যে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল সে জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

একথাগুলো মুখ থেকে বের করার সময় অহংকারী মানুষের দিলের উপর করাত চলবে। কিন্তু অহংকারের চিকিৎসাই হল কর্মচারীকে বিদায় করার সময় প্রকাশ্য শব্দে তার নিকট এ কথাগুলো বলা। এর একটি

উপকারিতা এই হবে যে, যখন প্রকাশ্য শব্দে ক্ষমা প্রার্থনা হয়ে গেল তখন আশা করা যায় মহান আল্লাহর দরবারে তাকে আর পাকড়াও এর সম্মুখীন হতে হবে না ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, অহংকার ব্যাধির চিকিৎসা হয়ে যাবে।

প্রিয়নবী সা.-এর ক্ষমা প্রার্থনা করা

এ জগতে কে আছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদার বরাবর হতে পারে? বরং দুনিয়া আখেরাতের কোন মর্যাদা কোন পদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা ও পদতুল্য হতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম মজমায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছেন: যে কোন ব্যাপারে যে কারো সাথে যদি আমার দ্বারা কোন বাড়াবাড়িমূলক আচরণ হয়ে থাকে, অথবা যদি আমি কারো জান-মাল ইজ্জত-আব্রুর উপর কোন জুলুম করে থাকি,তবে আজ আমি এখানে সকলের সামনে বিদ্যমান। যদি সে চায় তবে আমার থেকে প্রতিশোধও নিতে পারে অথবা আমাকে মাফও করে দিতে পারে।

জনৈক সাহাবীর রাযি. প্রতিশোধ নেয়া

একজন সাহাবী রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আপনার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার আছে!! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কোন্ জিনিসের প্রতিশোধ? ঐ সাহাবী রাযি. আরয করলেন : একদিন আপনি আমার পিঠে মেরেছিলেন! সেটার প্রতিশোধ নিব। প্রিয় নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার তো মনে পড়ছে না যে, কাউকে মেরেছি। তবে যদি তোমার মনে থাকে তাহলে প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

ঐ সাহাবী রাযি. আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আপনি আমার পিঠে মেরেছেন তখন আমার পিঠ খোলা ছিল তাতে কোন কাপড় ছিল না। সমান সমান প্রতিশোধ তো ঐ সময় হবে যখন আপনার পিঠেও কোন কাপড় থাকবে না!! এখন তো আপনার পিঠে চাদর আছে!! একথা শুনে

দোজাহানের সরদার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিঠ মুবারক থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন এবং বললেন : 'এখন বদলা নাও'। এরপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠ মুবারক থেকে চাদর সরালেন তখন 'মহরে নবুওয়াত' দৃশ্যমান হল। ঐ সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠের দিকে অগ্রসর হলেন এবং মহরে নবুওয়াতে চুমু খেলেন আর বললেন : আমার উদ্দেশ্যই ছিল মহরে নবুওয়াতে চুমু খাওয়া, প্রতিশোধ নেয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না!!

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দিচ্ছেন: কারো সাথে আমি বাড়াবাড়ি করে থাকলে হয়ত সে আমার থেকে প্রতিশোধ নিক! অথবা আমাকে ক্ষমা করে দিক!! তখন আমার আপনার কী অবস্থা?!

যাইহোক, মানুষ এ কথা বলতে কেন লজ্জা করবে যে, আমার ভুলের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে ক্ষমা করে দাও!

এ জন্য হযরত থানভী রহ. বলেছেন : যখন ঐ কর্মচারীর সাথে আপনার আর সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা নেই, তখন পরিষ্কার ভাষায় তার কাছে মাফ চেয়ে নিন। মাফ চাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো লজ্জা যেন প্রতিবন্ধক না হয়।

ক্ষমার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে ক্ষমা চেয়ে নিন

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যার দায়িত্বে অন্য কারো জান কিংবা মালের হক আছে সে যেন আজই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে মাফ চেয়ে নেয়। ঐ সময় আসার পূর্বেই যখন ক্ষমার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়বে। আজ তো তুমি তাকে খোশামোদের মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন বিনিময়ের মাধ্যমে হোক মাফ করাতে পারবে; কিন্তু একটা সময় এমন আসবে যখন তোমার নিকট ঐ ব্যক্তির সামনে পেশ করার মত কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা থাকবে না। আখেরাতে তো সেখানের মুদ্রা ব্যবহৃত হবে। আর সেখানের মুদ্রা হল নেকীসমূহ। সেখানে তো হক মাফ করানোর জন্য হয়ত নিজের নেকীসমূহ ঐ ব্যক্তিকে দিতে হবে অথবা তার গোনাহসমূহ নিজের কাঁধে নিতে হবে। তার হক আদায় করার এবং এ মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার এটা ভিন্ন অন্য কোন পথ থাকবে না। অতএব ঐ সময় আসার পূর্বেই হকসমূহ মাফ করিয়ে নিন।

হযরত থানভী রহ.-এর ক্ষমা প্রার্থনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষমাপ্রার্থনার সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। ঐ পুস্তিকাটির নাম ছিল اَلْعُذْرُ وَالنُّذُرُ। ঐ পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন 'সারা জীবন যাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, না জানি আমার দ্বারা কার কোন হক্ব নষ্ট হয়েছে? আমি আজ ঐসব হক আদায়ের জন্য প্রস্তুত। যদি কারো মালের হক্ব আমার যিম্মায় থাকে আর সেটা আদায় করতে আমার মনে না থাকে তবে আমাকে মনে করিয়ে সে যেন হক্ব উসূল করে নেয়। আর যদি কারো জানের হক্ব থাকে তবে যদি সে প্রতিশোধ নিতে চায় প্রতিশোধ নিয়ে নিক। মাফ করতে চাইলে মাফ করে দিক। আমি আপনাদের সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।' এরপরে এ পুস্তিকাটি চিঠির আকৃতিতে স্বীয় মুতাআল্লিকদের নিকটে পাঠিয়ে ছিলেন। যাঁদের সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ.-এর ক্ষমাপ্রার্থনা

আমার আব্বাজানও রহ. ইন্তিকালের আনুমানিক দুই বৎসর পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনামূলক একটি বিষয়বস্তু আমার মাধ্যমে লিখিয়েছেন। এরপরে সেটাকে'যা কিছু হয়ে গেছে তার কিছু ক্ষতিপূরণ' নামে 'আল বালাগ' পত্রিকাতেও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও নিজ মুতা'আল্লিকদের নিকটে জনে জনে প্রেরণ করেছেন। এবং এর মাধ্যমে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

অতএব এই ক্ষমা প্রার্থনা কোন অসম্মানজনক ব্যাপার নয়। এর দ্বারা মানুষের সম্মান কমে না। বরং এর মাধ্যমে মানুষ আখেরাতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল এর দ্বারা অহংকার নিঃশেষ হয়ে যায়।

হাদিয়া দিয়ে কর্মচারীকে খুশী করে দিন

আর যদি ঐ কর্মচারীর সাথে ভবিষ্যতেও সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা থাকে, তাহলে ঐ অবস্থায় যদি তার নিকট প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার অবাধ্য

হওয়ার আশংকা হয়, সে ক্ষেত্রে তার সাথে যে কোন শিরোনাম অবলম্বন করে তাকে সন্তুষ্ট করুন। উদাহরণ স্বরূপ: তাকে কোন হাদিয়া-তোহফা দিয়ে দিন এবং তার দিল খোশ করে দিন।

কর্মচারী ও অধীনস্তদের ব্যাপারে এত তাকীদ কেন?

'কর্মচারী' ও 'অধীনস্ত' ব্যক্তিরা এমনই মানুষ, যাদের সাথে ইনসাফ আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাওফীকের দ্বারাই হতে পারে। নতুবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ এদের ব্যাপারে ইনসাফের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। কেননা ঐ অধীনস্ত ব্যক্তি নিজ কর্তৃত্বাধীন ও আয়ত্ত্বের মধ্যে থাকে! আমাদের যখন মনে চায় তখন তাদেরকে বকা দিতে পারি, যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারি!! যেহেতু স্বীয় অধীনস্ত ব্যক্তির উপর মানুষের কর্তৃত্ব থাকে, ফলশ্রুতিতে মানুষ ঐ কর্তৃত্বকে সীমারেখার মধ্যে থেকে ব্যবহার করতে অপারগ থাকে এবং মানুষ ঐ শক্তির ভুল প্রয়োগ করে। এজন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর ঘটনা

একবার হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) নিজের গোলামকে প্রহার করছিলেন, এখন বলাই বাহুল্য নিশ্চয়ই কোন বাস্তব অন্যায়ের শাস্তি দিয়েছিলেন। বিনা কারণে নিশ্চয়ই শাস্তি দেননি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রহাররত অবস্থায় দেখে ইরশাদ করলেন :

لَلّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, এ গোলামের উপর তোমার যতটুকু কর্তৃত্ব, তার থেকে অনেক বেশি কর্তৃত্ব আল্লাহ পাকের তোমার উপর আছে। উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, লক্ষ্য রেখ! ঐ কর্তৃত্বকে তুমি সঠিক এবং উপযুক্ত সীমারেখার মধ্যে থেকে ব্যবহার করছ কি না? যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চান তবে তোমার ঠিকানা কোথায় হবে?

হযরত থানভী রহ.-এর অভ্যাস

যাইহোক, এসব ছোট ও অধীনস্ত মানুষের সাথে মুআমালা করার সময় অহংকারের খুব বেশি আশংকা বিদ্যমান। এ জন্য এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিৎ।

হযরত থানভী রহ. এ প্রসঙ্গেই একটি বাণীতে বলেন : যখন আমি আমার চেয়ে ছোট কাউকে পাকড়াও করি অথবা বকাঝকা দেই, তখন আলহামদু লিল্লাহ্ কখনো এর ব্যতিক্রম হয়নি যে, এক দিকে তাকে বকা দিচ্ছি আর অন্য দিকে মনে মনে মহান আল্লাহ্র নিকট এ কথা আরয করছি: হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে এমন পাকড়াও করবেন না। এখন বলুন! যে ব্যক্তির অন্তরে সব সময় আখেরাতের এমন চিন্তা জাগ্রত আছে, তিনি কীভাবে সীমালংঘন করবেন?

ভাই নিয়াজের ঘটনা

হযরত থানভী রহ.-এর খলীফা বাবা নাজম আহসান ছাহেব রহ. এ ঘটনা শুনিয়েছেন : হযরত থানভী রহ.-এর একজন খাদেম ছিলেন যিনি 'ভাই নিয়াজ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি হযরতের খুব কাছাকাছি থাকতেন, এজন্য কিছুটা মুখরা ছিলেন। আর সাধারণত: বড় ব্যক্তিদের মুখরা খাদেম অন্য মানুষদের সাথে কিছুটা অহংকারসুলভ আচরণ করে থাকে।

প্রবাদ প্রসিদ্ধ :

بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرتے ہے اترا تا

অর্থাৎ 'হয়েছে রাজার মোসাহেব, চলাফেরা করে অহংকারের সাথে'!!

এ জন্য হযরত থানভী রহ.-এর নিকট যাঁরা মেহমান হিসেবে আসতেন এই খাদেম অনেক সময় তাঁদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন।

হযরত থানভী রহ. যখন এটা জানতে পারলেন যে, ভাই নিয়াজ আগন্তুকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, তখন হযরত তাকে ডাকলেন এবং কঠোর ভাষায় বললেন : 'মিঞা নিয়াজ! তুমি নাকি আগন্তুকদের সাথে লড়াই ঝগড়া কর আর অভদ্রভাবে কথাবার্তা বল?

উত্তরে তিনি বললেন : হযরত! মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন!! দেখুন! একজন খাদেম নিজ মনিবকে বলছে : মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন!!

এ সময় তো ঐ খাদেমকে আরো বেশি বকা দেয়ার কথা! কিন্তু হযরত থানভী রহ. আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে অন্য দিকে চলে গেলেন।

আমি এক তরফা কথা শুনে ধমক দিয়েছি

পরবর্তীতে লোকজন প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত থানভী রহ. বললেন : যখন ভাই নিয়াজ আমাকে বলল: 'মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন'। ঐ সময় আমার চৈতন্যোদয় হল যে, আমি তো এক তরফা কথা শুনে তাকে ধমক দেয়া শুরু করেছি। অথচ আমার উচিৎ ছিল তার বক্তব্য শোনা এবং তাকে জিজ্ঞেস করা যে, লোকজন তোমার ব্যাপারে এসব কথা বলাবলি করছে! বল, এগুলো সঠিক না ভুল? তার বক্তব্য শোনার পর ধমকের ফয়সালা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমি এক পক্ষের কথা শুনেই ধমক আরম্ভ করেছি। এজন্য আসলে ভুল আমারই হয়েছে। অতএব কারণে আমি ইসতিগফার পড়তে পড়তে চলে গিয়েছি।

ভাই নিয়াজের কথার মর্ম

হযরত বাবা নাজম আহসান রহ. এ ঘটনা শুনানোর পর বলেন: আমার ধারণা, ভাই নিয়াজের কথার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, হযরত! মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল, যারা আপনার নিকট অভিযোগ করেছে তাদের উচিৎ মিথ্যা না বলা এবং আল্লাহকে ভয় করা। কিন্তু তাড়াহুড়ার মধ্যে সরাসরি হযরতকে সম্বোধনের সময় মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে: মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন!!

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা

কিন্তু এ ঘটনায় দেখার মত বিষয় হল, যখন একজন খাদেমকে ধমক দিয়েছেন তখন সাথে সাথে মনের মধ্যে এ খেয়াল এসেছে যে, আমি তো এক পক্ষের কথা শুনেই ফয়সালা করে দিয়েছি। আমার এ কাজটি ভুল হয়েছে, এজন্য এর উপর ইসতিগফার পড়তে পড়তে চলে গেছেন।

একেই বলে– كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তিনি মহান আল্লাহর সীমারেখার সামনে থেমে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইনিই হলেন 'হাকীমুল উম্মত' এমনি এমনি তিনি 'হাকীমুল উম্মত' হয়ে যাননি, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফয়েয পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আজ আমরা কিছু বাহ্যিক প্রথাকে 'দীন' বানিয়ে নিয়েছি। অথচ এসবও দীনের অংশ। অর্থাৎ, কখন কার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে? এবং কোন্ সীমার মধ্যে থেকে করতে হবে? এর দাড়িপাল্লা নিজের মধ্যে স্থাপন করতে হয়। এমন যেন না হয় যে, পাল্লা এক দিকে ঝুঁকে থাকল!! বরং প্রতিটি কাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

সমান সমান প্রতিশোধ নেয়া সহজ ব্যাপার নয়

যাইহোক! ছোটদের সাথে মুআমালা করতে গেলে রক্তের ঢোক পান করতে হয়। কেউ খুব সুন্দর বলেছেন :

در گونہ رنج وعذاب جان مجنوں را

অর্থাৎ ,'দ্বিগুণ কষ্ট ও প্রাণের আযাব মজনুর জন্য।'

একদিকে এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমাদের থেকে কোন বাড়াবাড়ি না হয় আর যদি কোন বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সেটার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। অপরদিকে এ ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সে অবাধ্য না হয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা খারাপ না হয়ে পড়ে। এতদুভয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা, ব্যস এটাই আল্লাহপাকের সীমারেখা কায়েম করা। আর এ কাজ সাধারণত: কোন শায়খের সংসর্গ ও তারবিয়ত ব্যতীত হাসেল হয় না। বরং এটা ছাড়া মানুষ পদস্খলিত হয়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ, যদি কারো নিয়মতান্ত্রিক তারবিয়ত হয়ে থাকে তখন তিনি বুঝতে পারেন কোন স্থানে কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। কতটুকু অবলম্বন করা উচিৎ? যদি কাউকে ধমক দিতে হয় তবে কতটুকু ডোজ দিতে হবে? এর চেয়ে বেশি দিলে কতটুকু বাড়াবাড়ি হবে? এই দাড়িপাল্লা আপনা আপনি দিলের মধ্যে সৃষ্টি হয় না।

যদি আমি দু চার শব্দে এটাকে বয়ান করতে চাই তবে বয়ান করতে পারব না বরং এটা এমনই এক অভিরুচি ও যোগ্যতা যখন সেই অভিরুচি ও যোগ্যতা দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় তখন সে নিজেই বলে : এখানে এ পরিমাণ ডোজ দেয়া দরকার, এর চেয়ে বেশির প্রয়োজন নেই। এর চেয়ে বেশি করলে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ, 'যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি অন্যেরা তোমাদের সাথে করেছে ঐ পরিমাণ বাড়াবাড়িই তোমরা তাদের সাথে করতে পারো।'(সূরা বাকারা:১৯৪)

এ আয়াতের উপর আমল করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেননা পুরোপুরি সমান সমান বদলা নেয়া সহজ কাজ নয়।

আল্লাহর ওলীদের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে

'আরওয়াহে ছালাছাহ' গ্রন্থে হযরত থানভী রহ. একটি কাহিনী লিখেছেন: জনৈক ব্যক্তি কোন এক বুযুর্গকে প্রশ্ন করলেন : হযরত! আমি শুনেছি আল্লাহর ওলীদের প্রকৃতি বিভিন্ন হয়, নানা শান হয়! আমি সেই রং ও সেই শান দেখতে চাই!! ঐ বুযুর্গ বললেন: তুমি এই চক্করে পড়ো না। তোমার যা করণীয় তাই করতে থাক। কিন্তু সে ব্যক্তি জিদ ধরল যে, আমি এটা দেখতে চাই।

তখন সে বুযুর্গ বললেন: আচ্ছা তাহলে তুমি এক কাজ কর। অমুক গ্রামে একটি মসজিদ আছে, তুমি সেখানে যাও। সেখানে তুমি তিনজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল দেখবে। তুমি সেখানে গিয়ে তিন জনকেই পিছন হতে একটি একটি ঘুষি মারবে! এরপর দেখবে তাঁরা কী করে? তাঁরা যা কিছু করবে সেটা আমাকে এসে জানাবে।

ফলে ঐ ব্যক্তি গ্রামের মসজিদে গেল। গিয়ে দেখল যে, বাস্তবেই তিনজন বুযুর্গ আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছেন। এ ব্যক্তি প্রথমে একজনকে পিছন থেকে ঘুষি মারল! ঐ বুযুর্গ সাথে সাথে পিছনে ঘুরে এ ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ জোরেই একটি ঘুষি মেরে দিলেন। এরপরে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বুযুর্গ কে গিয়ে ঘুষি মারার পরে তিনি ফিরেও দেখলেন না যে, কে মারল? কেন মারল? বরং নিজ যিকিরে মশগুল থাকলেন!!

যখন তৃতীয় বুযুর্গকে ঘুষি মারা হল তখন তিনি উল্টো হাত টিপতে শুরু করলেন, আর বললেন, ভাই! তোমার হাতে ব্যথা লাগেনি তো?

এ ব্যক্তি ফিরে আসার পর ঐ বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন: কী কী ঘটল? সে পুরো ঘটনা খুলে বলল এবং জানাল যে, তিনজনের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করেছেন! এই বুযুর্গ বললেন : তুমি বুযুর্গদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলে, এই হল তাঁদের ভিন্ন রং ও প্রকৃতি।

প্রথম বুযুর্গ যিনি তোমার থেকে প্রতিশোধ নিলেন; প্রথমে তুমি বল : তিনি কি ঐ পরিমাণ জোরেই ঘুষি দিয়েছেন যে পরিমাণ জোর নিয়ে তুমি তাকে ঘুষি দিয়েছিলে? নাকি আরো বেশি জোরে ঘুষি মেরেছেন? এ ব্যক্তি বলল: না, না, আমি যেমন জোরে মেরেছি তিনিও তেমন জোরেই মেরেছেন।

এ বুযুর্গ মন্তব্য করলেন: ঐ (প্রথম) বুযুর্গ এটা চিন্তা করেছেন যে, যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি এ আমার সাথে করল, আমি ঠিক ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম।

প্রথম বুযুর্গ বদলা নিলেন কেন?

এ কথাটা মানুষের বুঝে আসে না। কিন্তু এটাই বাস্তব যে, অনেক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ মানুষের থেকে এ জন্যই বদলা বা প্রতিশোধ নেন যাতে এ ব্যক্তি পরকালীন পাকড়াও থেকে বেঁচে যায়। তাঁদের প্রতিশোধ এ জন্য নয় যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে! বরং এ জন্য প্রতিশোধ নেন যে, যদি আমি এখানে তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেই তবে সে আখেরাতের ধরপাকড় থেকে বেঁচে যাবে।

এ জন্যই সে বুযুর্গ প্রতিশোধ নিয়েছেন। কিন্তু অতটুকুই নিয়েছেন যতটুকু নেয়া উচিৎ ছিল। এর চেয়ে বেশি নেননি।

দ্বিতীয় বুযুর্গ বদলা নিলেন না কেন?

দ্বিতীয় বুযুর্গ যিনি ছিলেন, তিনি চিন্তা করলেন বদলা নেয়ার চক্করে কে পড়ে? কেননা যদি আমি সামান্য পরিমাণও অতিরিক্ত বদলা নেই তবে উল্টো

আমাকে পাকড়াও করা হবে। এজন্য খামোকা এই চক্করে পড়ার কী প্রয়োজন? তার চেয়ে ভাল হল যে কাজে মশগুল ছিলাম, অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরে, সে কাজেই লেগে থাকি!! কেউ মারলে মারুক!!

তৃতীয় বুযুর্গের আমল

তৃতীয় বুযুর্গ নিজেকে নিজে এত বেশি মিটিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের ব্যথারও পরোয়া করেননি বরং উল্টো ঘুষি মারনেওয়ালার হাত দাবানো শুরু করেছেন আর বলেছেন: আপনি ব্যথা পাননি তো?

যাই হোক, এই হল বুযুর্গানে দীনের নানা রং, নানা পদ্ধতি, এবং প্রত্যেকটিই জায়েয পদ্ধতি ছিল। প্রথম পদ্ধতিও জায়েয কেননা সমান-সমান প্রতিশোধ নেয়া জায়েয আছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

অর্থাৎ 'জুলুমের বদলা হল সমপরিমাণ জুলুম'। (সূরা শূরা: ৪০)

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি– অর্থাৎ, ক্ষমা করাও জায়েয আছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অর্থাৎ, 'আর নিশ্চয়ই যে ধৈর্য ধারণ করল ও ক্ষমা করে দিল নিশ্চয়ই সেটা হিম্মতপূর্ণ কাজসমূহের মধ্যে একটি কাজ।' (সূরা শূরা আয়াত নং ৪৩)

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাসও এটা ছিল; তিনি ক্ষমা করে দিতেন। ব্যক্তিগত স্বার্থে তিনি কখনো প্রতিশোধ নেননি।

আর তৃতীয় পদ্ধতি এর চেয়ে বেশি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, নিজের চিন্তা না করে প্রহারকারীর চিন্তা করা।

সারকথা

মোটকথা! বান্দার হকের ব্যাপারটি বড় স্পর্শকাতর বিষয়। এ ব্যাপারে সব সময় খুব সতর্ক থাকা উচিৎ, যেন আমার দ্বারা কোন বাড়াবাড়ি হয়ে না যায়।

বর্তমানে মানুষ কত নির্দয়ভাবে নিঃসংকোচে মানুষের হক, তার জান-মাল ও আব্রুর উপর আক্রমন করে। ঐ জান-মাল ও আব্রু যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মুসলমানের জান-মাল ও আব্রু বাইতুল্লাহর থেকেও বেশি সম্মানিত। যদি কেউ মুসলমানের জান ও মালের উপর হামলা করে তবে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো যে কাবা শরীফ ধ্বংস করল। (নাউযুবিল্লাহ)

জনৈক ব্যক্তির ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি নিজ ঘটনা শুনাচ্ছিলেন। তিনি অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন। হাতে টাকার ব্যাগ ছিল, দুই সন্ত্রাসী রাস্তায় আসল প্রথমে পিস্তল দেখাল এবং একটি থাপ্পড় মারল, দু'টি গালী দিল এরপর বলল: 'যা কিছু আছে সেগুলো আমাদের কাছে দিয়ে দাও।'

তার মানে এরা শুধু সম্পদ নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং জান-মাল ও আব্রু তিনটির উপর এক যোগে হামলা করেছে!!

এটা এদের খেয়ালেই আসে না, আমরা একী কাজ করছি? তারা এটা চিন্তা করে না যে, অবশেষে একদিন আমাদেরকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। আর এই যে জীবন, জানা নেই কবে শেষ হয়ে যাবে? যে মানুষ আজ অন্যের বুকে পিস্তল ধরছে তার জীবনেরও কোন নিশ্চয়তা নেই। জানা নেই সকালে সে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে নাকি সন্ধ্যায়? এই পৃথিবী থেক বিদায় নেয়া নিশ্চিত। কিন্তু তারপরও মানুষ এসব কাজ করে!!

আল্লাহ তা'আলা এদের সকলকে হেদায়েত ও ফিকির দান করুন। এবং আমাদেরও হুকূকুল ইবাদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ, যেন আমার দ্বারা কেউ শারীরিক, অর্থনৈতিক কিংবা সম্মানে আঘাত না পায়। অন্য কেউ আমার দ্বারা কষ্ট পেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মাফ করানোর চিন্তা করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ জন্য তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

একুশতম মজলিস

অহংকারের একটি চিকিৎসা– নফসকে অপদস্থ করা

অহংকারের একটি চিকিৎসা– নফসকে অপদস্থ করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ- أَمَّابَعْدُ

আমিত্বের চিকিৎসা হল নফসকে অপদস্থ করা

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন: 'এই 'আমিত্ব' বিরাট প্রতিবন্ধক। নফসকে অপদস্থ করা ছাড়া এর চিকিৎসা হয় না।' (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫৯)

অর্থাৎ, অহংকারের আসল কারণ হল 'আমিত্ব'। আমিত্বের অর্থ হল: 'নিজেকে নিজে বড় মনে করা'। এর পরিণতিতে মানুষ চায় আমার সম্মান করা হোক। মানুষ আমাকে তা'যীম করুক, আমাকে বড় মনে করুক, আমার ইকরাম করুক!!

অতএব এই 'আমিত্বের' চিকিৎসা হল: এর বিপরীত বিষয় অবলম্বন করা। যার পন্থা এই যে, নফসকে একটু অপদস্থ করতে হবে। কেননা যখন এই নফসকে অপমান করা হবে তখন সে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় চলে আসবে। এটার নামই হল 'মুজাহাদা'। মুজাহাদার অর্থই হল: ঐ নফস যেসব ভারসাম্যহীন ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আনার জন্য এমন কোন কাজ করতে হবে, যা নফসের জন্য কষ্টকর। যখন সে ঐ সব কষ্টকর কাজগুলো করবে, তখন ধীরে ধীরে ভারসাম্যের উপর এসে যাবে।

মুজাহাদার হাকীকত

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব সাহেব নানূতবী রহ.-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! মুজাহাদার হাকীকত কি? আর মুজাহাদার

মধ্যে তো অনেক সময় জায়েয ও মুবাহ কাজও বর্জন করতে হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঐ কাজ কে হালাল ও জায়েয সাব্যস্ত করেছেন! কিন্তু এই জায়েয কাজগুলোকেও মুজাহাদার মধ্যে বর্জন করানো হয়!!

এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত নানূতবী রহ. একটি উদাহরণ পেশ করলেন এবং বললেন : এই দেখ! এটি একটি কাগজ। তুমি এর একটি কিনারা মুড়ে দাও। এখন এটাকে সোজা কর। কিন্তু এখন এটাকে সোজা করতে চাইলে সে সোজা হবে না। এটাকে সোজা করার পদ্ধতি হল: এটাকে বিপরীত মুখী মুড়তে হবে। এখন এটা সোজা হয়ে যাবে।

এরপর তিনি বললেন: এই যে আমাদের নফস, সেও গোনাহ ও ভারসাম্যহীনতার দিকে মুড়ে আছে, এটাকে সোজা করার চেষ্টা করলে সে সোজা হবে না। বরং এ তখনই সোজা হবে যখন একে তুমি বিপরীত দিকে মুড়ে দিবে। আর বিপরীত দিকে মুড়ে দেয়ার জন্য তার থেকে জায়েয ও বৈধ কাজও ছাড়িয়ে দিতে হয়। এরপর এই নফস ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে যাবে। এর নামই 'মুজাহাদা'।

খানার মধ্যে পানি মিলানো

সুতরাং সূফী হযরত সূফীয়ায়ে কেরামের কারো কারো ব্যাপারে একটি কথা বর্ণিত আছে, যে, তাঁরা নিজ মুরীদদেরকে বলেন: 'খানার মধ্যে পানি মিলিয়ে খাও', এ নির্দেশটি সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য নয়। বরং সাধারণ অবস্থায় তো নির্দেশ সেটাই যেটা কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

অর্থাৎ, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য খাও এবং সৎ কর্ম কর।'

(সূরা মুমিনূন : ৫১)

কিন্তু যেহেতু নফস ভুল পথে মুড়ে থাকে এজন্য তাকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আনার জন্য এমন সব মুজাহাদার প্রয়োজন, যাতে বৈধ অনেক কিছুও বর্জন করানো হয়।

'নফসের অপদস্ততা' আসল উদ্দেশ্য নয়

একই ব্যাপার নফসকে অপমান করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাধারণ অবস্থায় নিজ নফসকে অপদস্থ করা পসন্দনীয় নয়, নফসেরও একটি সম্মান আছে। এবং এ নফসও আল্লাহ্ তাআলার একটি দান। এ জন্য বিনা কারণে তাকে অপদস্থ করা পসন্দনীয় নয়। কিন্তু যখন নফস নিজেকে বড় আর অন্যান্যদেরকে ছোট মনে করা আরম্ভ করে, তখন এসব ব্যাধিকে খতম করার জন্য, কখনো কখনো নফসকে অপদস্থ করতে হয়। একে অপদস্থ করার জন্য হাযারাত মাশায়েখ বিভিন্ন তাদবীর বলে থাকেন। অবশ্য এই সব তাদবীর ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ: অনেক সময় নফসকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে নামাযীদের জুতা সোজা করানো হয়। মসজিদের বাইরে যে সব জুতা রাখা থাকে, প্রত্যেক নামাযের সময় সেগুলো সোজা করতে হয়। আবার অনেক সময় যার মধ্যে অহংকারের ব্যাধি আছে, তিনি নামাযের পরে মসজিদে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেন: ভাইসব! আমার মধ্যে অহংকারের ব্যাধি আছে, আপনারা দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমার থেকে অহংকারের এ ব্যাধি দূর করে দেন।

যখন অহংকারী ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করবেন, তখন তার মধ্যে আর অহংকারের ব্যাধি থাকবে কি ?

যিকির নিজেই মুখ্য উদ্দেশ্য

হযরত আল্লামা শিবলী রহ.-এর একজন মুরীদ ছিলেন। তিনি এসে বললেন : হযরত! আমি প্রচুর যিকির করি। কিন্তু যিকির দ্বারা সামান্য উপকারও হয় না। এমন মনে হচ্ছে যেন এই সব যিকির বেকার যাচ্ছে!!

এ কথাটি বুঝে নিন: এমনিতে তো যিকির কোন অবস্থাতেই বেকার যায় না, যদি সেটা ইখলাসের সাথে হয়। কিন্তু লোকজন যিকিরের পরে সেটার ফলাফল ও পরিণাম এর জন্য অপেক্ষমান থাকে!! এসব ফলাফল ও পরিণামের প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখা অনুচিৎ। আমাদের বুযুর্গানে দীনের অভিরুচি এমন ছিল না। বরং হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এবং হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর সিলসিলার অভিরুচি হল: যিকিরটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যিকিরের পরে সেটার ফলাফল ও পরিণাম-এর

অপেক্ষায় থাকা ঠিক নয়। বরং সরাসরি যিকিরকেই মাকসূদ মনে করে করতে থাকবে। 'কাইফিয়্যাত' বা বিশেষ অবস্থাসমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। কোন কাইফিয়্যাত সৃষ্টি হলে হবে। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে না।

'যিকির' দ্বারা মেকাবেলার শক্তি সৃষ্টি হয়

কাজেই ঐ মুরীদ যে বললেন: যে, যিকির দ্বারা উপকার হচ্ছে না। হতে পারে তাঁর যিকিরে ইখলাসের কমতি ছিল। কেননা যদি ইখলাস না থাকে তবে বাস্তবিক পক্ষে যিকির বেকার হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত: যিকিরের একটি উপকার এই যে, যিকির করার ফলে মানুষের মধ্যে গোনাহের চাহিদার সাথে মোকাবেলা করার শক্তি সৃষ্টি হয়। যদি কোন মানুষ যিকিরকারী হয়, তবে তার জন্য গোনাহসমূহের চাহিদার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ! শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল– এই গোনাহ কর। অথবা নফস তাকে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এ গোনাহটি কর। এখন সাধারণত: মানুষ নফস ও শয়তানকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে। বরং অনেক সময় তো এদের সামনে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যিকির মানুষের মধ্যে নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি সৃষ্টি করে দেয়।

আল্লাহর যিকির একটি চালিকা শক্তি

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব রহ. বলতেন: আল্লাহ তা'আলার এই 'যিকির' হল 'এনার্জি' বা শক্তি। কোন্ জিনিসের জন্য এনার্জি? নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবেলার জন্য 'এনার্জি'। কেননা যিকিরের একটি বড় উপকার এই যে, এর ফলে নফস ও শয়তানের সাথে লড়াই করা সহজ হয়ে যায়।

এজন্য হাযারাত মাশায়েখ হাযারাত বলেন: সকাল বেলা ফজরের পরে যিকির করুন। এমনিতে যে কোন সময় যিকির হতে পারে। কিন্তু ফজরের পূর্বে বা ফজরের পরে যিকির করার যে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, এর কয়েকটি কারণ আছে।

সকাল বেলা যিকির করার কারণ

একটি কারণ হল, আল্লাহ্ তা'আলা সকাল বেলায় প্রস্ফুটন ও বৃদ্ধির বিশেষ গুণ রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ: সকাল বেলায় ফুল প্রস্ফুটিত হয় কলিসমূহও সকাল বেলাতেই বিকশিত হয়। পাখ-পাখালী এসময় জেগে উঠে। এজন্য এ সময় কেউ যিকির করলে ঐ যিকির তার মধ্যে রূহানী প্রবৃদ্ধি ঘটাবে।

দ্বিতীয় কারণ হল, যখন মানুষ সকাল বেলা জাগ্রত হল, এখন কিছুক্ষণ পরই সে তার কর্মময় জীবনে প্রবেশ করবে, জীবন যুদ্ধে নামবে যেখানে পদে পদে তাকে নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবেলার সম্মুখীন হতে হবে।

কখনো দৃষ্টিকে নিষিদ্ধ স্থানে ব্যবহার করার বাসনা, আবার কখনো কানের দ্বারা অনুচিৎ কিছু শ্রবণের আগ্রহ, আবার কখনো হয়ত যবানকে ভুল স্থানে ব্যবহারের ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হবে!! এমনিভাবে আরো অনেক গোনাহের চাহিদা দিলের মধ্যে পয়দা হতে পারে। কেননা কর্মব্যস্ত এ জীবনে চতুর্দিকে শুধু গোনাহেরই আহবান। যেগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষ কে কুস্তি লড়তে হবে।

অহংকারের পরিণামে যিকির দ্বারা উপকার হয় না

অতএব যখন আপনি নফস ও শয়তানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ময়দানে নামছেন, তখন কিছু শক্তি সৃষ্টি করে নিন। আর এই শক্তি আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা পয়দা হবে। এজন্য বুযুর্গানে দীন বলেন: সকালে উঠে ফজর নামাযের পূর্বে বা পরে আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে নিন। যাতে নফস ও শয়তানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহজ হয়ে যায়। এটাও যিকিরের একটি বড় উপকারিতা।

সম্ভবত: আল্লামা শিবলী রহ.-এর এ মুরীদ এটা বলতে চাচ্ছিলেন যে, আমি যিকিরতো ঠিকই করছি কিন্তু এতদসত্ত্বে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারছি না।

উত্তরে আল্লামা শিবলী রহ. এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন : যিকিরের দ্বারা উপকৃত না হওয়ার কারণ হল অহংকার। কেননা যদি কোন মানুষের মধ্যে অহংকার থাকে তবে যিকিরের দ্বারা তার কোন উপকার তো হয়ই না বরং উল্টো ক্ষতি হয়!!

চিকিৎসা বিদ্যার একটি মূলনীতি

হযরত থানভী রহ. ব্যাপারটিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন : 'খামীরায়ে গাওযবান' অথবা 'খামীরায়ে মারওয়ারীদ' শরীরের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করার জন্য খাওয়া হয়। কিন্তু এগুলো ঐ সময়েই শক্তি সঞ্চার করবে, যখন মানুষের শরীরে কোন ব্যাধি না থাকে। কিন্তু যদি শরীরের মধ্যে কোন ব্যাধি থাকে, তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলনীতি হল: অসুস্থাবস্থায় শরীরে যে শক্তি পৌঁছবে সেটা ঐ রোগের প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ : যদি শরীরে শ্লেষ্মা তৈরী হতে থাকে, তবে ঐ সময় শক্তিবর্ধক জিনিস খেলে তার দ্বারা ঐ শ্লেষ্মাই তৈরী হবে। আর সেই খামীরা (হালুয়া বিশেষ) দ্বারা উপকারের পরিবর্তে উল্টো ক্ষতি হবে।

এ জন্যই সমস্ত ডাক্তার এ ব্যাপারে একমত যে, যখন মানুষের তবিয়তে ভারসাম্য না থাকে, তখন শক্তিবর্ধক জিনিস খাওয়া ক্ষতিকর। এমনিভাবে যদি কারো মধ্যে 'অহংকার'-এর ব্যাধি থাকে আর তার শায়খ তাকে যিকির এর কথা বলে, তবে এ ক্ষেত্রে যেহেতু পূর্বের থেকেই অহংকার বিদ্যমান এ জন্য এ যিকিরের পরিণামে আরো বেশি খান্নাসী উদ্যতভাব পয়দা হবে। বরং এখন এ জন্যও অহংকার পয়দা হবে যে, আমি তো অনেক বড় আবেদ-যাহেদও বটে!! এজন্য এ জাতীয় মানুষের চিকিৎসা অন্য পদ্ধতিতে করা হয়।

অহংকারের একটি চিকিৎসা

যাইহোক, হযরত শিবলী রহ. অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন এ বেচারা 'অহংকারে' আক্রান্ত। এ কারণেই যিকিরের দ্বারা তার উপকার হচ্ছে না।

এ জন্য হযরত চিন্তা করলেন প্রথমে তার অসুস্থতার চিকিৎসা করা উচিৎ। সে হিসেবে তিনি ঐ মুরীদকে বললেন: আচ্ছা তুমি আখরুটের একটি টুকরী মাথায় নিয়ে অমুক মহল্লায় চলে যাও এবং ঘোষণা কর: যে আমাকে একটি থাপ্পড় মারবে! তাকে একটি আখরুট দেয়া হবে!!

ঐ মুরীদ এ কথা শুনে বলল: 'আল্লাহু আকবার' আমি এ কাজ করব'?

আল্লামা শিবলী রহ. বললেন : কমবখত! এটা আল্লাহর ঐ নাম, যদি শত বছর বয়সী কাফেরও এটা বলে; তবে মুসলমান হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু তুমি যে ক্ষেত্রে এ নামটি প্রয়োগ করেছ, এর দ্বারা তুমি কাফের হয়ে গেলে, কেননা 'আল্লাহু আকবার' বলে তো মহান আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব বয়ান করা হয়। অথচ তুমি এ শব্দটিকে নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করলে। কেননা তোমার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহু আকবার! আমি এত বড় মানুষ! আমার এত উচ্চ মর্যাদা!! আর আমি এ কাজ করব (?) যে, মানুষের সামনে এ কথা ঘোষণা করব: 'যে আমাকে একটি থাপ্পড় দিবে, আমি তাকে একটি আখরুট দিব।'

অতএব যেহেতু তুমি এ বাক্যটি নিজ বড়ত্ব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছ, এজন্য তোমার ব্যাপারে কুফরের আশংকা হচ্ছে।

নিজের পক্ষ থেকে চিকিৎসা ঠিক করবেন না

যাইহোক। হযরত থানভী রহ. বলছেন: অনেক সময় নফসকে সামান্য অপদস্থ করে ঐ 'আমিত্ব'-এর চিকিৎসা করতে হয়। অবশ্য নফসকে অপদস্থ করণ ব্যক্তি বিশেষে যার যার অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্য কেউ কখনো নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন না। কেননা এর দ্বারা অনেক সময় ক্ষতি হয়।

অনেক সময় তো নফসকে শাস্তি দেয়ার জন্য সামান্য একটি অস্ত্রই যথেষ্ট হয়ে যায়। কেননা সম্ভ্রান্ত মানুষের জন্য সামান্য জুতার কাঁটাই যথেষ্ট। কথার মা'মূলী চাবুকই যথেষ্ট হয়ে যায়। এবং এর দ্বারাই তার সংশোধন হয়ে যায়। তার অহংকার দূরীভূত হয়ে যায়।

কাজেই যখন কেউ জানতে পারল যে, নামাযীদের জুতা সোজা করা নফসকে অপদস্থ করার একটি মাধ্যম, যদ্দরূন সে নিজেই আপন মর্জি মাফিক এ চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল!!

মনে রাখবেন। এমনটি করা অনুচিৎ। বরং নিজ রূহানী চিকিৎসক ও শায়খের বাতলানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা উচিৎ। তিনিই ভাল বলতে পারবেন এ ব্যক্তির জন্য কোন পদ্ধতি বেশি উপকারী হবে।

অহংকারের কারণ– আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব অন্তরে না থাকা

একটি বাণীতে হযরত থানভী থানভী রহ. ইরশাদ করেছেন:

> 'আমাদের মধ্যে অহংকার ঐ সময় পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব দিলের মধ্যে না আসে। আর যদি আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব দিলের মধ্যে এসে যায় তবে তার অবস্থা হবে এমন:
>
> چوں سلطان عزت علم بر کشد ☆ جہاں سر بجیب عدم در کشد
>
> অর্থাৎ,যখন বাদশাহ ইযযতের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন। তখন সমস্ত জগৎ তার সামনে মাথা নত করে। (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫৯)

অহংকারের ফাসাদ এই কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেহেতু এখনো পর্যন্ত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বড়ত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়নি। এজন্য সে নিজেকে বড় মনে করে। যদি আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব অন্তরে থাকত তবে সে নিজেকে কীভাবে বড় মনে করতে পারে? তখন তো সে নিজেকে মাছির পাখার সমানও মনে করে না।

কাজেই দিলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব যত কম থাকবে, তত বেশি দিলের মধ্যে অহংকার হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব দিলের মধ্যে যত বেশি হবে তত বেশি অহংকার কমতে থাকবে।

সুতরাং এই অহংকারের চিকিৎসা হল: মানুষ সব সময় আল্লাহ তা'আলার সুমহান মর্যাদা বড়ত্বের কল্পনা ও তাঁর ধ্যান করবে। তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত, তাঁর কামেল ইলম ও মুকাম্মাল রহমতের কথা চিন্তা করবে, এর দ্বারা অন্তর থেকে অহংকার দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বাইশতম মজলিস

রামাযানের জন্য নেক আমলকে বিলম্বিত করা

রামাযানের জন্য নেক আমলকে বিলম্বিত করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ- أَمَّابَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ! 'তাকাব্বুর' বা অহংকার সংক্রান্ত হযরত থানভী রহ. এর যেসব বাণী ছিল, প্রয়োজন অনুপাতে সেগুলোর বয়ান পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন রামাযানুল মুবারক শেষ হতে আর মাত্র একদিন বাকী আছে। রামাযানুল মুবারকের ব্যাপারে হযরত থানভী রহ.-এর একটি বাণী উল্লেখিত আছে। আমার খেয়াল হল আজ এটাকেই বয়ান করে দেয়া। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

রামাযান পর্যন্ত আমলকে বিলম্বিত করা

হযরত থানভী রহ. বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট নেক কাজকে বিলম্বিত করা কাম্য নয়। বরং নেক কাজে দ্রুতগতিতা ও পরস্পরে প্রতিযোগিতা কাম্য। তাইতো ইরশাদ হচ্ছে–

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ, 'কাজেই তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও'। (সূরা বাকারা: ১৪৮)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ ,'এবং তাঁরা সৎ কাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে'। (সূরা আলে ইমরান -১১৪)

এমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

হাদীস تضاعف ثواب في رمضان বা রামাযান মাসে সাওয়াব বাড়িয়ে দেয়া হয় এর মর্ম হল تعجيل اعمال في رمضان বা রামাযানে আমলসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করা تاخير اعمال إلى رمضان বা রামাযান পর্যন্ত আমলসমূহকে বিলম্বিত করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যদি কারো যাকাতের সাল ২৮ শে শাবান পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে ২৮ শে শাবান যাকাত আদায় না করে রামাযানের জন্য তাকে মূলতবী রাখাটা দীনের সহীহ্ বুঝ না থাকা এবং শরীয়তপ্রণেতার উদ্দেশ্য না বুঝার প্রমাণ বৈকি।

আরে ভাই! তোমার কী খবর! মিসকীনদের কী অবস্থা যাচ্ছে? তুমি তো পহেলা রামাযানের অপেক্ষা করছ আর ওদিকে ঐ গরীব বেচারার রূহ এক এক মুহূর্তের প্রহর গুনছে!!

এতদ্ব্যতীত রামাযানে সাওয়াবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু নেক কাজে তাড়াহুড়া ও প্রতিযোগিতার দ্বারা সাওয়াবের মাণ বেশি হয়। বলা বাহুল্য পরিমাণের তুলনায় মাণ-মর্যাদাই বেশি কাম্য। এর দৃষ্টান্ত উলামায়ে কেরামের লেখায়ও পাওয়া যায়।

তাঁরা লিখেন : হাদীসে পাকে আছে : মহল্লার মসজিদে নামায পড়লে ২৫ নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। আর জামে মসজিদে ৫০০ নামাযের। কিন্তু তাই বলে মহল্লাবাসীদের জন্য মহল্লার মসজিদ ছেড়ে জামে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা জায়েয নেই। তারা এমনটি করলে গোনাহগার হবে। এর কারণ হল: জামে মসজিদে নামাযের সাওয়াবের পরিমাণ বেশি। কিন্তু মহল্লার মসজিদের সাওয়াবের মাণ (মর্যাদাগত) ভাবে বেশি। কেননা ঐ মসজিদ আবাদ করা তার যিম্মায় ওয়াজিব। বিধায় মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করলে নামাযের সাওয়াবের পাশাপাশি মসজিদ আবাদ করার সাওয়াবও হবে। পক্ষান্তরে জামে মসজিদে নামায আদায় করলে মসজিদ আবাদ করার সাওয়াব পাবে না. কেননা এই মসজিদ আবাদ

করা তো আর তার যিম্মায় ওয়াজিব নয়। বরং জামে মসজিদের মহল্লার অধিবাসীদের উপর জামে মসজিদ আবাদ করা ওয়াজিব।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল, সেটার পরিশিষ্ট হিসেবে এটাও বুঝে নিন যে, ঐ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মিসকীন এর কোন গতি হয়েছে, তাঁর দু'আ আরশের কত উপরে উঠবে! আর সেই দু'আ দ্বারা আপনার কত কিছু হাসিল হবে!

আচ্ছা মেনে নিন ঐ সময় রামযান থেকে সওয়াব কমই হল। কিন্তু আপনার নিকট রামযান পর্যন্ত জীবিত থাকার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? যদি আপনি বলেন যে, আমি ওসীয়ত করে যাব রামযানে এত এত ... অর্থ দিয়ে দিও। তবে মনে রাখবেন: ওসীয়্যতের সাওয়াব কিন্তু নিজ হাতে দানের সমান হতে পারে না, উপরন্তু আপনার ওয়ারিস যে আপনার সেই ওসীয়ত পূর্ণ করবে সেটারও কোন নিশ্চয়তা আছে কি? (আনফাসে ঈসা)

মানুষের একটি ভুল

এই বাণীটিতে হযরত থানভী রহ. খুব সুন্দর মূলনীতি সুলভ একটি কথা বলে দিয়েছেন, যেটা অনেক সময় ভুল বুঝা-বুঝির কারণ হয়ে থাকে। এজন্যই অনেক মানুষকে দেখা যায় তাদের উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও রামযানের জন্য অপেক্ষায় থাকেন যে, রামযান আসলে যাকাত দিব।

অথবা কিছু সদকা করার নিয়ত আছে, কিন্তু অপেক্ষায় থাকেন, যখন রামযান আসবে তখন সদকা দিব। যেহেতু হাদীসে পাকে আছে রামযানে নফল ফরযতুল্য হয়ে যায় আর ১টি ফরয ৭০টি ফরযের সমান হয়ে যায়।

এ হাদীসের কারণে লোকজন যাকাত সদকা ইত্যাদি আদায়ের ক্ষেত্রে রামযান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন যে, রামাযান আসলে আদায় করব!!

সাওয়াব বৃদ্ধি বিষয়ক হাদীসের প্রকৃত মর্ম

হযরত থানভী রহ. দু'টি শব্দে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল: রামযানের মধ্যে আমলসমূহ দ্রুত পালন করা, রামযান পর্যন্ত আমলসমূহ বিলম্বিত করা উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ, এ হাদীসের মর্ম হল: রামযানে যখন নেক কাজের সাওয়াব এত বেশি আর আপনার অন্তরে কোন নেক কাজের খেয়ালও আসবে,তাহলে ঐ নেক কাজটাকে এখনই রামযানের মধ্যেই করে ফেলুন। এ ক্ষেত্রে টালবাহানা করবেন না। যে, রামযানে তো নেক কাজের সাওয়াব বেশি। কাজেই হাদীসের মর্ম এটা নয় যে, যদি রামযানের পূর্বে কোন নেকীর খেয়াল এসে থাকে তবে সেটাকে রামযানের আগমনের অপেক্ষায় বিলম্বিত করে দেয়া হবে। যেহেতু রামযানে সাওয়াব বেশি!! বরং যখন যে নেকীর খেয়াল আসে, চাই সেটা নফল হোক বা ফরয তখনই সেটা আদায় করে ফেলুন।

নেক কাজে দ্রুততা কাম্য

এর প্রমাণস্বরূপ হযরত থানভী রহ. বলেন: কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে এ নির্দেশ এসেছে :

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ

অর্থাৎ 'আর তোমরা তোমাদের প্রভুর মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাও।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡرَاتِ

অর্থাৎ, 'অতএব তোমরা সৎ কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে এগিয়ে যাও।' (সূরা বাকারা-১৪৮)

এখন কুরআনে কারীম তো আমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি যখন রামযান আসবে তখন এ আমল করব!! এটা কুরআন-সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা ভাবনা।

যাকাত কখন ওয়াজিব হয়?

বিশেষ করে যাকাতের মাসআলায় লোকজন খুব বেশি ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে থাকেন। তাদের বক্তব্য হল: আমরা কেবল রামযানেই যাকাত আদায় করব। চাই তাদের যাকাতের সাল রবিউল আউয়াল মাসেই পূর্ণ হয়ে যাক না কেন?!! খুব ভাল ভাবে বুঝে নিন! প্রত্যেক মানুষের জন্য যাকাত আদায় করার তারিখ সেটাই, যে তারিখে সে প্রথমবার সাহেবে নেসাব হয়েছে। এরপর যখন আগামী বৎসর ঐ তারিখ ফিরে আসবে তখন ঐ দিনই তার উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ: জনৈক ব্যক্তি পহেলা রবিউল আউয়াল যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে, এক্ষেত্রে আগামী বৎসর পহেলা রবিউল আউয়ালেই তার উপর যাকাত ফরয হবে। এখন এ ব্যক্তিকে আগামীতে সব সময় পহেলা রবিউল আউয়ালেই নিজ যাকাতের হিসাব করতে হবে। এমনটি যেন না হয়, আপনি ছাহেবে নেসাব হলেন পহেলা রবিউল আউয়ালে আর যাকাতের হিসাব করলেন পহেলা রামাযানে! এ পদ্ধতি টি সঠিক নয়।

যাকাতের হিসাব করার ক্ষেত্রে ভুল

কিন্তু আজকাল লোকজন দু'টি ভুল খুব বেশি করে। একটি এই যে, অনেক মানুষ হিসাব করার তারিখ নির্ধারণে ভুল করে। উদাহরণস্বরূপ: ছাহেবে নেসাব হওয়ার তারিখ ছিল পহেলা রবিউল আউয়াল, কিন্তু সে ব্যক্তি নিজে নিজেই যাকাত এর হিসাবের জন্য পহেলা রামাযানকে নির্দিষ্ট করল! যদ্দরুন সমস্ত হিসাব ওলট পালট হয়ে যায়। কেননা যখন আপনার যাকাত ফরয হওয়ার তারিখ ছিল পহেলা রবিউল আউয়াল ঐ দিনতো আর আপনি হিসাব করেননি। এরপর ঐ পয়সাগুলো আপনি খরচ করছিলেন ইত্যবসরে পহেলা রামযান এসে গেল, ততদিনে আপনার অর্ধেক অর্থ খরচ হয়ে গেছে! এখন আপনি যাকাত এর হিসাব করতে বসেছেন!! যার অর্থ হল: আপনার অর্ধেক অর্থের হিসাবই হয়নি!!

একটি উদাহরণ

মনে করুন পহেলা রবিউল আউয়াল আপনার যাকাতের সাল পূর্ণ হয়েছে। ঐ সময় আপনার নিকট এক লক্ষ টাকা ছিল। তাহলে আপনার উপরে এক লক্ষ টাকার যাকাত হিসেবে আড়াই হাজার টাকা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যেহেতু আপনি পহেলা রবিউল আউয়াল হিসাব করেন নি, এমনকি রামাযানুল মুবারক এসে গেছে; আর এ সময় পর্যন্ত আপনি সেই এক লক্ষ টাকার মধ্য থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন ফলশ্রুতিতে এখন পহেলা রামাযানে আপনার নিকটে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে আর এ দিন আপনি যাকাতের হিসাব করে পঞ্চাশ হাজার টাকার যাকাত সাড়ে বারশত টাকা আদায় করে দিলেন। আর এভাবে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা– যা আপনি খরচ করেছেন, সেটার না আপনি সেটার হিসাব করেছেন আর সেটার যাকাত আদায় করেছেন, অথচ ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরেও যাকাত ফরয ছিল কিন্তু আপনি তো ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার হিসাবই করেননি। অথচ যদি হিসাব করা থাকত তবে এটার আশা থাকত যে, চলো এখনো তো যাকাত আদায় করেনি, কিন্তু আগামীতে কোন এক সময় যাকাত আদায় করবে। কিন্তু যখন হিসাবই করেননি তখন আগামী জীবনে আদায় করার দ্বারাও সেটার ক্ষতিপূরণ হবে না।

ব্যাপারটি বড়ই স্পর্শকাতর। যে তারিখে মানুষ ছাহেবে নেসাব হয় আগামী প্রতি বছর ঐ তারিখেই হিসাব করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে ভুল করার দ্বারা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়।

যাকাতের অর্থ আটকে রাখা

অনেক মানুষ এমন আছেন যারা হিসাব তো সঠিক তারিখেই করেন। উদাহরণস্বরূপ : পহেলা রবিউল আউয়ালেই হিসাব করে ফেলেছেন আর নিজের কাছে লিখে রেখেছেন যে, আড়াই হাজার টাকার যাকাত আমার উপর ফরয। আর ঐ অর্থ পৃথক করে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ অর্থ এ জন্যই আটকে রেখেছেন যে, রামযান মাস আসলে যাকাত আদায় করব। কেননা রামযানে সত্তর গুণ সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। এজন্য ঐ সময় আদায় করব।

হযরত থানভী রহ. এ বাণীতে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করছেন যে, এটা মারাত্মক একটি ভুল।

যাকাতের সম্পদে মিসকীনের হক সম্পৃক্ত হয়ে গেছে

এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল: এই যাকাত মিসকীনের হক। যে সময় আপনার উপর যাকাত ফরয হয়েছে। এরপরে ঐ যাকাতের অর্থে আপনার কোন হক আর অবশিষ্ট থাকেনি।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

অর্থাৎ,'তাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিত প্রত্যেকেরই হক আছে।' (সূরা যারিয়াত-১৯)

সুতরাং, যেহেতু এটা মিসকীনের হক, অতএব এটা এক হিসেবে আপনার উপর করয ও ঋণ। এজন্য আপনার করণীয় হচ্ছে: সাথে সাথে সেটা পাওনাদার পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। বিলম্ব করা ঠিক নয়।

মিসকীনের অভাব আর তোমাদের প্রাচুর্য

দ্বিতীয়ত: আপনাদের প্রাচুর্য আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বলছে: সত্তরগুণ সাওয়াব লাভ করা দরকার। অথচ মিসকীন এবং যাকাতের উপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তি অনাহারে অর্ধাহারে দিক কাটাচ্ছে, তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাজেই এদেরকে সময় মত যাকাত পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়।

পরিমাণ ও মাণের মধ্যে পার্থক্য

হযরত থানভী রহ. তৃতীয় যে কথাটি বলেছেন, সেটা হল: হাদীস শরীফে এসেছে: রামাযানুল মুবারকে সত্তর গুণ সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে, এটা হল গাণিতিক হিসাব। কিন্তু আরেকটি বিষয় আছে যাকে 'কাইফিয়ত' (মান) বলা হয়। এর মর্ম হল: অনেক সময় কোন জিনিসের পরিমাপ তো বেশি হয় না ঠিক কিন্তু তার কাইফিয়ত বা মান বেশি হয়।

বর্তমানে কাইফিয়ত কে 'কোয়ালিটি' আর কাম্মিয়ত কে 'কোয়ানটিটি' বলে।

উদাহরণস্বরূপ : জনৈক ব্যক্তির নিকট দশ থান কাপড় আছে। কিন্তু সেটা নিম্ন মানের। আর অন্য একজনের নিকট মাত্র এক থান কাপড় আছে কিন্তু সেটা হল মখমলের।

এখন সংখ্যা বা পরিমাপগত: দিক দিয়ে যদিও প্রথম ব্যক্তি উত্তম। কিন্তু কোয়ালিটি বা মানের বিচারে দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তম।

একটি উদাহরণ

দেখুন! বিড়ালের এক সাথে বেশ কয়েকটি বাচ্চা হয়। অথচ বাঘিনীর মাত্র একটা বাচ্চা হয়। একবার বিড়াল বাঘিনীকে বলল: তুমি বনের রাণী ঠিক কিন্তু তোমার সন্তান মাত্র একটি!! আর আমি তো প্রতি বছর ডজন খানেক বাচ্চা জন্ম দেই। বাঘিনী বলল: খালাজান! তোমার সবগুলো বাচ্চা হল বিড়াল অথচ আমার একটা মাত্র বাচ্চা হলে কি হবে, সে তো বাঘ!!

সুতরাং সংখ্যা হিসেবে যদিও বিড়ালের বাচ্চা বেশি, কিন্তু মর্যাদা ও শক্তির বিচারে বাঘের একটি বাচ্চাই বিড়ালের সমস্ত বাচ্চার জন্য যথেষ্ট।

এজন্য পরিমাণগত: বৃদ্ধি অনেক সময় অতটুকু উপকার দেয় না যতটুকু উপকার মানগত: বৃদ্ধি দিয়ে থাকে।

এমনিভাবে আপনি রামযানে যাকাত আদায়ের জন্য ঐ অর্থ আটকে রেখেছেন, যাতে সত্তর গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। অথচ এটা হল গণনার বিচার মাত্র। কিন্তু যদি আপনি সময় মত কোন অভাবগ্রস্তের অভাব পুরো করেন এবং এর দ্বারা তার উপকার হয়, তবে এ ক্ষেত্রে যদিও সাওয়াবের পরিমান কম কিন্তু এ সাওয়াবের মাণ অনেক বেশি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

মহল্লার মসজিদ ছেড়ে জামে মসজিদে নামায পড়া

এরপর হযরত থানভী রহ. ব্যাপারটাকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন : মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করার দ্বারা পচিশ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় আর জামে মসজিদে নামায পড়ার দ্বারা পাঁচশতগুণ

সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু শরীয়তের নির্দেশ হল: মহল্লার মসজিদে নামায পড়ো, কেননা মহল্লার মসজিদকে আবাদ করা তোমার দায়িত্ব। যেহেতু তুমি মহল্লার বাসিন্দা। এখন যদি সমস্ত মহল্লার অধিবাসীরা পাঁচশত গুণ নামাযের সাওয়াব লাভ করার জন্য জামে মসজিদে চলে যায় আর মহল্লার মসজিদ খালী হয়ে যায় তবে তারা গোনাহগার হবে।

সুতরাং যদিও সাওয়াবের গাণিতিক (এবং পরিমাণের) বিচারে জামে মসজিদে নামায আদায়ের সাওয়াব বেশি। কিন্তু মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব মানের দিক দিয়ে বেশি, এজন্য সংখ্যা গণনার চক্করে পড়ে মাসনূন ইবাদতকে বর্জন করা কাম্য নয়।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর একটি উক্তি

হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. 'আপবীতী' গ্রন্থে হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.-এর চমৎকার একটি উক্তি নকল করেছেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বিতরের পরের দুই রাকাত নফল নামায বসে পড়তেন, অথচ সমস্ত হানাফী ফকীহ বলছেন : বিতরের পরের দু রাকাতও দাঁড়িয়ে পড়াই উত্তম। কেননা দাঁড়িয়ে পড়লে সাওয়াব বেশি হয়। আর বসে পড়লে সাওয়াব অর্ধেক হয়।

কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের পরের দুই রাকাত বসে বসে আদায় করতেন।

ফুকাহায়ে হানাফিয়্যাহ বলেন: যেহেতু বসে পড়া জায়েয ছিল, এজন্য এটার বৈধতা বুঝানোর জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু' রাকাত বসে পড়েছেন। কিন্তু মূলনীতি সেটাই। অর্থাৎ, দাঁড়িয়ে নামায পড়লে পূর্ণ সাওয়াব, আর বসে নামায পড়লে অর্ধেক সাওয়াব হবে।

কেউ একজন হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. কে বললেন : হযরত! কিতাবের মধ্যে তো এমনটি লিখেছে: দাঁড়িয়ে নামায পড়লে সাওয়াব বেশি। কিন্তু আপনি দেখি সব সময় এ নামায বসে আদায় করেন!

প্রতিউত্তরে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বললেন: কথাতো ঠিক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পড়েছেন ঐভাবে পড়তে আমার মনে বেশি আনন্দ লাগে। অর্থাৎ, পরিমানগত: দিক দিয়ে সাওয়াব যদি কম হয় হোক, কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়েছেন, ঐভাবে নামায পড়লে সাওয়াবের মান উচ্চ পর্যায়ের হবে।

এজন্য বহু স্থানে সংখ্যার গণনা দেখা হয় না বরং সেটার মান-মর্যাদা দেখা হয়। এ জন্য সময়ের দাবীতে যখন যে আমলের সুযোগ হয় সেটাই করে ফেলুন। ঐ আমলকে সত্তরগুণ বৃদ্ধির চক্করে পড়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া দীনী বুঝের কথা নয়।

রামযান পর্যন্ত জীবিত থাকার গ্যারান্টি আছে কি?

এরপরে আপনাদের কাছে কী গ্যারান্টি আছে যে আপনারা আগামী রামযান পর্যন্ত জীবিত থাকবেন? রামযানের পূর্বেই যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ডাক আসবে না, তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? আর যদি এমন খেয়াল থাকে যে, আপনি যাকাত আদায়ের ব্যাপারে আপনার ওয়ারিসদেরকে ওসীয়্যত করে যাবেন, তাহলে ভাই! এটার কী ভরসা আছে যে, ওয়ারিসরা সেটা অবশ্যই আদায় করবে? এ জন্য রামযানের প্রতীক্ষায় থেকে কোন নেক কাজে গড়িমসি করবেন না। বরং যখন যেটা সময়ের দাবী, তখন সেটা করে ফেলবেন।

সময়ের চাহিদার উপর আমল করাই দীন

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব রহ. বলতেন: সময়ের চাহিদানুযায়ী আমল করার নাম হল দীন। তুমি এটা দেখবে: এ সময় দীন আমার নিকট কী কামনা করে? দীন যেটা কামনা করে সেটা করে ফেল।

উদাহরণস্বরূপ: পিতা অসুস্থ। আর তুমি ছাড়া তাঁর দেখার কেউ নেই। এখন তুমি যদি ঘর ছেড়ে পাঁচ মিনিটের জন্যও বাইরে যাও তবে তোমার আব্বার কষ্ট হবে। এমতাবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলে সময়ের তাকাযা

হল মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা। আর জামাআতের সাথে নামায আদায় করার সাওয়াবতো সাতাইশ গুণ আছেই। কিন্তু নামাযের সময় পিতা বলছে: 'আমার শরীরটা ভাল লাগছেনা। আজকে তুমি মসজিদে যেওনা, ঘরেই নামায পড়।' এখন সময়ের চাহিদা হল: ঘরেই নামায আদায় করে নেয়া। পিতার খেদমত করা। আর ঐ জামাআতের সাতাইশ গুণ সাওয়াব ছেড়ে দেয়া। কেননা এ সময় এটাই সময়ের দাবী।

স্বীয় শখ পূর্ণ করার নাম দীন নয়

আমার শায়খ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব রহ. খুব সুন্দর একটি কথা বলতেন: 'স্বীয় শখ পূর্ণ করার নাম দীন নয়।' উদাহরণস্বরূপ: শখ হল প্রথম কাতারে নামায পড়ব, এদিকে পিতা ঘরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁকে মৃত্যুপথযাত্রী অবস্থায় রেখে নিজ শখ পূরা করার জন্য সবার পূর্বে মসজিদে প্রথম কাতারে পৌঁছে গেছো ! এটা দীন নয়। বরং এ সময়ের দাবী হল: প্রথম কাতার ছাড় এবং পিতার খেদমত কর।

যাইহোক! সময়ের দাবী অনুযায়ী আমল করার নাম হল দীন। আপনাকে দেখতে হবে সময় এ মুহূর্তে আমার কাছে কী চাচ্ছে? তার সেই চাওয়া পূর্ণ করুন।

নেক কাজ কি রামযানের সাথেই সংশ্লিষ্ট?

হযরত থানভী রহ. এ বাণীতে যাকাত সংক্রান্ত একটি মূলনীতি বয়ান করেছেন। কিন্তু এটা শুধু যাকাতের সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং এ মূলনীতি সমস্ত আমলের মধ্যেই প্রযোজ্য।

আমরা রামযান মাসে তো আমলের ব্যাপারে কম বেশি যত্নবান থাকি, তাই দেখা যায় যত নেক কাজ আছে সবগুলো আমরা রামযানের জন্য বরাদ্দ করে রাখি! নফল পড়ব তো রামযান মাসে। তিলাওয়াত করব তো রামযান মাসে! রাত্রে উঠব তো রামযান মাসে। ইশরাক-চাশত ইত্যাদি নফল নামায পড়ব তো রামযান মাসে। এভাবে আমরা সমস্ত কাজ রামযানের জন্য উঠিয়ে রাখি!! আর এদিকে যেই নাকি রামযান মাস শেষ হল ঐ দিকে সমস্ত

আমলও খতম! এখন তিলাওয়াতও নেই, যিকিরও নেই নফল নেই, আল্লাহর স্মরণও নেই, গোণাহসমূহ থেকে বাঁচার গুরুত্ব নেই।

পবিত্র রামযানে অবশ্য গোনাহ করতে কিছুটা হলেও লজ্জা লাগে। রামযান মাস। নজর, কান, মুখ ইত্যাদির হিফাযত করা দরকার। কিন্তু রামযান শেষ হওয়া মাত্রই গোনাহগুলো ছাড়া পেয়ে যায়। এখন না আছে গোনাহ থেকে বাঁচার ইহতিমাম আর না আছে রামাযানের নেক আমলগুলো ধরে রাখার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ?

রামাযান হল একটি প্রশিক্ষণমূলক কোর্স

আল্লাহ তা'আলা রামযানকে একটি প্রশিক্ষণমূলক কোর্স বানিয়েছেন। যখন আপনি এ প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা রোযা, তারাবীহ, ই'তিকাফ, যিকির, তাসবীহ ও তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে আপনার অন্তরকে আলোকিত করে দিলেন, তখন সেই অবস্থাটা ধরে রাখা আপনার কাজ। অতএব রামযানের পরে যখন আপনি স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করবেন তখন ঐ স্পৃহাকে অটুট রাখা সেটা কিন্তু আপনারই দায়িত্ব।

অন্তরকে গুনাহের চিহ্ন থেকে বাঁচান

দেখুন! একটি সাদা কাপড়। যা ধোপার কাছ থেকে সদ্য ধৌত অবস্থায় এসেছে। যদি এর উপর সামান্য দাগও লাগে তবে সেটা পরিদৃশ্য হবে, এমনিভাবে পবিত্র রামযানে আপনার অন্তর গোনাহসমূহ থেকে ধুয়ে মুছে একদম পরিস্কার হয়ে গেছে। এখন এই অন্তরকে গোনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করুন। যাতে এই পরিচ্ছন্ন অন্তরে গোনাহের দাগ লেগে না যায়। এ থেকে অন্তরকে বাঁচান।

রামাযানের পরে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখুন

আর পবিত্র রামযানে আল্লাহ তা'আলা যেসব ইবাদতের তাওফীক দিয়েছিলেন, এখন রামযানের পরে পুরোপুরি ঐ পরিমাণে না হলেও কিছু অংশ তো অবশ্যই অবশিষ্ট থাকা চাই। পবিত্র রামযানে তিলাওয়াতের তাওফীক হয়েছিল, এখন কোন সে কারণে পুরো বৎসর কুরআনে কারীম বন্ধ

অবস্থায় পড়ে থাকে? এর অর্থতো এটাই হল যে, কুরআনে কারীম শুধু রামাযানের জন্যই রাখা হয়েছে!!

বিধায় মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যেন রামযানের পরেও কোন দিন কুরআন তিলাওয়াত বাদ না যায়। নতুবা এটা কোন ভাল কথা নয় যে, রামযানে খুব কুরআন তিলাওয়াত করব এরপরে কুরআন উঠিয়ে তাকের উপর রেখে দিব। এরপরে যখন আবার রামযানের চাঁদ দেখা যাবে ঐ সময় পুনরায় কুরআন শরীফ ধরবো!! এটা বড়ই বঞ্চনার কথা। সুতরাং দৈনিক কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

রামযানের পরেও ইবাদাতের উপর অটল থাকুন

রামযানুল মুবারকে আলহামদু লিল্লাহ জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ইহতিমাম করা হয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখন থেকে আগামী বছর পর্যন্ত মসজিদ থেকে ছুটি নিয়ে নিলাম। বরং এই চেষ্টা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আগামীতেও জামাআতের সাথে নামায আদায় করার তাওফীক দান করেন।

আল্লাহ তাআলা যেসব ফরয-ওয়াজিব আমার আপনার দায়িত্বে দিয়েছেন, সেগুলোর কোনটিই এমন নেই যেগুলো করা আমাদের জন্য মুশকিল কিংবা অসম্ভব। এমনটি হলে আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন কেন? কাজেই যত কাজ আছে, চাই ফরযসমূহ পালন করা হোক কিংবা গোনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা হোক, এসবই আমাদের সাধ্যে ও ইখতিয়ারভুক্ত। যে কাজ আমাদের ইখতিয়ার বহির্ভূত, সেটা আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরযই করেন নি। আসল প্রয়োজন শুধু হিম্মতের। আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিম্মতের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি রেখেছেন। এই হিম্মতকে ব্যবহার করে নিজ ভবিষ্যত জীবনকেও আল্লাহ তা'আলা ও শরীয়তের আহকাম অনুযায়ী অতিবাহিত করুন।

সকাল বেলা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব রহ. বলতেন: সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায পড়ার পর তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে একটি অঙ্গীকার করো, সেটা হল এই :

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আমার নামায ও আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।'

(সূরা আনআম : ১৬২)

কাজেই, হে আল্লাহ! আজকের দিনে আমি যত কাজ করব, আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করব। এমনকি খানা খাব, রুযী উপার্জন করব, ঘরে প্রবেশ করব, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথা বলব, ঘুমাব ... এসব কিছু আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করব। সকালে উঠে আল্লাহ পাকের সাথে এই অঙ্গীকার কর। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট বল : হে আল্লাহ! আমি এ জন্যই খানা খাচ্ছি, যেহেতু আপনি আমার উপর স্বাস্থ্যের হক রেখেছেন। অনুরূপভাবে আমার ঘুমানো, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথাবার্তা, রুযী উপার্জন ইত্যাদি সবকিছু এজন্যই যে, আপনি আমার উপর আমার নফসের হক রেখেছেন। যখন এই নিয়্যতে এসব কাজ করবে, তখন এগুলোই ইবাদতে পরিণত হবে।

অঙ্গীকারের উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট এভাবে দু'আ কর 'হে আল্লাহ! আপনার সাথে আমি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি, আপনার পক্ষ থেকে তাওফীক ব্যতীত আমি এ অঙ্গীকারের উপর কায়েম থাকতে পারব না। এ জন্য আমি যাতে আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারি সে তাওফীক আপনিই আমাকে দান করুন।'

এ অঙ্গীকার ও দু'আর পরে কর্মজীবনে বের হয়ে পড়। এ অঙ্গীকারের উপকারিতা এই যে, যখন কোন ভুল কাজের ইচ্ছা জাগবে তখন মনের মধ্যে এই খটকা সৃষ্টি হবে যে, অধম তো সকালে আল্লাহ তা'আলার সাথে এই অঙ্গীকার করেছি। আমার দ্বারা যেন ঐ অঙ্গীকারের বিপরীত কোন কিছু প্রকাশ না পায়।

রাতে ঘুমানোর পূর্বে হিসাব নেয়া

অতঃপর রাতে ঘুমানোর সময় সারা দিনের কর্মকাণ্ডের হিসাব নিবে। এবং চিন্তা করবে যে, আমি সকাল বেলা আল্লাহ তা'আলার সাথে এই অঙ্গীকার করেছিলাম। আমার সারা দিনের কর্মকাণ্ড ঐ অঙ্গীকার অনুযায়ী হয়েছে কি? যদি সমস্ত কাজ ঐ অঙ্গীকার অনুযায়ী হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করবে এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য ইসতিগফার পড়বে এবং বলবে ' হে আল্লাহ! আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম কিন্তু আমার দ্বারা অন্যায় হয়ে গেছে, আমি বিচ্যুত হয়েছি, অমুক ক্ষেত্রে আমার কদম নড়বড়ে হয়ে গেছে, অমুক স্থানে আমার চোখ খিয়ানত করেছে, অমুক জায়গায় আমার যবান ভুল করেছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ اِلَيْكَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَلِیَّ الْعَظِيْمَ

কয়েকবার দিল থেকে ইস্তিগফার করে নাও এবং এ আমল করে চিন্তা কর। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় এ আমল কর। সকালে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার কর আর রাতে ঘুমানোর সময় সারা দিনের আমলসমূহের হিসাব নিয়ে নাও। ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে সমস্ত গোনাহ ছুটে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তেইশতম মজলিস

মুজাহাদার হাকীকত

মুজাহাদার হাকীকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّابَعْدُ

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন:

> 'মুজাহাদা'-এর হাকীকত হল: সব ধরনের গোনাহ পুরোপুরি বর্জন করবে, আর নফসের এই বিরোধিতা ওয়াজিব। আর মুবাহ কাজসমূহে হাল্কা বিরোধিতা করবে। এ বিরোধিতা মুস্তাহাব। কিন্তু এটা এমন মুস্তাহাব যে, ওয়াজিব বিরোধিতার পূর্ণতা অর্জন, এই মুসতাহাব বিরোধিতার উপরই নির্ভরশীল। যেমন, বেশি ঘুমানো, বেশি খানা খাওয়া, খুব উন্নতমানের কাপড় পরিধান করা, কথা বেশি বলা, মানুষের সাথে বেশি মেলামেশা করা। এসব ব্যাপারে কমতি করবে।'
>
> (আনফাসে ঈসা পৃ: ১২-১৩)

হযরত থানভী রহ. এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দে 'মুজাহাদা'-এর হাকীকতও বয়ান করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সেটার শ্রেণী বিন্যাসও করেছেন যে, কোন্ মুজাহাদা ওয়াজিব? আর কোন্ মুজাহাদা মুসতাহাব? এবং কোন্ সীমা মুজাহাদা পর্যন্ত মুস্তাহাব?

মুজাহাদার মর্ম

'মুজাহাদা'-এর পারিভাষিক অর্থ হল: নফসের চাহিদাসমূহের বিরোধিতা করা। নফস যে কাজ করতে চায়, দিলের মধ্যে যে মন্দ কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে, নফসের সেই উদগ্র বাসনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ঐ কাজ থেকে 'নফস' কে বিরত রাখার নামই হল মুজাহাদা। নফসের চাহিদাসমূহের বিরোধিতাকেই সূফিয়ায়ে কেরাম 'মুজাহাদা' বলে থাকেন। আর এ 'মুজাহাদা' শব্দটি কুরআনে কারীম থেকে সংগৃহীত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ, 'যারা আমার পথে মুজাহাদা করবে আমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমার পথসমূহের সন্ধান দিব'। (সূরা আনকাবূত-৬৯)

আরবী ভাষায় 'মুজাহাদার' শাব্দিক অর্থ হল, মেহনত করা, চেষ্টা করা। এটাকেই সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় ঐ চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বুঝানোর প্রয়োগ করা হয় যা নফসের বিরোধিতায় করা হয়। অবশ্য সংক্ষিপ্তভাবে এটাকে শুধু 'মুখালাফাতে নফস' বা নফসের বিরুদ্ধাচারণ শব্দেও ব্যক্ত করা হয়।

ওয়াজিব মুজাহাদা

নফসের চাহিদার বিরোধিতা করা কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব। আবার কোন কোন অবস্থায় মুসতাহাব। অর্থাৎ, যদি নফস কোন গোনাহের ব্যাপারে প্রলুব্ধ করে, সেদিকে আহবান করে তাহলে ঐ চাহিদার বিরোধিতা করে সেটাকে পিষে ফেলা এবং মুজাহাদা করা ওয়াজিব।

উদাহরণস্বরূপ: মনে করুন অন্তরে দারুণ চাহিদা সৃষ্টি হল, কোন বেগানা নারীকে দেখে হারাম স্বাদ ভোগ করার, মজা নেয়ার; এখন এই চাহিদা ও দাবীর বিরোধিতা করা এবং এ চাহিদা কে পিষে ফেলা ওয়াজিব। এই চাহিদার উপর আমল করা এবং তার সামনে আত্মসমর্পণ করা জায়েয নেই।

অথবা মনে করুন অন্তরে চাহিদা সৃষ্টি হল: আমি অমুকের গীবত করব। মজলিস জমে গেছে আর অন্য মানুষের সমালোচনা করতে মজাও লাগছে, কথাবার্তা চলছে, এখন দিলের মধ্যে তাকাযা পয়দা হচ্ছে যে, আমি অমুকের গীবত করব, এ ক্ষেত্রে এই চাহিদার বিরোধিতা করা ওয়াজিব। এ জন্য যেখানেই মানুষের নফস কোন গোনাহের কাজে প্ররোচনা দেয় ঐ সময় সেটার বিরোধিতা করা এবং মুজাহাদা করা ওয়াজিব।

মুসতাহাব মুজাহাদা

কিন্তু যদি নফসের মধ্যে কোন এমন জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি হয় যেটা গোনাহ এবং হারাম নয়, নাজায়েয নয় বরং 'মুবাহ'। কিন্তু সেই 'মুবাহ'

বিষয়টি এমন যার ব্যাপারে বুযুর্গানে দীনের অভিজ্ঞতা হল: ঐ মুবাহ বিষয় মানুষকে ধীরে ধীরে গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এমন চাহিদারও বিরোধিতা করা উচিৎ। অবশ্য এ ধরণের পরিস্থিতিতে নফসের বিরোধিতা করা ওয়াজিব নয় কিন্তু মুসতাহাব অবশ্যই। শুধুমাত্র এ কারণে যে, কখনো যেন এমন না হয় এই চাহিদাই ধীরে ধীরে কোন গোনাহে লিপ্ত করে দিল!

এ বাণীতে হযরত থানভী রহ. বলছেন : 'মুজাহাদা' ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। মুজাহাদা করতেই হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরিস্কার ভাষায় বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে হিদায়েতকে মুজাহাদার উপর নির্ভরশীল সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, যখন তোমরা মুজাহাদা করবে তখন আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দিব। মুজাহাদা ব্যতীত আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছা যায় না।

নিজ নফসকে ছেড়ে দাও

হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর ব্যাপারে কিতাবে লিখা হয়েছে: একবার তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলার দর্শন সৌভাগ্য লাভ করেন।

জাগ্রত অবস্থায় এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন সম্ভব নয়। অবশ্য আল্লাহ পাক অনেক সময় স্বপ্নে দর্শন করিয়ে দেন। কীভাবে করান? এটা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

যাইহোক! এই দর্শন মুহূর্তে হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেন–

كَيْفَ السَّبِيْلُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ,'হে আল্লাহ! আপনার পর্যন্ত পৌঁছার পথ কি?'

আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন:

اُتْرُكْ نَفْسَكَ وَتَعَالِ

'নিজ নফসকে ছাড় এবং আমার কাছে চলে আস।'

অর্থাৎ, নিজ নফসের বিরোধিতা কর এবং তার চাহিদাসমূহ দাবিয়ে দাও। যখন এই আমল করবে তখন আমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে।

আসল মুজাহাদা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন:

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

অর্থাৎ, 'আসল মুজাহিদ হল ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করে।' (তিরমিযী শরীফ, ফাযায়েলে জিহাদ হাদীস নং-১৬২১)

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে লড়াই করাও জিহাদ। কিন্তু আসল মুজাহিদ হল, ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফসের সাথে এমনভাবে জিহাদ করে যে, নফসের চাহিদা, আকাংখা ও বাসনা একদিকে আহ্বান করছে আর মানুষ নফসের ঐ চাহিদাসমূহকে গুড়িয়ে দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করে। এটার নামই হল 'মুজাহাদা'।

সুতরাং যে ব্যক্তি আপন সংশোধনের পথে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দিকে কদম বাড়াতে উদগ্রীব, তাকে 'মুজাহাদা' করতেই হবে।

মানুষের নফস স্বাদযুক্ত জিনিসে অভ্যস্ত

আমার এবং আপনার নফস অর্থাৎ, ঐ শক্তি যা মানুষকে কোন কাজের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে ঐ নফস দুনিয়াবী স্বাদযুক্ত জিনিসে অভ্যস্ত, এ জন্য যে কাজে তার বাহ্যিক স্বাদ ও মজা অনুভূত হয় তার দিকে সে দৌড়ে যায়। এটা তার স্বাভাব ও প্রকৃতি। সে এমন কাজের দিকেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। সে মানুষ কে বলে: এ কাজ কর, মজা পাবে। এটা কর স্বাদ লাগবে! এ জন্য এ নফস মানুষের অন্তরে মন্দকাজের চাহিদা পয়দা করতে থাকে। এখন যদি

মানুষ নিজেকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়, আর যে কোন (অবৈধ) স্বাদযুক্ত বস্তু হাসিল হওয়ার চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং সে সেটার উপর আমল করতে থাকে, আর নফসের প্রত্যেক কথাকে মানতে থাকে, তবে এর পরিণতিতে সে মানুষ আর মানুষ থাকে না বরং পশু হয়ে যায়!!

নফসের কামনাসমূহের মধ্যে শান্তি নেই

নফসানী খাহেশাতের মূলনীতি হল: যদি তুমি তার অনুসরণ করতে থাক এবং তার পিছে পিছে চলতে থাক, আর তার কথা শুনতে থাক, তবে কোন সীমায় গিয়ে থামতে পারবে না। মানুষের নফস কখনো এটা বলবে না যে, এখন সমগ্র কামনা পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আর আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এটা যিন্দেগীতে কস্মিনকালেও হবে না। কেননা কোন মানুষের সমস্ত কামনা বাসনা এই জীবনে পূর্ণ হতে পারে না এবং এর দ্বারা কখনো প্রশান্তিও লাভ হতে পারে না।

প্রশ্ন হল এর কারণ কি? হ্যাঁ এর কারণ হল নফসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি স্বাদ উপভোগ করার পর সাথে সাথেই অন্য স্বাদের দিকে অগ্রসর হয়। সুতরাং যদি তুমি চাও যে, নফসের কামনাগুলোর পিছনে পিছনে চলে প্রশান্তি অর্জন করবে, তবে সারা জীবনে কখনো শান্তি লাভ করতে পারবে না। প্রয়োজনে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

এ তৃষ্ণা নির্বাপিত হওয়ার নয়

আপনারা একটি রোগের নাম শুনে থাকবেন যাকে جُوْعُ الْبَقَرِ বা 'গোরুর ক্ষুধা' বলা হয়। এই রোগের বিশেষত্ব হল: মানুষের কেবল ক্ষুধাই লাগতে থাকে। যত ইচ্ছা খানা খাক, যত ইচ্ছা পানি পান করুক কিন্তু ক্ষুধা মিটে না।

এমনিভাবে আরেকটি রোগ আছে যাকে استسقاء 'ইসতিসকা' বলা হয়। এ অসুখে আক্রান্ত হলে মানুষের শুধু পিপাসা লাগে। কলসের পর কলস পানি পান করুক, কূয়াঁর পর কূয়াঁ খতম করে ফেলুক, কিন্তু তৃষ্ণা মিটেনা।

মানুষের কামনা-বাসনার দৃষ্টান্তও অনুরূপ, যদি সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা না হয়, কন্ট্রোল করা না হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোকে শরীয়ত ও আখলাকের বন্ধনে আবদ্ধ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইস্‌তিসকা' রোগীর মত স্বাদ ও মজার কোন স্তরে পৌঁছেও স্বস্তি লাভ হবে না। বরং স্বাদের সেই উদগ্র বাসনা বাড়তেই থাকবে।

সামান্য কষ্ট সহ্য করে নিন

এ জন্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নফসের বাসনার পিছনে চলবেন না। কেননা এমনটি করলে ঐ নফস আপনাকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করবে। বরং এ নফসকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে প্রাথমিক অবস্থায় আপনার অবশ্যই কিছু না কিছু কষ্ট হবে! এই যেমন টিভি চলছে, মন চাচ্ছে টিভি দেখি এবং তার মধ্যে যেসব অশ্লীল ছবি আসছে সেগুলো প্রত্যক্ষ করি। এটা নফসের চাহিদা। এখন যে ব্যক্তি টিভি দেখায় অভ্যস্ত, যদি তাকে বলা হয় যে 'ভাই! তুমি দেখনা কিন্তু, নফসের কথা মত চল না।' যদি সে না দেখে এবং নজরের হিফাযত করে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় তার কষ্ট হবে। যেহেতু সে দেখায় অভ্যস্ত। না দেখলে তার মনে শান্তি আসে না, ভাল লাগে না।

এই নফস দুর্বলের উপর বাঘ তুল্য

কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এই নফসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে এটাকে রেখেছেন যে, যদি কেউ এসব কষ্ট ক্লেশ সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করতে পারে আর মনে মনে বলে: চাই আমার দিলের উপর দিয়ে করাত চলে চলুক তবুও আমি এ কাজ করব না।

যেদিন এ ব্যক্তি নফসের বিরুদ্ধে এভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। ব্যাস! ঐ দিন থেকেই নফসের এই সব কামনা-বাসনা আপনা আপনিই দুর্বল হতে থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে এই নফস এবং শয়তান দুর্বলের উপর বাঘ, যে তার সামনে ভিজা বিড়াল বনে থাকে এবং তার চাহিদা অনুযায়ী চলতে থাকে। তার উপর সে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার শক্ত ইচ্ছা

করে তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তার সামনে নফস দুর্বল হয়ে পড়ে।

আর ঐ কাজটি না করার কারণে প্রথম দিন যতটুকু কষ্ট হয়েছিল দ্বিতীয় দিন তার চেয়ে কম কষ্ট হবে, তৃতীয় দিন আরো কম হবে এবং কমতে কমতে ঐ কষ্ট একদিন পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে। এবং নফস এতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

নফস হল দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়

আল্লামা বূসীরী রহ. অনেক বড় বুযুর্গ কবি ছিলেন, যাঁর 'কাসীদায়ে বুরদাহ' খুব প্রসিদ্ধ। যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে প্রশংসামূলক একটি কাব্যগ্রন্থ। এতে তিনি অত্যাশ্চর্য জ্ঞান-গর্ভ একটি কবিতা বলেছেন–

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى
حُبِّ الرَّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمْ

অর্থাৎ,মানুষের এই নফস হল ছোট্ট শিশুর মত। যে মায়ের দুধ পান করে আর ঐ বাচ্চা দুধ পানে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এখন তার থেকে দুধ ছাড়িয়ে নিতে চাইলে যেস কান্নাকাটি-চিল্লাচিল্লী করে। এখন যদি পিতা-মাতা এটা চিন্তা করে যে, দুধ ছাড়িয়ে দিলে বাচ্চার খুব কষ্ট হবে, চলো, রাখো, বাচ্চাকে আরো দুধ পান করতে দাও, ফলে সে বাচ্চা দুধ পান করতে থাকে! তো আল্লামা বূসীরী রহ. বলছেন: যদি বাচ্চাকে এভাবে দুধ পানরত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তবে পরিণাম এই হবে যে, সে জওয়ান হয়ে যাবে, তবুও তার থেকে দুধ পানের অভ্যাস ছুটবে না। কারণ আপনি বাচ্চার কষ্ট, তার ফরিয়াদ ও তার চিৎকারে ভয় পেয়ে গেছেন যার পরিণতি এটাই হল যে, আপনি তার থেকে দুধ ছাড়াতে পারলেন না। এখন তার সামনে রুটি আনলে সে বলে: 'আমি রুটি খাব না, আমি তো দুধই পান করব'!! কিন্তু পৃথিবীর কোন পিতা-মাতা এমন পাওয়া যাবে না যারা এ কথা বলবেন যে, যেহেতু দুধ ছাড়িয়ে দিলে বাচ্চার কষ্ট হবে সেহেতু তাকে দুধ

ছাড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। পিতা-মাতা ভাল করেই জানেন: দুধ ছাড়িয়ে দিলে কান্নাকাটি করবে। রাতে ঘুমাবে না। নিজেও জেগে থাকবে আমাদেরকেও জাগাবে। কিন্তু এতদসত্ত্বে তাঁরা দুধ ছাড়িয়ে দেন। কেননা তাঁরা জানেন, এতেই বাচ্চার কল্যাণ আছে। এখন তার থেকে দুধ ছাড়িয়ে না দিলে সে সারা জীবনে কখনো রুটি খাওয়ার উপযুক্ত হবে না।

গোনাহের স্বাদ তার সাথে লেগে আছে

আল্লামা বূসীরী রহ. বলছেন: মানুষের এ নফসও শিশুর মত। তার মুখে গোনাহ্ লেগে আছে। গোনাহের মজা ও স্বাদ মিশে আছে। এখন যদি তুমি তাকে এ অবস্থাতেই রেখে দাও যে, চলো করতে দাও। গোনাহ্ ছাড়িয়ে দিলে ওর কষ্ট হবে। খারাপ স্থানে দৃষ্টি পড়লে সেটাকে সরাতে ভীষণ কষ্ট হয়! যবান মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করলে খুব খারাপ লাগে। এই যবানই মজলিসে বসে গীবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেটা দূর করলে বেশ কষ্ট হবে। নফস এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সূদ-ঘুষ এবং আরো অনেক গোনাহের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এসব বদ অভ্যাস ছাড়িয়ে দিলে নফসের কষ্ট অবশ্যই হবে কিন্তু তাই বলে যদি আপনি ঘাবড়ে গিয়ে দূরে বসে থাকেন, তবে সারা জীবনেও কোন গোনাহ ছুটবে না এবং আপনি শান্তিও পাবেন না।

আল্লাহর যিকিরেই প্রকৃত শান্তি

মনে রেখ! আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর মধ্যে কোন আরাম ও শান্তি নেই। সারা দুনিয়ার আসবাব ও উপকরণ জমা করা সত্ত্বেও মনের মধ্যে শান্তি নেই।

পশ্চিমা সমাজে অর্থের ছড়াছড়ি, শিক্ষার উন্নত মান, স্বাদ উপভোগের সমস্ত পথ উন্মুক্ত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের অবস্থা এই যে, ঘুমের বড়ি খেয়ে খেয়ে তারা ঘুমাচ্ছে!! কেন? দিলের মধ্যে প্রশান্তি নেই। প্রশান্তি কেন পাওয়া গেল না? যেহেতু গোনাহের মধ্যে কোন প্রশান্তি নেই। প্রশান্তি আছে শুধুমাত্র একটি জিনিসে আর সেটা হল–

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ,'জেনে রাখো! আল্লাহর যিকিরের দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'। (সূরা রা'দ: ২৮)

এজন্য এমনটি মনে করা ধোঁকা বৈ কিছু নয় যে, নাফরমানী করতে থাকব আর শান্তি পেতে থাকব! মনে রেখো! জীবনেও শান্তি পাবে না। এ দুনিয়া থেকে তড়পাতে তড়পাতে যাবে কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা পরিত্যাগ না করলে কখনো শান্তির মন্‌যিল হাসিল হবে না। শান্তি তো আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকেই দান করেন যাঁদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত আছে। তাঁর স্মরণ আছে এবং যাঁদের দিল তাঁর যিকিরের দ্বারা আবাদ। এদের শান্তি ও প্রশান্তির অবস্থা দেখুন! বাহ্যিকভাবে হয়ত পেরেশান দেখা যায়, ক্ষুধা-দারিদ্রও আছে, কিন্তু অন্তরে আছে নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তির বিরাট নেয়ামত। এ জন্য যদি আপনি দুনিয়ার প্রশান্তিও অর্জন করতে চান তবে আপনাকে ঐসব নাফরমানী ও গোনাহ্ ছাড়তে হবে, আর গোনাহ্ বর্জনের জন্য সামান্য মুজাহাদা করতে হবে। নফসের মুকাবেলায় দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে।

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না

আর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা এ ওয়াদাও করেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ, 'যারা আমাকে পাওয়ার জন্য মুজাহাদা করবে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমাকে পাওয়ার রাস্তাসমূহ দেখিয়ে দিব'।

(সূরা আনকাবূত-৬৯)

হযরত থানভী রহ.-এর তরজমায় লিখেন : 'আমি তাদেরকে হাত ধরে নিয়ে যাব।' এমন নয় যে, দূর থেকে দেখিয়ে দিলেন এটা রাস্তা। বরং হাত ধরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এ জন্য সামান্য কদমতো বাড়াতে হবে। সামান্য ইচ্ছাতো করতে হবে। নফসের মোকাবেলায় সামান্য দৃঢ়তার পরিচয় তো দিতে হবে। তবেই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবে। এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

এ জন্য এটাকেই 'মুজাহাদা' বলে। একবার মানুষ সামান্য হিম্মত করেই

দেখুক। দিলের উপর করাত চলুক, আমার কামনা-বাসনা দুমড়ে মুচড়ে যাক। মন-মস্তিষ্কে কিয়ামত ঘটে যাক, তবুও আমি এই গোনাহের কাজ করব না।

যেদিন মানুষ এভাবে নফসের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : সে দিনই সে আমার প্রিয় হয়ে গেল। এখন আমি নিজে তার হাত ধরে আমার পথে নিয়ে যাব!

এখন তো দিলকে বানাতে হবে তাঁর উপযুক্ত

এজন্য সংশোধনের পথে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল মুজাহাদা। এজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. এ কবিতাটি পাঠ করতেন:

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

আকাংখারা খুন হয়ে যাক যাকনা কামনা চূর্ণ হয়ে,
এখন তো এ দিল কে বানাতে হবে আপনার উপযুক্ত আমাকে।

এখন এই দিলে আল্লাহ্ তা'আলার নূরের অবতরণ হবে। এখন এই দিলে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত প্রবীষ্ট হবে। এখন আর গোনাহ্ হবে না। এরপরে দেখ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কেমন রহমত নাযিল হয় এবং মানুষ কীভাবে তাঁর পথে চলে।

মনে রেখ! প্রাথমিক অবস্থায় এ কাজ করতে খুব কষ্ট হয়। মনে চায় একটা আর আল্লাহ্‌র জন্য করা হয় আরেকটা। কিন্তু পরবর্তীতে এই কষ্টের মধ্যেই মজা লাগতে থাকে। যখন এই খেয়াল আসে যে, আমি আমার মালিক ও খালিক আল্লাহ্‌পাকের জন্য আমার নফসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছি, আমার আকাংখাগুলোকে খুন করছি, তখন এর মধ্যে কী যে মজা আর শান্তি পাওয়া যায়, সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

মা এই কষ্ট কেন সহ্য করেন?

মায়েদেরকে দেখুন! তাঁদের কী অবস্থা? প্রচণ্ড শীতের রাত। লেপের নিচে শুয়ে আছে বাচ্চাও পাশে আছে। এ অবস্থায় ঐ বাচ্চা পেশাব করে দিল। এখন নফসের চাহিদা হল এই গরম বিছানা ছেড়ে কোথায় যাব না, এখন তো শীতকাল! গরম বিছানা ছাড়াতো খুব কঠিন কাজ। কিন্তু মা চিন্তা করে যে, যদি আমি এখন না উঠি, তবে বাচ্চা ভেজা কাপড়ে পড়ে থাকবে এভাবে পড়ে থাকলে ওর জ্বর এসে যায় কিনা! শরীর খারাপ হয়ে যায় কিনা! ঐ মা বেচারী স্বীয় নফসের তাকাযাকে বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ড শীতের রাতে বাইরে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা বাচ্চার কাপড় ধৌত করছে! এবং তার কাপড় পরিবর্তন করছে!

এটা কি কোন সামান্য কষ্ট? কিন্তু মা এ কষ্ট সহ্য করছে। কেন? যেহেতু নিজ সন্তানের সাফল্য ও স্বাস্থ্যের চিন্তা মায়ের মনে আছে। এজন্য সে এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও নিজ নফসের চাহিদাকে পদদলিত করে এই সব খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে।

মহব্বত কষ্টকে খতম করে দেয়

একজন মহিলার কোন বাচ্চা নেই, কোন সন্তান নেই। সে বলে তোমরা আমার চিকিৎসা করাও যাতে আমার সন্তান হয়। এর জন্য সে দুয়ারে দুয়ারে দু'আর ধর্ণা দিচ্ছে। আর বলছে: দু'আ করো যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে সন্তান দান করেন এবং এর জন্য তাবীয-কবজ, আল্লাহ্ জানেন আরো কত কিছু করাতে থাকে।

অন্য একজন মহিলা তাকে বলল : আরে তুমি কোন্ চক্করে আছ? বাচ্চা হলে তো তোমার অনেক কষ্ট হবে। শীতের রাতে উঠে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা কাপড় ধৌত করতে হবে! তখন সে মহিলা বলে: আমার এক বাচ্চার উপর হাজারো শীতের রাত কুরবান হোক। কেননা এই বাচ্চার মূল্য ও মূল্যায়ন এবং এ দৌলতের অনুভূতি ঐ মহিলার অন্তরে আছে এজন্য মায়ের সমস্ত কষ্ট আরাম বনে গেছে।

ঐ মা যে আল্লাহর কাছে দু'আ করছে: হে আল্লাহ! আমাকে সন্তান দান করুন, এর অর্থ হল: সন্তানের যত দায়িত্ব যত কষ্ট আছে সব আমাকে দান করুন। কিন্তু এসব কষ্ট তাঁর নিকটে কোন কষ্টই নয় বরং আরাম।

এখন যে মা শীতের রাতে উঠে কাপড় ধৌত করছে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কষ্ট তো অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু যৌক্তিক বিবেচনায় সে নিশ্চিন্ত যে, এই কাজ আমি আমার সন্তানের কল্যাণের জন্য করছি। যখন এই প্রশান্তি অনুভূত হয়, তখন সব ধরনের আশা-আকাংখা পিষে ফেলতেও স্বাদ লাগে। এটাকেই মাওলানা রূমী রহ. এভাবে বলেছেন–

از محبت تلخہا شیریں شود

অর্থাৎ, ভালবাসা থাকলে তিক্ত জিনিসও মিষ্ট হয়ে যায়।

যে কাজগুলো কষ্টকর মনে হচ্ছিল মহব্বতের কারণে সেগুলোও আনন্দদায়ক হয়ে যায়। তার মনে এটাই থাকে যে, আমি তো এ কাজটি মহব্বতের কারণেই করছি।

মাওলার মহব্বত যেন লায়লার মহব্বত থেকে কম না হয়

মাওলানা রূমী রহ. মছনবীতে মহব্বতের অনেক বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছেন, লায়লা-মজনুর কিচ্ছা লিখেছেন। লিখেছেন মজনু লায়লার জন্য কীভাবে দেওয়ানা হল? কত কত কষ্ট সহ্য করল। ঝর্ণা প্রবাহিত করার মানসে রওয়ানা হল। এমনকি খনন কর্মও আরম্ভ করে দিল!! এসব কষ্ট কর কাজ সে করছে!! কেউ একজন তাকে বলল: আরে তুমি তো খুব কষ্টকর কাজ করছ হে! এসব বাদ দাও! তখন মজনু বলে: হাজারো কষ্ট কুরবান। যার জন্য এ কাজ করছি তার মহব্বতেই করছি। আমার তো এই নহর খননের মধ্যেই মজা লাগছে। কেননা এটা আমি আমার প্রেমিকার খাতিরে করছি।

মাওলানা রূমী রহ. বলছেন–

মাওলার ইশকে হাকীকী লায়লার নকল ইশকের তুলনায় কম হতে পারে কি? মাওলার (আল্লাহ পাক) জন্য বল হয়ে যাওয়া আরো বেশি ভাল।

সুতরাং, যখন মানুষ মহব্বতের কারণে এসব কষ্ট সহ্য করে। তখন তার খুব স্বাদ লাগে।

বেতনের সাথে মহব্বত

এক ব্যক্তি চাকুরী করেন। যার জন্য তাকে সকাল সকাল উঠতে হয়। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বিছানায় শুয়ে আছেন। অফিসে যাওয়ার সময় হওয়া মাত্রই বিছানা ছেড়ে, স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে রওয়ানা হচ্ছেন। নফসের তাকাযা তো এই ছিল যে, গরম বিছানায় পড়ে থাকা। কিন্তু সে ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে অফিসে যাচ্ছে। সারা দিন মেহনতের কাজ-কর্ম করার পর রাতে কোন এক সময় ঘরে ফিরে আসছে। আবার অসংখ্য মানুষ এমনও আছেন যারা সকালে নিজ সন্তানদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে যান আবার রাতে প্রত্যাবর্তনের পর ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখতে পান!!

মোট কথা ঐ ব্যক্তি এসব কষ্ট সহ্য করছে। এখন যদি কেউ তাকে বলে: আরে ভাই! তুমি চাকুরীর খাতিরে কী যে কষ্ট বরদাশত করছ!! চল, আমি তোমার চাকুরী ছাড়িয়ে দিচ্ছি। তখন সে উত্তর দিবে, না ভাই! না। বহু কষ্টে এই চাকুরী পেয়েছি। এটাকে ছাড়িয়োনা। সকাল সকাল কর্মস্থলে যেতেই তার আনন্দ লাগে। সন্তান-স্ত্রীদেরকে ফেলে যেতেও মজা লাগছে। কেন? যেহেতু এ ব্যক্তির ঐ বেতনের সাথে মহব্বত হয়ে গেছে যেটা মাসের শেষে পাওয়া যাবে। ঐ মহব্বতের ফলে এসব কষ্ট সহজ হয়ে গেছে।

কোন সময় চাকুরী ছুটে গেলে সে কান্নাকাটি করছে, হায়! আমার ঐ দিন কোথায় গেল যে দিন আমি সকাল সকাল উঠে যেতাম। আর সে লোকজনের নিকট সুপারিশ তলব করতে থাকে, আর বলতে থাকে আমাকে পুনরায় আমার চাকুরীতে বহাল করে দিন। সুতরাং বুঝা গেল যদি কোন জিনিসের সাথে মহব্বত হয়ে যায় তখন ঐ পথের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহজ ও মজাদার হয়ে যায়, এটাতেই তখন স্বাদ লাগে।

অনুরূপভাবে গোনাহ বর্জন করতে গেলেও প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্যই কষ্ট হবে। কিন্তু যখন শরীয়ত অনুযায়ী আমল শুরু হবে তখন আল্লাহ

তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। এরপর ঐ কষ্টের মধ্যেই স্বাদ লাগতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে মজা আসতে থাকবে।

ইবাদতের স্বাদের সাথে পরিচিত হয়ে নাও

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. দারুণ আশ্চর্যজনক একটি কথা বললেন যে মানুষের এই নফসের স্বাদ ও মজার প্রয়োজন, এর খোরাক হল স্বাদ ও মজা। কিন্তু স্বাদ ও মজার বিশেষ কোন আকৃতি তার কাম্য নয় যে, অমুক প্রকারের মজা চাই। অমুক প্রকারের চাই না। ব্যাস, তার তো শুধু মজা দরকার, এখন আপনি তাকে খারাপ ধরনের মজায় অভ্যস্ত করে ফেলেছেন যদ্দরূন সেগুলোই তার কাছে ভাল লাগে, একবার তাকে আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনযায়ী জীবন যাপনের যে স্বাদ, সেটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিন অতঃপর দেখবেন এই নফস সেটার মধ্যেই স্বাদ ও মজা পাবে।

আমার তো দিন রাত আত্মবিস্মৃতির প্রয়োজন

কবি গালিবের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা আছে। আল্লাহ ভাল জানেন। লোকজন এর কী কী মর্ম বের করে!! কিন্তু আমাদের শায়খ হযরত আরেফী রহ. এর একটি সুন্দর মর্ম বের করেছেন। ঐ কবিতাটি এই :

مے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو
اک گونہ بےخودی مجھے دن رات چاہئے

অর্থাৎ, শরাবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার তো দিন রাত স্বাদের আত্মবিস্মৃতি প্রয়োজন।

তোমরা আমাকে শরাবে অভ্যস্ত বানিয়েছো ফলে শরাবেই আমার উন্মাদনা জাগে। আর যদি তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ, তাঁর যিকির ও আনুগত্যে অভ্যস্ত বানাতে তবে এই আত্মবিস্মৃতি আমার আল্লাহ্‌র যিকিরের মধ্যে হাসিল হত। আমি সেটাতেই খুশি হতাম। কিন্তু এটা তোমাদের ভুল যে তোমরা আমাকে ঐসব জিনিসের পরিবর্তে শরাবে অভ্যস্ত করিয়েছ।

নফসকে পিষে ফেলায় মজা অনুভূত হবে

অনুরূপভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে 'মুজাহাদা' করতে খুব কষ্ট লাগে। নফস চায় 'গীবত' করতে। মজলিসে গীবতের আলোচনা শুরুও হয়ে গেছে। মনে চায় বাড়িয়ে চড়িয়ে এতে অংশ নেই। ঠিক এ সময় এটাকে লাগাম পরাতে হবে যে, না! একাজ করবে না। এ কাজটি খুব মুশকিল মনে হয়। কিন্তু মনে রাখবেন: দূর থেকে এটা মুশকিল মনে হলেও যখন মানুষ পোক্ত ইচ্ছা করে যে, এ কাজ আর করব না তখন মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে সাহায্যও নসীব হবে। অতঃপর এই যে আপনি আপনার আকাংখা ও ইচ্ছাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন, এর মধ্যে যে স্বাদ পাবেন ইনশাআল্লাহ ছুম্মা ইনশাআল্লাহ এর স্বাদ ঐ গীবতের স্বাদের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

ঈমানের মধুরতা হাসিল করুন

হাদীসে পাকে আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: জনৈক ব্যক্তির অন্তরে কুদৃষ্টির চাহিদা সৃষ্টি হল, আর কে এমন আছে যার অন্তরে এ চাহিদা সৃষ্টি হয় না? এখন মন খুব উথাল পাতাল করছে: এ মহিলাকে আমি দেখবই! কিন্তু আপনি একমাত্র মহান আল্লাহর ভয়ে নজরের হিফাযত করলেন। দারুণ কষ্ট হল, দিলের উপর করাত চলল, কিন্তু এ কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা ঈমানের এমন স্বাদ দান করবেন যার সামনে ঐ কুদৃষ্টির স্বাদ একদম তুচ্ছ।

এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াদা এবং এটা হাদীসেও বিদ্যমান। (মুসনাদে আহমাদ- ৫ : ২৬৪)

এই ওয়াদা শুধুমাত্র নজরের গোনাহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং প্রত্যেক গোনাহ ছাড়ার উপরই এই ওয়াদা। উদাহরণস্বরূপ: গীবতে খুব মজা লাগতেছে। কিন্তু একবার আপনি মহান আল্লাহর কথা খেয়াল করে গীবত থেকে বিরত থাকলেন তাহলে দেখবেন কত মজা লাগে!!

আর যখন মানুষ গুনাহের স্বাদের বিপরীতে এই পবিত্র স্বাদে অভ্যস্ত হতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলার ভালবাসা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক আরো মযবূত হতে থাকে।

তাসাওউফের সারকথা

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. কত সুন্দর কথা বলেছেন! স্মরণ

রাখার মত কথা। হযরত বলেন: ঐ সামান্য কথা যেটা তাসাওউফের সারনির্যাস, সেটা এই; যখন কোন নেক কাজে অলসতা পয়দা হয় উদাহরণস্বরূপ : নামাযের সময় হয়ে গেছে কিন্তু নামাযে যেতে অলসতা লাগছে তখন সেই অলসতার মুকাবেলা করে ঐ নেক কাজটা করতে হবে। আর যখন গোনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে মন অলসতা করবে তখন সেই অলসতার মুকাবেলা করে ঐ গোনাহ থেকে বাঁচবে। অতঃপর বলেন: ব্যস। এর দ্বারাই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর দ্বারাই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নত হয়। যে ব্যক্তির এ জিনিস অর্জন হয়ে গেছে তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

সুতরাং, নফসের বাসনাসমূহের উপর করাত চালিয়ে চালিয়ে এবং হাতুড়ি মেরে মেরে যখন সেগুলোকে গুড়িয়ে দেয়া হবে তখন সেই নফসই আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর 'তাজাল্লীগাহ' বা জ্যোতির ক্ষেত্রে পরিণত হবে।

দিল তো আছেই ভাঙ্গার জন্য

আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ. একটি উদাহরণ দিতেন। এখন তো আর সেই যুগ নেই। পূর্ব যুগে ইউনানী হাকীম ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রকার চূর্ণ তৈরী করতেন। স্বর্ণের চূর্ণ, রৌপ্যের চূর্ণ, সংখিয়ার চূর্ণ। আরো কত ধরনের চূর্ণ যে তাঁরা বানাতেন। আর সেই চূর্ণ বানানোর জন্য তারা স্বর্ণ কে জ্বালাতেন। এত বেশি জ্বালাতেন যে ঐ স্বর্ণ ছাই হয়ে যেত। আর তাঁরা বলতেন: স্বর্ণকে যত বেশি জ্বালানো হবে, ততই তার শক্তি বেশি হবে। এখন জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে যখন চূর্ণ তৈরী হয়ে গেল, তখন কেউ সেটার সামান্য একটু খেলে জানা নেই কত শক্তি অর্জিত হবে। যখন স্বর্ণকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে মিটিয়ে মিটিয়ে চূর্ণ করে করে ছাই বানানোর পর সেটা চূর্ণ হয়ে গেলো। আমাদের আব্বাজান রহ. বলতেন: এই কুপ্রবৃত্তিগুলোকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করে করে পিষে পিষে ছাই বানিয়ে শেষ করে দিবে, তখনই সেটা বিশেষ চূর্ণে পরিণত হবে। এর মধ্যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর সাথে সম্পর্কের শক্তি এসে যাবে। তাঁর মহব্বত আসবে। এখন দিল আল্লাহ তা'আলার 'তাজাল্লীগাহ' বনে যাবে। ঐ দিলকে যতই ভাংচুর করবে ততই বেশি সে আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে মাহবূব বনতে থাকবে।

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অর্থাৎ, তুমি এটাকে বাঁচিয়ে রেখনা যে, এটা তো ঐ আয়না যে আয়না, ভাঙ্গা হয় সেটাই আয়নার কারিগরের দৃষ্টিতে বেশি প্রিয় হয়।

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আরেফী রহ. কত সুন্দর কবিতা পাঠ করতেন:

یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا
اب اور کچھ بنائیں گے اسکو بگاڑ کے

অর্থাৎ, একথা বলে পেয়ালা বানানেওয়ালা পেয়ালা ভেঙ্গে দিয়েছেন,

যে এখন এটা ভেঙ্গে অন্য কিছু বানাব।

সুতরাং, এমনটি মনে করবেন না, নফসের কামনা-বাসনাগুলো পিষে ফেলার দরুন যে সব চোট লাগতেছে এবং যে কষ্ট হচ্ছে, সেগুলো অনর্থক। বরং এ সবের পরে যখন এই দিল আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতের পাত্রে পরিণত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার যিকির ও তাঁর স্মরণের কেন্দ্র হবে, ঐ সময় সে যে মিষ্টতা অনুভব করবে, আল্লাহর কসম! এর মোকাবেলায় গোনাহের এই সব স্বাদ (?) কিছুই নয়। এগুলোর কোন হাকীকতই নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা এ দৌলত আমাদের সকল কে নসীব করুন।

মোটকথা! প্রাথমিক অবস্থায় সামান্য মেহনত ও কষ্ট সহ্য করতে হবে। আর এরই নাম 'মুজাহাদা'। এ ব্যাপারটাকেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফের মধ্যে এভাবে বয়ান করেছেন :

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ

অর্থাৎ, প্রকৃত মুজাহিদ হল ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করে। নিজ নফসের কামনা-বাসনাগুলো আল্লাহ্ পাকের খাতিরে পিষে ফেলে। নিজেকে নফসের চাহিদাসমূহের হাতের খেলনা হওয়া থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে নফসের এ কামনা-বাসনাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চব্বিশতম মজলিস

মুস্তাহাব মুজাহাদা এবং চার জিনিষে স্বল্পতা

মুস্তাহাব মুজাহাদা এবং চার জিনিষে স্বল্পতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - أَمَّا بَعْدُ

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন:

'মুজাহাদার হাকীকত হল, গোনাহসমূহকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করবে। আর এ নফসের বিরোধিতা ওয়াজিব। আর মুবাহ কাজে সামান্য বিরোধিতা করবে। এ বিরোধিতা মুস্তাহাব।'

(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৩)

এই বাণীটিতে হযরত থানভী রহ. 'মুজাহাদা'-এর হাকীকত বয়ান করে দিয়েছেন। আর সেটা হল নফসের কামনা-বাসনার বিরোধিতা করা। এই বিরোধিতা কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ : যদি নফস কোন গোনাহের দিকে আহবান করে কিংবা কোন গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি করে তবে ঐ চাহিদার বিরোধিতা করে সেটাকে নিষ্পেষিত করা এবং মুজাহাদা করা ওয়াজিব। আসল 'মুজাহাদা' এটাই।

জায়েয কাজসমূহ থেকে বিরত থাকাও মুজাহাদা

কিন্তু যেহেতু আমাদের নফস ভোগ-বিলাস, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা ও আরামে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এত বেশি অভ্যস্ত হয়েছে যে, যদি একে আল্লাহর পথের দিকে এবং শরীয়তের দিকে আনতে চান, তাহলে সহজে আনা যাবে না বরং কাঠিন্য সৃষ্টি হয়। সুতারাং এ নফসকে আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্দেশিত বিধি-বিধানসমূহের অনুগত বানানোর জন্য এটাকে অনেক মুবাহ ও জায়েয কাজ থেকেও বিরত রাখতে হয়। কেননা যখন আপনি নফসকে জায়েয কাজসমূহ হতে বিরত রাখবেন তখন তার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। যদ্দরুন তার জন্য নাজায়েয কাজসমূহ থেকে বাঁচাও সহজ হয়ে যাবে।

সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় এটাকেও 'মুজাহাদা' বলা হয়। এটা হল 'মুস্তাহাব মুজাহাদা'।

উদাহরণস্বরূপ: পেট ভরে খানা খাওয়া কোন গোনাহের কাজ নয়। কিন্তু সূফীয়ায়ে কেরাম বলেন: খুব উদর পূর্ণ করে খানা খেয়ো না। কেননা এর পরিণাম এই হবে যে, নফস গাফেল হয়ে যাবে এবং ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, এজন্য নফসকে অভ্যস্ত বানানোর জন্য খানা কিছু কমিয়ে দাও। এটাও 'মুজাহাদা'।

বৈধ কাজসমূহে মুজাহাদা কেন?

হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব রহ. কে কেউ জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত! এটা কেমন ব্যাপার যে, সূফীয়ায়ে কেরাম অনেক জায়েয কাজ থেকেও বিরত রাখেন এবং সেগুলো ছাড়িয়ে দেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন! উত্তরে হযরত ইয়াকুব ছাহেব রহ. বললেন: দেখ! এর উদাহরণ এরূপ: মনে কর কিতাবের পৃষ্ঠা, ঐ পৃষ্ঠাটা মুড়ে দাও, মুড়ে দেওয়ার এখন এটাকে সোজা কর। কিন্তু ঐ পৃষ্ঠা সোজা হচ্ছে না, প্রচুর চেষ্টা করা হল কিন্তু আবার মুড়ে যায়। এরপর হযরত রহ. বললেন: এটাকে সোজা করার পদ্ধতি হল ঐ পৃষ্ঠাটি বিপরীত দিকে মুড়ে দাও, এখন দেখবে সোজা হয়ে যাবে। তারপর বললেন: নফসের এই কাগজও গোনাহের দিকে মুড়ে আছে। এখন এটাকে সোজা করতে গেলে সে সোজা হয় না। এজন্য তাকে বিপরীত দিকে মুড়ে দিতে হবে এবং অল্প কিছু মুবাহ কাজ ছাড়িয়ে দিতে হবে। যার পরিণামে সে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যাবে এবং রাস্তায় এসে যাবে। এটাও 'মুজাহাদা'।

চার ধরনের মুজাহাদা

এজন্যই সূফীয়ায়ে কেরামের নিকট চার জিনিসের মুজাহাদা করানোর কথা প্রসিদ্ধ। ১। কম খাওয়া। ২। কম কথা বলা। ৩। কম ঘুমানো। ৪। মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা।

কম খাওয়া

১। কম খাওয়া। আগের যমানায় সূফীয়ায়ে কেরাম কম খাওয়ার ব্যাপারে বড় বড় মুজাহাদা করাতেন। এমনকি অনাহারে থাকার অবস্থা হতো। কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন : এই যমানায় এখন আর ঐ ধরনের মুজাহাদার প্রয়োজন নেই। এখন তো মানুষ এমনিতেই দুর্বল। খানা কমিয়ে দিলে তারা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে। ফলে আবার এমন যেন না হয়: পূর্বে যে ইবাদত-বন্দেগী করত সেটা থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেল। এজন্য হযরত বলেন: বর্তমান যমানায় মানুষ একটি বিষয়ের পাবন্দী করলে খানা কম খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। সেটা এই যে, খানা খেতে বসার পর এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন দিলের মধ্যে এ সংশয় সৃষ্টি হয় যে, এখন আরো খাব? নাকি খাবনা? ব্যাস! যখনই এ সংশয় সৃষ্টি হবে তখনই খানা খাওয়া বন্ধ করে দিবে। এর দ্বারা খানা কম খাওয়ার উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যাবে।

আর যখন সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, আরো খাব, নাকি খাব না? বাস্তবে এটা হল আকল ও নফসের মধ্যে লড়াই। কেননা খানা খাওয়ার সময় মজা লাগছে এখন নফস এই তাকাযা করছে যে আরো খানা খেয়ে মজা নিয়ে নাও। কিন্তু আকলের তাকাযা হল: এখন অতিরিক্ত আর খেওনা। এখন অতিরিক্ত খেলে অসুস্থ হয়ে যেতে পার। নফস আর আকলের মাঝে এ লড়াই হয়। এবং এ লড়াইয়ের নাম হল 'সংশয়'।

সুতরাং এ পরিস্থিতিতে নফসের তাকাযাকে ত্যাগ করবে এবং আকলের তাকাযার উপর আমল করবে।

ওজনও কম আল্লাহও রাযী!

এ আলোচনাটি আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ. এবং আমার শায়খ হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. থেকে কয়েকবার শুনেছি। মাওয়ায়েযেও পড়েছি কিন্তু পরবর্তীতে একজন দক্ষ ডাক্তারের প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হল। যাতে তিনি লিখেছিলেন : বর্তমানে লোকজন নিজ শরীরের ওজন কম রাখার জন্য বিভিন্ন

ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। কেউ রুটি ছেড়ে দেয়, কেউ দুপরের খানা ছেড়ে দেয়। আজকালের পরিভাষায় এটাকে 'ডায়েটিং' বলে। ইউরোপে এর বহুল চর্চা আছে। এটি সেখানে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শরীরের ওজন কমানো। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এর চর্চা এত বেশি যে, তারা বড়ি খেয়ে খেয়ে ওজন হ্রাস করার চেষ্টা করে! বরং অনেক সময় এতে মৃত্যুও বরণ করে!!

এরপর ঐ ডাক্তার সাহেব লিখেন: আমার মতে ওজন কমানোর সর্বোত্তম পন্থা হল: মানুষ কোন বেলার খানা স্বতন্ত্রভাবে বর্জনও করবে না, রুটিও কমাবে না। বরং সারা জীবন এমন অভ্যাস বানাবে যে, যতটুকু ক্ষুধা আছে তার থেকে সামান্য কম খেয়ে খানা বন্ধ করে দিবে। এরপরে ঐ ডাক্তার সাহেব হুবহু এ কথাগুলোই লিখেছেন: যখন খানা খেতে খেতে মনের মধ্যে এমন সংশয় জাগবে যে আর খাব, কি খাব না? সে সময় খানা খাওয়া বন্ধ করে দিবে। যে ব্যক্তি এ পরামর্শের উপর আমল করবে, তার কখনো শরীর বেড়ে যাওয়ার বা পাকস্থলী নষ্ট হওয়ার অভিযোগ উঠবে না। আর তার 'ডায়েটিং' করার প্রয়োজনও হবে না।

এ কথাটাই হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কয়েক বছর পূর্বে লিখে গেছেন। এখন আপনি চাইলে ওজন কম করার জন্য এর উপর আমল করতে পারেন। আর চাইলে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ পরামর্শের উপর আমল করতে পারেন। কিন্তু যদি নফসের চিকিৎসা স্বরূপ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ আমল করেন,তবে এ কাজে সাওয়াবও পাবেন এবং ওজনও কমে যাবে। আর যদি শুধু ওজন কমানোর জন্য এমনটি করেন তবে হয়ত ওজন কমে যাবে কিন্তু সাওয়াব মিলবে না।

নফসকে ভোগ-বিলাস থেকে দূরে রাখুন

হযরত থানভী রহ. আমাদের জন্য এ আমলকে কত সহজ করে দিয়েছেন। নতুবা আগের যমানায় তো সূফীয়ায়ে কেরাম আল্লাহ জানেন কী কী সাধনা করাতেন!! সূফীয়ায়ে কেরামের এখানে লঙ্গরখানা থাকত। ঐ লঙ্গরখানায় ঝোল পাকানো হত। খানকায় যে মুরীদগণ থাকতেন তাদেরকে

নির্দেশ দেয়া হত, যার নিকট এক পেয়ালা ঝোল আসবে সে ঐ ঝোলে এক পেয়ালা পানি মিলাবে এরপর খাবে। যাতে নফসকে ভোগ-বিলাসের বন্ধন থেকে মুক্ত রাখা যায়। এ ছাড়া তাদেরকে ক্ষুধার্ত থাকার প্রশিক্ষণও দেয়া হত।

কিন্তু সেই যমানা আর এই যমানা এক নয়। যেমনিভাবে চিকিৎসা বিদ্যায় যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে চিকিৎসা পদ্ধতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। এমনিভাবে হাকীমুল উম্মত রহ. আমাদের যমানা ও আমাদের মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন। খানা কম খাওয়ার এ ব্যবস্থাপত্র আমাদেরকে দিয়ে গেছেন যা দ্বারা খানা কম খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

উদর পূর্তির ক্ষতিসমূহ

এমনভাবে উদর পূর্ণ করে খানা খাওয়া যেন উদরের কোন অংশ খালী না থাকে। যদিও ফিক্হী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয নয়; হারাম নয়, কিন্তু এটা মানুষের শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকারের ব্যাধিসমূহের কারণ ও উপলক্ষ হয়। কেননা যত ধরনের গোনাহ্ আর নাফরমানী আছে তার সবগুলো ভরা পেটেই সংঘটিত হয়। যদি মানুষের পেট ভরা না থাকত, তবে এই গোনাহ্ ও নাফরমানী সংঘটিত হত না। এ জন্যই উদর পূর্তি থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিৎ। এটার নামই হল 'খানা কম করার' মুজাহাদা।

'কম কথা বলা' একটি মুজাহাদা

দ্বিতীয় জিনিস হল : 'কথা কম বলা'। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের যবান কাঁচির মত চলতে থাকে। মানুষের মুখে যা আসছে তাই সে বলছে । কোন বাঁধা-বন্ধন নেই!! এই টি ভুল। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই যবানকে নিয়ন্ত্রণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে গোনাহ্ করতেই থাকবে।

মনে রাখবেন! হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপকারী বস্তু হচ্ছে তার যবান।'

কেননা যখন যবানকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, কোন নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে না; তখন সেই যবান মিথ্যা বলবে, গীবত করবে, মানুষের মনে আঘাত দিবে। এসব গোনাহের কারণে সে জাহান্নামে যাবে।

যবানের গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে যাবে

এ জন্য মানুষকে 'কথা কম বলার' মুজাহাদা করতে হয়। কথা কম বলতে হবে। অনর্থক কথা বলা যাবে না। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলবে। কথা বলার পূর্বে এটা চিন্তা করবে যে, এ কথা বলাটা আমার জন্য সমীচীন হবে কি না? এটা কোন গোনাহের কথা নয় তো? এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ কথা কম বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এরপরে এক পর্যায়ে গিয়ে অবস্থা এমন হয় যে, কথা বলতে মনে চাচ্ছে, কিন্তু সে তার এ বাসনাকে দমন করে। ফলশ্রুতিতে যবানের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণে সে আর মিথ্যা কথা, পরনিন্দা এবং এ জাতীয় অন্যান্য গোনাহে লিপ্ত হয় না।

বৈধ আনন্দের অনুমতি আছে

এই যে অনর্থক বিভিন্ন মজলিস হয়। যেটাকে বর্তমানের পরিভাষায় 'আড্ডা' বলা হয়। কোন বন্ধু মিলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলল: আস! কিছুক্ষণ বসে 'আড্ডা' দেই। এই আড্ডা মানুষকে অনিবার্যভাবে গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, শরীয়ত আমাদেরকে অল্প-বিস্তর আনন্দেরও অনুমতি দিয়েছে। শুধু অনুমতিই দেয়নি বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً

অর্থাৎ, 'অন্তরসমূহকে মাঝে মধ্যে কিছু আরাম দাও'। (কানযুল উম্মাল-৫৩৫৪)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার প্রতি আমাদের কুরবান হওয়া উচিৎ। আমাদের মেযাজ, মন-মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি বুঝ করে ছিলো? তিনি ভালভাবেই জানেন, যদি মানুষকে বলা হয়: আল্লাহ তা'আলার যিকির ব্যতীত আর কিছু করবে না,

সবসময় যিকিরে মশগুল থাকো। তবে তারা এমনটি করতে পারবে না। কেননা তারা ফেরেশতা নয়। এরা তো মানুষ। তাঁদের সামান্য আরাম, সামান্য চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন আছে।

এ জন্য আনন্দের উদ্দেশ্যে কথা বলা, বৈধ রসিকতা করা এগুলো শুধু জায়েযই নয় বরং পসন্দনীয় কাজ এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। কিন্তু একাজে এত বেশি নিমগ্ন হয়ে যাওয়া যে, ঘন্টার পর ঘন্টা নষ্ট হতে থাকে, মূল্যবান সময়ের অপচয় হতে থাকে, এমনটি হলে এ বিষয়টি অনিবার্যভাবে মানুষকে গোনাহের পথে টেনে নিয়ে যায়। এ জন্য বলা হচ্ছে: তোমরা কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে তোল। আর এটাও 'মুজাহাদা'।

মেহমানের সাথে কথাবার্তা বলা সুন্নাত

আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি আসা যাওয়া করতেন। তিনি কথা খুব বেশি বলতেন। কখনো আসলেই এদিক সেদিকের কথা আরম্ভ করে দিতেন। থামার নামও নিতেন না!!

আমাদের সকল বুযুর্গের এটাই নিয়ম ছিল যে, যদি কেউ মেহমান হয়ে সাক্ষাতের জন্য আসে তাহলে তাঁর ইকরাম করতেন। তাঁর কথা শুনতেন। এবং যথাসম্ভব তাঁকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করতেন।

একজন ব্যস্ত মানুষের জন্য এ কাজ কিন্তু সাংঘাতিক মুশকিল। যাঁদের জীবন ব্যস্ততায় পূর্ণ, তাঁরাই জানেন এটা কত বড় মুশকিল কাজ!!

কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, যদি কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন এবং কথাবার্তা আরম্ভ করতেন তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় পর্যন্ত তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না ঐ আগন্তুক নিজেই মুখ ফিরিয়ে নেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

এটা বেশ কঠিন কাজ। কেননা অনেকে লম্বা কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাদের পূর্ণ কথা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোনা এক দারুণ মুশকিল

কাজ! কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের কারণে আমাদের বুযুর্গদের পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তাঁরা আগন্তুকদের কথাবার্তা শুনতেন এবং তাঁদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন।

সংশোধনের একটি পদ্ধতি

কিন্তু যদি কেউ সংশোধনের উদ্দেশ্যে আসতেন তবে তাকে পাকড়াও করতেন।

যাইহোক! ঐ ব্যক্তি এসে কথা শুরু করে দিতেন আর আমার আব্বাজান অসহায়ভাবে তার কথা শুনতে থাকতেন। একদিন তিনি আব্বাজান রহ.-এর নিকট বাইআতের আবেদন করলেন এবং বললেন : হযরত! আমি আপনার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। আমার জন্য কোন ওযীফা বা তাসবীহ বাতলে দিন।

আব্বাজান মরহুম বললেন: 'তোমার জন্য কোন ওযীফা বা তাসবীহ নেই। তোমার কর্তব্য হল: যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সেটার উপর তালা লাগানো। তুমি যে সব সময় কথা বলতে থাক, যবানকে নিয়ন্ত্রণ কর না, এটা ভুল। আগামীতে আসলে একদম চুপ করে বসে থাকবে। যবানের দ্বারা কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না।'

এখন আব্বাজানের পক্ষ থেকে এই পাবন্দীর কারণে ঐ বেচারার উপর কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। খামূশ বসে থাকার মুজাহাদা তার জন্য হাজারো মুজাহাদা অপেক্ষা বেশি কঠিন ছিল। এখন তার দিলে বারবার কথা বলার আগ্রহ পয়দা হয় কিন্তু বাধ্যবাধকতার কারণে না বলতে বাধ্য ছিলেন। আর এই চিকিৎসার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়ে দিয়েছেন। কেননা আমার আব্বাজান এটা বুঝে ফেলেছেন যে, তাঁর মূল রোগ এটা, যখন এটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, তখন সব কাজ সহজ হয়ে যাবে।

ফলশ্রুতিতে কিছু দিন পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন!!

প্রত্যেকের রোগ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ জন্য শায়খ বা মুরশিদ অবস্থা দেখে তদানুযায়ী ব্যবস্থা দেন। তারা বুঝেন, কার জন্য কোন্ চিকিৎসা উপকারী হবে। যাইহোক! এই হল 'কথা কম বলার' মুজাহাদা।

কম ঘুমানো

তৃতীয় মুজাহাদা হল 'কম ঘুমানো'। পূর্বের যুগে না ঘুমানোর মাধ্যমে মুজাহাদা করতে হত। ইমাম আবু হানীফা রহ. ইশার উযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করতেন। কিন্তু বুযুর্গানে দীন বলেন: কম ঘুমানোর সীমারেখা হল: মানুষকে দিনে রাতে কম পক্ষে ছয় ঘন্টা অবশ্যই ঘুমানো উচিৎ। ছয় ঘন্টা থেকে কমাবে না। নতুবা অসুস্থ হয়ে যাবে।

হযরত থানভী রহ. বলতেন: যদি কারো অসময়ে ঘুমানোর বদ অভ্যাস থাকে, তবে সে এটাকে খতম করে দিবে। এটাও কম ঘুমানোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। এবং এটাও 'মুজাহাদা'।

লোকজনের সাথে মেলামেশা কম করা

চতুর্থ মুজাহাদা হল 'মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা'। কেননা মানুষের সাথে সম্পর্ক যত বেশি হয় তত বেশি গোনাহের আশংকা। প্রয়োজনে আপনি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন।

বর্তমানে তো 'সম্পর্ক বাড়ানো' একটি নিয়মতান্ত্রিক শাস্ত্র হয়ে গেছে। যাকে 'পাবলিক রিলেশন' বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াও, নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াও। আর ঐ সম্পর্কের ভিত্তিতে আপন কার্যসিদ্ধ কর।

কিন্তু আমাদের বুযুর্গানে দীন এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। এবং বলেছেন: বিনা প্রয়োজনে যেন সম্পর্ক বাড়ানো না হয়। বরং সম্পর্ক কম রাখাই বাঞ্ছনীয়।

দিল হল একটি আয়না

কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের দিলকে আয়না বানিয়েছেন। মানুষের সামনে যে চিত্র আসে সেটার প্রতিবিম্ব দিলের মধ্যে জমে যায়। এজন্য যখন মানুষের সম্পর্ক বেশি হবে তখন ভাল-মন্দ সব ধরনের মানুষই আসবে। আর

যখন মন্দকাজে ব্যস্ত মানুষের সাথে মেলামেশা হবে, তখন তাদের ঐসব মন্দ কাজের প্রতিবিম্বও অন্তরে পড়বে। এতে দিল খারাপ হয়ে যাবে। এজন্য বলা হয়েছে: অন্য মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে বেশি মেলামেশা করবে না। মানুষের সাথে সম্পর্ক যত কম হবে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সাথে সম্পর্ক তত বেশি হবে।

মাওলানা রূমী রহ. বলেন :

تعلق حجاب است و بے حاصلی
چوں پیوندہا بگسلی واصلی

অর্থাৎ, এসব সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলা কে পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। দুনিয়ার চীজ ও আসবাবের সাথে মহব্বত যত বাড়বে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ততই কমতি দেখা দিবে।

অবশ্য 'হুকূকুল ইবাদ' অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি করা উচিৎ নয়। কিন্তু তাই বলে বিনা কারণে সম্পর্কের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। এটাকেই বলে: 'মাখলূকের সাথে মেলামেশা কম করা'।

যাইহোক! এসব মুজাহাদা এ জন্যই করানো হয় যাতে আমাদের নফস আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এ জন্য প্রতিটি মানুষেরই এ মুজাহাদা করা উচিৎ। আর উত্তম হল কোন পথ প্রদর্শকের তত্ত্বাবধানে এ মুজাহাদা করা। নিজ মর্জি ও ফয়সালা অনুযায়ী না করা। কেননা যদি নিজে নিজেই ফয়সালা করা হয় যে, আমি কতটুকু খাব বা খাব না, কতক্ষণ ঘুমাব, মানুষের সাথে কী পরিমাণ সম্পর্ক রাখব ইত্যাদি; তবে সে ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যখন কোন পথপ্রদর্শকের তত্ত্বাবধানে থেকে এ কাজ করবে, তখন ইনশাআল্লাহ এর উপকারিতা হাসিল হবে। আর প্রতিটি কাজে ভারসাম্য বজায় থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পচিশতম মজলিস

ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক মুজাহাদার পার্থক্য

ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক মুজাহাদার পার্থক্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّابَعْدُ

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন:

'ইখতিয়ারী' বা ঐচ্ছিক মুজাহাদার মধ্যে যেহেতু কাজের প্রাধান্য থাকে। এজন্য এতে নূর বেশি থাকে। কেননা আমলের উপর ভিত্তি করেই নূর পয়দা হয়। পক্ষান্তরে 'ইয্তিরারী' বা বাধ্যতামূলক মুজাহাদায় কাজ কম হয়, এজন্য এতে নূরানিয়ত কম হয়। কিন্তু কাজের প্রতিক্রিয়া গ্রহণের প্রাধান্য থাকে। এজন্য যোগ্যতায় শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর স্বয়ং ঐচ্ছিক আমলসমূহের দৃঢ়তার জন্য ঐ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ বা যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। এ জন্যই বুযুর্গানে দীন এ জাতীয় মুজাহাদা প্রচুর পরিমাণে করিয়ে থাকেন।(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৩)

গতকাল যেমন আরয করা হয়েছিল 'মুজাহাদা'র অর্থ হল: নফসের বিরোধিতা করা এবং নফসের চাহিদাগুলোকে আল্লাহর জন্য পিষে ফেলা। এ বাণীটিতে হযরত থানভী রহ. মুজাহাদার দুই প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল ইখতিয়ারী (ঐচ্ছিক) মুজাহাদা আর অপরটি হল ইয্তিরারী (বাধ্যতামূলক) মুজাহাদা।

ঐচ্ছিক মুজাহাদা

ইখতিয়ারী (ঐচ্ছিক) মুজাহাদা। যখন কোন তালেব কোন শায়খের নিকট ইসলাহের উদ্দেশ্যে রুজু করে, তখন ঐ শায়খ এ কথার জরুরত অনুভব করতে পারেন যে, এ তালেবকে অমুক ধরনের মুজাহাদা করাতে হবে। ফলে শায়খ এ তালেবকে এ কাজে লাগিয়ে দেন। যেমন শায়খ

আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর ছেলের কিচ্ছা আছে। যখন তিনি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের পিতার খেলাফতপ্রাপ্ত জনৈক শায়খের নিকট পৌছলেন, তখন তিনি তাকে হাম্মাম (গোসলখানা) এর খিদমতে লাগিয়ে দিলেন। ফলে তিনি হাম্মামের আগুন জ্বালিয়ে নামাযীদের জন্য পানি গরম করতে থাকলেন। এটা ছিল 'ইখতিয়ারী মুজাহাদা' কেননা তাঁর জন্য হাম্মামের খেদমত কোন জরুরী বিষয় ছিল না। কিন্তু শায়খ তাঁকে এ কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। অথবা মনে করুন কোন শায়খ কোন তালেবকে বলে দিলেন : 'তুমি দৈনিক ১০০ রাকাত নফল নামায পড়বে।' এটা হল ইখতিরায়ী মুজাহাদা। যেহেতু শায়খ নিজ ইচ্ছায় তালেবের কাছ থেকে ঐ কাজ নিচ্ছেন।

ইয্তিরারী মুজাহাদা

দ্বিতীয় মুজাহাদা হল 'ইযতিরারী'। এতে মানুষের নিজ ইখতিয়ার ও ইচ্ছার দখল থাকে না। কিন্তু গাইরে ইখতিয়ারীভাবে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যদ্দরূন মানুষকে নিজ নফসের বিরোধিতা করতে হয়। অথবা মনে করুন কোন দুঃখজনক ব্যাপার বা কষ্টদায়ক হালত তার সামনে এসে গেল। এই সব হল 'ইযতিরারী মুজাহাদা'।

উদাহরণস্বরূপ: কোন স্নেহাস্পদ নিকটাত্মীয় ইন্তিকাল করলেন। যদ্দরূন মনে কষ্ট লাগল, এখানেও নফসের বিরোধিতা হল। কেননা নফসতো চাচ্ছিল যেন সে আরো বেশি দিন বেঁচে থাকে। কিন্তু তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। সুতরাং এটা 'ইযতিরারী মুজাহাদা' হল। অথবা নফস চাচ্ছিল স্বাস্থ্য ও সুস্থতা অটুট থাকুক। কোন অসুখ না আসুক, কিন্তু দেখা গেল কোন অসুখ হয়ে গেছে যদ্দরূন কষ্ট হল। এটা 'ইযতিরারী মুজাহাদা।'

যাইহোক! একটা মুজাহাদা হল, যেটা মানুষ নিজ ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে আ াম দেয়। তার সামনে দুটো পথ খোলা থাকে। চাই সে আমল করুক বা না করুক। এটা হল ইখতিয়ারী বা ঐচ্ছিক মুজাহাদা। দ্বিতীয় মুজাহাদা হল, যেটা নিজ ইখতিয়ারে হয় না বরং এমন হালত সামনে আসে যদ্দরূন মানুষের দুঃখ-কষ্ট হয়, এটা ইযতিরারী মুজাহাদা।

নিজ মর্জি মাফিক ইখতিয়ারী মুজাহাদা করবেন না

অবশ্য এই ইখতিয়ারী মুজাহাদা নিজ মর্জি মাফিক করবেন না। যেমন, আপনি ওয়াযের মধ্যে শুনলেন : 'অবশ্যই মুজাহাদা করতে হবে। নফসকে পিষে ফেলতে হবে' ব্যাস! এটা শুনে নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমি অমুক মুজাহাদা করব! মনে রাখবেন! নিজ মর্জি মাফিক মুজাহাদা দ্বারা আরো বেশি ক্ষতির আশংকা আছে। এজন্য ইখতিয়ারী মুজাহাদা সব সময় নিজের শায়খের নেগরানী ও নির্দেশ অনুযায়ী করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে করবে না।

আমাদের দারুল উলূম করাচীতেও একবার কোন কোন ছাত্র নিজ মর্জিতে মুজাহাদা করা শুরু করে দিল। কেউ এ মুজাহাদা অবলম্বন করল যে, আমি খানা খাব না! কেউ সিদ্ধান্ত নিল যে, আমি শুধু খেজুর দ্বারা ইফতার করব! এ জাতীয় মুজাহাদা শুরু করে দিল! ফলশ্রুতিতে উপকারের পরিবর্তে উল্টো ক্ষতি হল! এ জন্য ইখতিয়ারী মুজাহাদা সব সময় কোন শায়খের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিৎ।

ইখতিয়ারী মুজাহাদায় নূরানিয়ত

যাইহোক! ইখতিয়ারী মুজাহাদা হোক কিংবা ইযতিরারী। উভয়টির দ্বারাই উন্নতি হয়। এবং উভয়টির মাধ্যমে আল্লাহর পথের পথিক আল্লাহর সন্তুষ্টির মন্‌যিলের নিকটে পৌঁছে যায়।

অবশ্য এ বাণীতে হযরত থানভী রহ. উভয় মুজাহাদার পার্থক্য বয়ান করেছেন। হযরত বলেছেন : ইখতিয়ারী মুজাহাদা যেহেতু মানুষ নিজ কাজ ও ইখতিয়ারে সম্পাদন করে এবং স্বীয় ইখতিয়ারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জন্য নফসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এ কারণে এ মুজাহাদায় নূরানিয়াত বেশি অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে 'ইযতিরারী মুজাহাদা'য় তো সে নিজের পক্ষ থেকে কিছু করেনি বরং আল্লাহ পাকের তাকদীর দ্বারা আপনা আপনি অবস্থা এমন পয়দা হয়েছে যে, এ কারণে তার দুঃখ-কষ্ট পৌঁছেছে। এ জন্য এ মুজাহাদায় বাহ্যিকভাবে নূরানিয়াত কম হয়। কেননা নূরানিয়াতের ফলে মানুষের মনে প্রফুল্লতা আসে অথচ ইযতিরারী মুজাহাদায় দুঃখ ও কষ্ট হয়। এজন্য এ মুজাহাদায় ঐ জাতীয় নূরানিয়াত হাসিল হয় না।

ইযতিরারী মুজাহাদার দ্বারা যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া

কিন্তু যেহেতু এই মুজাহাদা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। এ জন্য এ মুজাহাদার ফলে মানুষের মধ্যে যোগ্যতা বেশি পয়দা হয়। এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ভাল কাজের যোগ্যতা দিয়ে দেন।

এর কারণ হযরত থানভী রহ. এই বয়ান করেছেন যে, ইখতিয়ারী মুজাহাদার মধ্যে 'কাজের' দখল থাকে। আর ইযতিরারী মুজাহাদার মধ্যে 'কাজের প্রতিক্রিয়ার' দখল থাকে। এজন্য কোন মুজাহাদাই উপকার শূন্য নয়।

ইযতিরারী মুজাহাদায় উন্নতি দ্রুত গতিতে হয়

আমি আমার শায়খ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলতেন: এমনিতেতো ইখতিয়ারী ও ইযতিরারী উভয় মুজাহাদাই উপকারী ও কার্যকরী। কিন্তু ইযতিরারী মুজাহাদায় যত দ্রুত উন্নতি হয় ইখতিয়ারী মুজাহাদায় অত দ্রুত উন্নতি হয় না।

এর কারণ কি? এর কারণ হল: ইযতিরারী মুজাহাদাতো আর তুমি নিজ মর্জিতে অবলম্বন করনি বরং আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত ও ইখতিয়ারে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐসব অবস্থায় পার করেছেন। যখন তুমি এসব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করেছ, এগুলোকে কবূল করেছ, সবকিছু আল্লাহর উপর সোপর্দ করেছ, ফলে তোমার উন্নতি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে হবে। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তার মধ্যে নূরানিয়াত নজরে আসে না।

মনে করুন এক ব্যক্তি নিজ ইখতিয়ারে নফল নামায পড়ছে এবং মুজাহাদা করছে এবং সারা রাত নফল নামাযে ব্যয় করছে, এ মুজাহাদার বদৌলতে তার মনে এজন্যই প্রফুল্লতা ও আনন্দ সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটি নেক কাজ করার তাওফীক দান করেছেন।

অন্য দিকে আরেক ব্যক্তি যার কোন প্রিয়জনের ইন্তিকাল হয়ে গেছে অথবা কেউ তাকে বকাঝকা করেছে বা অন্য কোনভাবে দুঃখ দিয়েছে যদ্দরূন তার কষ্ট হচ্ছে; তার এ আমলে নূরানিয়াত ও মজা কীভাবে আসবে?

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ কার্য দ্বারা তার উন্নতি সাধন করছেন যাতে সে কোনভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

ইযতিরারী মুজাহাদার মধ্যে ধৈর্যও অন্তর্ভূক্ত

এর কারণ হল ইযতিরারী মুজাহাদা ধৈর্যের তাকাযা করে। অর্থাৎ, এই তাকাযা করে, যেন মানুষ এ সব কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে।

ধৈর্যশীলদের জন্য কুরআনে পাকে অঙ্গীকার করা হয়েছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে বিনা হিসেবে তাঁদের পুরস্কার দেয়া হবে।' (সূরা যুমার-১০)

যাইহোক! এই ইযতিরারী মুজাহাদার দ্বারা অনেক সময় খুব দ্রুত উন্নতি হতে থাকে।

ইযতিরারী মুজাহাদায় কুমন্ত্রণার আশংকা নেই

যারা ইখতিয়ারী মুজাহাদা করেন তাদের অনেক সময় মনের মধ্যে এমন খেয়াল আসে যে, আমি মুজাহাদা করছি!! এরপরে যখন এর মধ্যে নূরানিয়াত অনুভূত হয় তখন তার মজাও লাগে। যে কারণে ঐ মুজাহাদায় নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণার আশংকাও থাকে। কিন্তু ইযতিরারী মুজাহাদায় এসব কুমন্ত্রণা আসে না, এ কারণে মানুষ ইযতিরারী মুজাহাদার দ্বারা সোজা মনযিল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাই বলে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের পক্ষ থেকে ইযতিরারী মুজাহাদা তলব করবে না। আল্লাহ তা'আলার নিকট রোগ, কষ্ট এবং দুঃখ প্রার্থনা করবে না। বরং এ দু'আ করবে 'হে আল্লাহ! আমি রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি।' কিন্তু অসুখ, কষ্ট বা মুসীবত এসে পড়লে ঐ সময় ধৈর্যধারণ করবে। এবং এটা চিন্তা করবে যে, আমাকে এর মাধ্যমে ইযতিরারী মুজাহাদা করানো হচ্ছে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উন্নতি দিতে চান।

কষ্ট-পেরেশানীর মুহূর্তে ইযতিরারী মুজাহাদার কথা চিন্তা করা

এ পৃথিবীতে মানুষের সামনে যত দুঃখ-কষ্ট আসে ঐ সব দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে যদি মানুষ একটু খেয়াল করে যে, আমার এ দুঃখ-কষ্টের দ্বারা আসলে আমার ইযতিরারী মুজাহাদা হচ্ছে। ইখতিয়ারী মুজাহাদা করার তাওফীক তো আমার হয় না, যে ঐ ইখতিয়ারী মুজাহাদার মাধ্যমে আমি উন্নতি হাসিল করব। এর সুযোগ আমার হয়ে উঠে না। আমার নফস আমাকে এ মুজাহাদা করতে দেয় না। হয়ত এ জন্য আল্লাহ পাক আমাকে ইযতিরারী মুজাহাদায় লাগিয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা না জানি আমার কত গোনাহ মাফ হচ্ছে, কত দরজা বুলন্দ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার কত নৈকট্য অর্জিত হচ্ছে।

উলামায়ে কেরাম বলেন : ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার যে পরিমাণ নৈকট্য লাভ হয় অন্য কোন জিনিস দ্বারা সেটা হয় না।

এ জন্য যখনই কোন দুঃখ-কষ্ট বা পেরেশানী আসবে তখনই মানুষ এটা চিন্তা করবে যে, এটা ইযতিরারী মুজাহাদা, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে। আর এর মধ্যেই আমার উপকার ও কল্যাণ নিহিত আছে। এ ভাবে চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ ঐ দুঃখ-ব্যাথা হাল্কা হয়ে আসবে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যতটুকু উন্নতি হওয়ার কথা আছে সেটাও হবে।

আমার ব্যক্তিগত একটি ঘটনা

যখন সুপ্রীম কোর্টের শরীয়া ব্যাঞ্চে আমাকে নিয়োগ দেয়া হল। তখন সাময়িকভাবে আমাকে দারুল উলূম ছেড়ে ইসলামাবাদ যেতে হল। যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তারপরও শাবান-রামাযানের ছুটিতে প্রায় দেড় মাস সেখানে কাটাতে হল। এর পূর্বে কখনো এত লম্বা সময় দারুল উলূম থেকে দূরে থাকা হয়নি। এজন্য এ সফরে আমার দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। বরং একটা মুহূর্তও ইসলামাবাদে কাটানোটা দুর্বিষহ মনে হচ্ছিল! এ পুরো বৃত্তান্ত আমি আমার শায়খ হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর নিকট লিখে পাঠালাম। উত্তরে হযরত আরেফী রহ. লিখলেন: 'এসব ইযতিরারী মুজাহাদা হচ্ছে। চিন্তা কর না, সব ঠিক হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ'।

পরবর্তীতে যখন হযরত রহ. এর সাথে সাক্ষাত হল, তখন হযরত বললেন : দেখ! ইযতিরারী মুজাহাদা এভাবে হয় যে, মানুষ চায় না সেই কাজটি হোক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তাকদীর ও তাখলীকের দ্বারা ঐ কাজটি হয়ে যায়। যদি মানুষ এর উপর ধৈর্য ধারণ করে ও সন্তুষ্ট থাকে, তবে এই ইযতিরারী মুজাহাদা দ্বারা অনেক সময় মানুষের উন্নতি খুব দ্রুত গতিতে হয়।

যাই হোক। আল্লাহ তাআলার নিকট মুসীবত-দুঃখ-কষ্ট এগুলো কামনা করবে না বরং এগুলো থেকে পানাহ চাইবে। কিন্তু এগুলো এসে পড়লে তখন চিন্তা করবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার মর্তবা বুলন্দ করতে চাচ্ছেন।

ইযতিরারী মুজাহাদার উপকারিতা

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন:

> 'মুজাহাদায়ে ইযতিরারিয়্যাহ' এর কারণে যদি আমলের মধ্যে স্বল্পতাও আসে আর শুধু ফরয ও ওয়াজিব সমূহের উপর আমল হতে থাকে তবুও পূর্ণ মুজাহাদার সাওয়াব পাওয়া যায়।
>
> (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৩)

উদাহরণস্বরূপ: ইযতিরারী মুজাহাদায় কোন ব্যথা বা পেরেশানী আসল, যদ্দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নফল ইত্যাদি মামূলাত ছুটে গেছে এবং স্রেফ ফরয-ওয়াজিব আমল করা হচ্ছে, তাহলে যদিও বাহ্যিকভাবে মামূলাত ছুটে যাওয়া এবং নফলসমূহ কম হওয়ার কারণে আমলের মধ্যে স্বল্পতা হল, কিন্তু আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এই ইযতিরারী মুজাহাদার বরকতে পূর্ণ মুজাহাদার সওয়াব দান করবেন।

মামূলাত ছুটে যাওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ সওয়াব

উদাহরণস্বরূপ: ঘরে পিতা-মাতার মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে গেছে, এখন তাঁদের সেবা শুশ্রুষায় সময় পার হচ্ছে– তিলাওয়াতের সুযোগ হচ্ছে না, তাসবীহ পাঠের সুযোগ হচ্ছে না। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে অনেক সময় খুব

খারাপ লাগে যে, এ কাজে মশগুল হওয়ার কারণে আমার তিলাওয়াত ছুটে গেল, মামূলাত ছুটে গেল! এ ব্যাপারেই হযরত থানভী রহ. বলছেন: ব্যাপারটাকে অন্তর থেকে বের করে দাও। কেন? কারণ, যে কষ্ট তোমার উপর চেপে বসেছে, যা তোমার থেকে এই ইবাদত ছুটিয়ে দিয়েছে; এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বঞ্চিত করবেন না। বরং অসম্ভব নয় যে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বেশি দান করবেন।

সময়ের চাহিদাকে দেখুন

ব্যাস! দীনের সহীহ্ বুঝ হল এটাই যে, আপনাকে দেখতে হবে কোন সময়ের কী চাহিদা? ঐ সময়ে ঐ কাজ আঞ্জাম দিবেন। আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ্ খান সাহেব রহ. বলতেন : নিজ শখ পূর্ণ করার নাম 'দীন' নয়। একেক জনের একেক বিষয়ে শখ থাকে। সে তার শখ পূর্ণ করছে! 'দীন' এর নাম নয়। বরং 'দীন' হল 'অনুসরণ' এর নাম। অর্থাৎ এ সময় আমার নিকট কী দাবী? ঐ দাবীকে আঞ্জাম দিতে হবে। এটাই 'দীন'।

মুফতী হওয়ার আগ্রহ

একজন ছাত্র আমার নিকট আসল এবং বলল: 'আমার তাখাসসুস বিভাগে ভর্তি হওয়ার খুব শখ'!! আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: তোমার আব্বা-আম্মার কী মত? সে বলল: তাঁদের মত হল আর পড়া-লেখা না করা। অর্থাৎ, তাঁরা নিষেধ করছেন, কিন্তু আমার দারুণ শখ! আমি না পড়লে আমার এ শখ পূর্ণ হবে না।

আমি বললাম: পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব। আর মুফতী হওয়া কোন ওয়াজিব বা ফরযে আইন নয়। যদি পিতা-মাতা পড়াতে না চান বরং নিজেদের জরুরত ও প্রয়োজনে এমন কোন কাজে লাগাতে চান যা 'মুবাহ', হারাম বা নাজায়েয নয়। তাহলে এমতাবস্থায় পিতা-মাতার হুকুম মান্য করা ওয়াজিব। মুফতী হওয়া ওয়াজিব নয়।

অথবা মনে করুন পিতা-মাতা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁদের

আপনার সেবার প্রয়োজন। কিন্তু আপনি নিজ শখ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এমন ইলম শিখার জন্য বাড়ী থেকে বের হয়ে গেছেন যা ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কেফায়াহ। যেমন পূর্ণ আলেম হওয়া অথবা 'আলেম সনদ' হাসিল করা ফরযে আইন নয়। যদি পিতা-মাতা অসুস্থ হন আর তাঁদের আপনার খেদমতের প্রয়োজন থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সময়ের দাবী হল, তাঁদের খেদমত করা এবং দীনের কেবলমাত্র জরুরী বিষয়ের ইলম হাসিল করা।

তাবলীগ বা জিহাদের শখ

অথবা মনে করুন কারো জিহাদে যাওয়ার শখ হল। এখন আর তার এই চিন্তা নেই যে, পিতা-মাতার অনুমতি আছে কি না? আমার অবস্থা জিহাদে যাওয়ার উপযোগী কিনা? আর আমার জন্য এ সময় কোন জিনিসটা বেশি উপযুক্ত? এ সবের কোন চিন্তা নেই। ব্যাস! জিহাদের জন্য বেরিয়ে গেল! অথবা মনে করুন তাবলীগে যাওয়ার এবং চিল্লা লাগানোর শখ হল। এখন ঘরে পিতা-মাতা অথবা স্ত্রী অসুস্থ!! এর কোন পরোয়া নেই। তাহলে তো এটা দীনের উপর আমল হল না বরং আপন শখ পূর্ণ করা হল। অথচ আপন শখ পূর্ণ করার নাম দীন নয়।

এ জন্য দেখতে হবে কোন্ মুহূর্তে শরীয়তের কী তাকাযা? ঐ তাকাযা কে পূর্ণ করুন। এসব কথার কারণেই অনেকে অসন্তুষ্ট হন। আর মন্তব্য করেন: ইনি আমাদেরকে মুফতী হতে দিচ্ছেন না, ইনি আমাদেরকে জিহাদে যেতে দিচ্ছেন না! ইনি তাবলীগের শত্রু!!

প্রতিটি কাজের একটি সময় থাকে

খুব বুঝে নিন। প্রতিটি কাজের একটি সময় থাকে। প্রতিটি সময়ের একটি তাকাযা থাকে। ঐ সময়ে ঐ কাজ করলে সেটা সওয়াব এবং বড় ফযীলতের উপলক্ষ হবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ কাজকে অসময়ে অপাত্রে আঞ্জাম দেয়া হয় তবে সেটা বাড়াবাড়ি ও দীন বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হবে। সেটা তো শুধু নিজ শখ পূর্ণ করা হবে। 'তাবলীগ' হবে না। 'দীন' হবে না। দীনের অর্থ হল: এ সময়ে শরীয়তের তাকাযা কী? সেটা বুঝার চেষ্টা করা।

মা'মূলাত ছুটে গেলে দুঃখ করো না

যদি পিতা-মাতা অসুস্থ থাকেন। আর তাঁদের খেদমতের কারণে তিলাওয়াত-তাসবীহাত ছুটে যায় অথবা স্ত্রী অসুস্থ, তাঁর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে এসব জিনিস ছুটে গেছে। তবে মনে কোন কষ্ট নিবে না। কেননা এ সময় শরীয়তের তাকাযাই ছিল তাঁদের খেদমত করা। এ জন্য ইনশাআল্লাহ তিলাওয়াত ও তাসবীহাতের পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দীনের সহীহ বুঝ দান করুন এবং আপন রহমতে আমাদেরকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ছাব্বিশতম মজলিস

আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার পথ

আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার পথ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّا بَعْدُ

হযরত থানভী রহ. বলেন :

طُرُقُ الْوُصُوْلِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার পথের সংখ্যা ঐ পরিমাণ রয়েছে, যে পরিমাণ মাখলূকের শ্বাস রয়েছে।'

যেমনিভাবে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অর্জনের একটি পথ হল হারাম শরীফে নামায পড়া। এটাও একটি পথ যে, কোন ওযরে ঘরে নামায পড় আর হারামের জন্য আন্তরিক আকাংখা করতে থাক। (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৩)

এটা বুযুর্গানে দীনের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি যা আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ। এর মর্ম হল: যেমনিভাবে প্রতিটি মানুষের শ্বাস ভিন্ন। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তাও বিভিন্ন। প্রত্যেক মানুষকে গদবাঁধা একই নিয়ম বাতানো মুশকিল।

সমস্ত মানুষের জন্য একই পথ জরুরী নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার অসংখ্য পথ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই পয়দা করে রেখেছেন। যদি কারো হারাম শরীফে উপস্থিতির সুযোগ নসীব হয় তবে সে এ উপস্থিতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। আর যার এমন সুযোগ হয়নি সে নিজেকে বঞ্চিত মনে করবে না। তার জন্য হারাম শরীফে উপস্থিতির আগ্রহ ও আফসোসই নৈকট্য অর্জনের উপলক্ষ হতে পারে।

ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ আদায় করা, গোনাহ্ ও অন্যায় কর্মকাণ্ডসমূহ হতে বেঁচে থাকা সবার জন্যই জরুরী। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য

এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র ঠিক করা হয়। এর জন্য কোন পথপ্রদর্শক ও শায়খের প্রয়োজন হয়। যিনি এটা বাতলে দেন যে এ ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পথ কোন্‌টি?

ওযরের কারণে ঘরে নামায পড়া

এ কথাটাকেই হযরত থানভী রহ. একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার একটি পথ হল হারাম শরীফে নামায পড়। এমনিভাবে একটি পথ এটাও যে ওযরের কারণে ঘরে নামায পড় এবং হারামের জন্য আফসো করতে থাক।

হযরত বলেন: উভয় সূরতেই পৌঁছা যায়। হারামে নামায পড়ার মাধ্যমেও পৌঁছা যায় আবার ওযরের কারণে ঘরে নামায পড়ছে, এর দ্বারাও পৌঁছা যায়। ওযরের কারণে ঘরে নামায আদায়কারী যেন এমনটি না ভাবে যে, আমার পথ পৃথক হয়ে গেছে। বরং ওযরের কারণে ঘরে নামায পড়াও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের জন্যই।

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ تُؤْتٰى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ اَنْ تُؤْتٰى عَزَائِمُهُ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা 'রুখসাত' বা তাঁর পক্ষ থেকে ছাড় দেয়া ব্যাপারসমূহের উপর আমল করাকে এরকমই পসন্দ করেন যেমন পসন্দ করেন 'আযায়েম' বা দৃঢ়তাপূর্ণ (স্বাভাবিক) ব্যাপারসমূহে আমল করাটাকে।'

কাজেই এটা মনে করা উচিৎ নয় যে শুধু 'আযায়েমের' উপর আমল করলেই আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। বরং 'রুখসুতের' উপর আমল করলেও আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার নেয়ামতে ধন্য হবে।

যদি জায়েয ও শরীয়ত অনুযায়ী ওযর হয় এবং এর উপর বাস্তবিক নিশ্চিন্ত ভাব থাকে যে এটা ওযরের হালত, তাহলে ঐ সময় 'রুখসাতের' উপর আমল করলেও ইনশাআল্লাহ ঐ সাওয়াব এবং ঐ নূর ও বরকতই হাসিল হবে যা আযায়েমের উপর আমল করার সূরতে হাসিল হয়।

কাযার সময়ও সেই নূর সেই বরকত!!

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন: যদি রামযানুল মুবারকে কোন শরয়ী অপারগতার কারণে রোযা ছুটে যায়, উদাহরণস্বরূপ: অসুস্থতার কারণে অথবা মহিলাদের মাসিকের অপারগতার দরূন রোযা ছুটে যায় তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা যখন তোমরা অন্যান্য সাধারণ দিনে এ রোযাগুলোর কাযা করবে তখন এ দিনগুলোতেও ঐ সমস্ত নূর ও বরকতই অর্জিত হবে যা রামযানুল মুবারকের আনওয়ার ও বারাকাত ছিল। কেননা আমি তোমাকে রামযানের ঐ দিনগুলোতে রোযা রাখা থেকে অপারগ করে দিয়েছি, তবে কি সে কারণে রামযানের ফযীলত ও রামযানের বারাকাত থেকেও বঞ্চিত করে দিব? এটা তো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন ভাল আশাবাদ হল না। বরং আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে এ আশাই রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কাযার মধ্যেও সেই বরকত, পুরস্কার ও সওয়াবই দান করবেন।

দীন হল 'অনুসরণ' এর নাম

যেমনটি আমি ইতোপূর্বেও আরয করেছি। পুরো দীন 'অনুসরণ' এর নাম। তিনি যেমন বলেন তেমন কর: নিজ বিবেক খাটিয়োনা।

چوں کہ برخت بہ بند و بست باش

چوں کشاید چابک و برجست باش

অর্থাৎ, যতক্ষণ তিনি বেঁধে রাখেন ততক্ষণ তুমি বাঁধা অবস্থাতেই পড়ে থাক। আর যখন তিনি বন্ধন খুলে দেন তখন খুব লাফাতে থাক।

এ জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন যে অবস্থায় রাখেন ঐ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے

یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

অর্থাৎ, বিচ্ছেদও ভাল নয়, মিলনও ভাল নয়,

বন্ধু যে অবস্থায় রাখেন ঐ অবস্থাই ভাল হয়।

‘ইত্তিবা’ এবং ‘তাফভীয’ অবলম্বন করুন

ব্যাস! দু'টি জিনিস অবলম্বন করুন। ১। ইত্তিবা বা অনুসরণ। ২। তাফভীয বা আত্মসমর্পণ।

আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে হবে ‘ইত্তিবা’। আর অবস্থার ক্ষেত্রে হবে ‘তাফভীয’। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে আদেশ বা নিষেধ আসে সেগুলোর অনুসরণ করুন আর দুনিয়াবী যে সব হালত পেশ আসবে সেখানে ‘তাফভীয’ অবলম্বন করুন। ‘তাফভীয’ এর অর্থ হল, নিজেকে আল্লাহর হাওয়ালা করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা। এ বিশ্বাস রাখা যে পরিনাম যেটা হবে সেটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হবে। সেটাতেই কল্যাণ নিহিত।

যদি এ দুটো বস্তু হাসিল হয়ে যায় তবে বুঝে নিবেন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী হয়ে গেছে।

নেক কাজের অনুশোচনা

হযরত থানভী রহ. এ বাণীটির শেষাংশে বলেছেন : ওযরের কারণে ঘরে নামায পড় আর হারাম শরীফের জন্য আফসোস করতে থাক। এই আফসোস আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়, অর্থাৎ মানুষ কোন কারণে যদি একটি নেক আমল করতে না পারে ফলে মনে মনে সেটা না করার উপর আফসোস হয় যে হায়! কতইনা ভাল হত যদি আমার মধ্যে ঐ শক্তি এসে যেত তাহলে আমিও ঐ নেক কাজটি করতাম। এই ‘আফসোস’ও অনেক সময় মানুষকে অনেক উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রহ. ও জনৈক কামারের ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রহ. কে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অনেক মেহেরবানী করেছেন। অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু আমার বাসার সামনে যে কামার থাকত তার যে মর্যাদা লাভ হয়েছে সেটা আমার লাভ হয়নি।

অথচ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এত বড় বুযুর্গ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সূফী, আল্লাহর খাস ও নেক বান্দা ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কামারের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারেননি!!

লোকজন ঐ কামারের বাসায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো আপনার স্বামীর এমন কী বৈশিষ্ট্য ছিল যদ্দরূন তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকেও সর্বদায় বেড়ে গেছেন যে কারণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ঐ মর্যাদার উপর আফসোস করছেন?

তাঁর স্ত্রী বললেন : এমন বিশেষ কোন আমল তো তাঁর ছিল না, সারা দিন লোহা পিটাতেন। অবশ্য তাঁর মধ্যে দুটি গুণ ছিল– ১। আযানের আওয়ায কানে আসা মাত্রই কাজ বন্ধ করে দিতেন। এমনকি হয়ত হাতুড়ি মারার জন্য মাথার উপরে উঠিয়েছেন, ঠিক ঐ সময়ে আযানের আওয়ায কানে পড়ল; ফলে সেই হাতুড়ি দিয়ে আর লোহায় আঘাত করতেন না বরং ঐ উত্থিত হাতুড়িটি পিছনের দিকেই নিক্ষেপ করতেন এবং উঠে নামাযের জন্য মসজিদে চলে যেতেন। ২। তাঁর দ্বিতীয় গুণ ছিল এই যে, আমাদের বাসার সামনেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর বাসা ছিল। তিনি নিজ বাসার ছাদে শেষ রাত্রে এমনভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যেমন নাকি গাছ দাঁড়িয়ে থাকে। আমার স্বামী তাঁকে দেখে খুব আফসোসের সাথে বলতেন: ‘আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিকা নির্বাহের চিন্তা থেকে অব্যাহতি দান করেছেন। যদ্দরূন তিনি সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে পারেন, যদি আমিও তাঁর মত জীবিকার চিন্তা হতে মুক্ত থাকতে পারতাম তবে কিছু ইবাদত করতে পারতাম। কিন্তু জীবিকার ফিকিরে সারা দিন লোহা পিটাতে হয়, ফলে ক্লান্তির কারণে রাত জাগার হিম্মত হয় না। নতুবা আমিও তাহাজ্জুদের কয়েক রাকাত পড়তাম!

এভাবে তিনি আফসোস। প্রকাশ করতেন। লোকজন এটা শুনে বললেন : ব্যাস! এটাই সে কারণ যে কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ঐ মর্যাদা দান করেছেন যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এরও নসীব হয়নি।

যাইহোক! এ অনুশোচনাও মানুষকে কত উচ্চতায় পৌঁছে দেয়!

শরীর থাকবে দেশে আর অন্তর থাকবে হারাম শরীফে

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলেন: শরীর হিন্দুস্তানে আর মন হারাম শরীফে এটা ঐ অবস্থা থেকে উত্তম যে, শরীর হবে হারাম শরীফে আর মন থাকবে হিন্দুস্তানে। অর্থাৎ, শরীর তো এখানে আছে, কিন্তু মনের মধ্যে ইচ্ছে জাগছে আহা! যদি হারামাইন শরীফাইনের নেয়ামত সমূহের দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারতাম। কতই না ভাল হত যদি আমি মক্কা-মদীনা যাওয়ার সুযোগ পেতাম। এই স্পৃহা-ইচ্ছা, আফসোস ও আকাংখা দিলে আছে আর শরীর আছে নিজ দেশে, এ অবস্থাটি ঐ অবস্থা হতে উত্তম যেখানে মানুষ হারামাইন শরীফাইনে বসে দেশের কথা কল্পনা করতে থাকে।

হযরত মাওলানা বদরে আলম রহ.-এর মদীনায় হিজরত

হযরত মাওলানা বদরে আলম ছাহেব মীরাঠী রহ. যিনি আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। তিনি হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। বর্তমানে তো হিজরত করা কোন মুশকিল কাজ নয়। কেননা বর্তমানে মানুষ পয়সা কামানোর জন্য হিজরত করে থাকে। কেননা সেখানে পয়সা অনেক পাওয়া যায়। নতুবা আসল হিজরততো ছিল ঐ জামানায়, যখন সেখানে পয়সার কোন প্রশ্ন ছিল না। শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য হিজরত হত।

যাইহোক! হিজরত করার পর একটি সময় পর্যন্ত তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর আয় রোজগারের কোন মাধ্যম ছিল না। আকল হয়রান হয়ে যায় ঐ সময় তিনি কীভাবে অতিবাহিত করেছেন?

হযরত নিজের ঘটনা এভাবে শুনাচ্ছেন; যখন আমি প্রথমবার মদীনা মুনাওয়ারা গেলাম, তখন সেখানে কারো সাথে আমার পরিচয় ছিল না। একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমার জ্বর এসে গেল, এখন সেখানে কেউ যাতায়াতও করে না যদ্দরুন আমাকে দেখা শোনা করার মত কোন মানুষও নেই। প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত। তিন দিন এ অবস্থায় কেটেছে যে, একটি দানাও আমার মুখে যায়নি। প্রচণ্ড জ্বরের কারণে নিজে উঠে হারামে যাওয়ার মত সামর্থও ছিল না। দুর্বলতার ফলে সেখানে

নামায পড়াও মুশকিল হচ্ছিল। তিন দিন পরে এক ব্যক্তি আমার নাম 'বদরে আলম' 'বদরে আলম' ডাকতে ডাকতে এলেন। নিজের হাতে কিছু ঔষধ ও খানাও এনেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কীভাবে জানতে পারলেন যে আমার নাম 'বদরে আলম', আর আমি এখানে আছি? ঐ আগন্তুক বললেন: স্বপ্নযোগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয় তিনিই এ নাম বলেছেন আর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি আপনার সেবা-শুশ্রূষা করি ও খোঁজ-খবর নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ মাকাম দান করেছিলেন।

মদীনায় থেকে মদীনার বাইরের প্রয়োজনীয়তা

যাইহোক! যখন হযরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব রহ. মদীনা তায়্যিবা হিজরত করে গেলেন তখন তাঁর নিকট হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. একটি চিঠি লিখেন। ঐ চিঠিতে হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এ কথাটিও লিখেছিলেন: এখানে আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে আমাকে বলবেন, আমি ঐ জিনিস পাঠানোটাকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করব।

উত্তরে হযরত মাওলানা বদরে আলম রহ. লিখলেন : মদীনায় থেকে মদীনার বাইরের প্রয়োজনীয়তা!! أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا অর্থাৎ, আমি মদীনায় থেকেও এ কথার ফিকির করব যে অমুক জিনিস অমুক স্থানে পাওয়া যায়। ঐ জিনিসটা সেখান থেকে আনাব। আমার আত্মসম্মান আমাকে এর অনুমতি দেয় না। আর أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, যদি আমার দ্বারা কোন প্রয়োজন মিটে তবে আমি সাহায্য করার জন্য আছি?

উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন: أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا অর্থাৎ, আপনার সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমার নেই। হ্যাঁ, আমার আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর

রহমত ও করমের প্রয়োজন আছে। আমি সেটার মুখাপেক্ষী। এমনিভাবে হযরত মাওলানা বদরে আলম ছাহেব রহ. হযরত মুফতী সাহেব রহ. কে এ বাক্য লিখে দিলেন।

মদীনা যাব, আবার ফিরে আসব, আবার যাব

যাইহোক! যদি মদীনায় মানুষ থাকে এবং ঐভাবে থাকে যেভাবে হযরত মাওলানা বদরে আলম ছাহেব রহ. থাকতেন, তবেই না মজা। এমন যেন না হয় যে, থাকে তো মদীনায় আর মন পড়ে থাকে পাকিস্তানে বা হিন্দুস্তানে। এর চেয়ে উত্তম হল মানুষ এখানে পাকিস্তানে থাকে আর দিল থাকে মদীনায়।

আমীর মীনাঈ রহ. খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন–

مدینہ جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں

تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے

অর্থাৎ, মদীনায় যাব অতঃপর ফিরে আসব, এরপর আবার মদীনায় যাব। সারাটা জীবন যেন এভাবেই পার হয়ে যায়।

কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল। এটা আপনি কী বললেন? যে মদীনা যাব আবার ফিরে আসব, আবার মদীনা যাব!! ফিরে আসবেন কেন? সেখানে পড়ে থাকলেই তো হয়। তিনি বললেন : মজাতো এর মধ্যেই যে, মদীনা যাব এরপর ফিরে আসব অতঃপর আবার মদীনা যাব।

এ জন্যই হযরত থানভী রহ. বলেন: এ পন্থাটি উত্তম ঐ পন্থা হতে যেখানে মানুষ এর শরীর থাকে মদীনায় আর মন থাকে মদীনার বাইরে।

হিম্মত প্রয়োগ করুন

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন: 'ইখতিয়ারী ব্যাপারসমূহে অলসতার চিকিৎসা হিম্মত ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সমস্ত সংশোধনের ভিত্তি এটার উপরই। আর এটাই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির মূল চিকিৎসা'। (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৩)

আজ লোকজন এমন মনে করে যে, যখন আমরা কোন শায়খের নিকট যাব তখন তিনি এমন নজর দিবেন অথবা এমন ফুৎকার মারবেন যার দ্বারা দিল সচল হয়ে যাবে, দুনিয়া বদলে যাবে, আমাদের জীবনে ইনকিলাব আসবে! মনে রাখবেন! এগুলো সাময়িক প্রতিক্রিয়া মাত্র। এর থেকে বেশি কিছু নয়। বাস্তব কথা হল: নিজ হিম্মত প্রয়োগ করা ব্যতীত সংশোধন সম্ভব নয়। যদি শুধু নজর দেয়া আর ফুঁ মারার দ্বারাই সব কাজ চলত তবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিহাদ, দাওয়াত ও তাবলীগ ইত্যাদির কোন প্রয়োজনই না। ব্যাস! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নজর দিতেন আর লোকজন মুসলমান হয়ে যেত!! কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেননি। এর দ্বারা বুঝা গেল: বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করা, নজর দেয়া, ফুঁ দেয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়।

বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের একটি উদাহরণ

অবশ্য অনেক সময় এসব 'কৌশল' এর দ্বারা দিলের সংশোধনের ক্ষেত্রে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এর কারণে সব সময়ের জন্য মানুষের কায়া পাল্টে যায় না। যদি কেউ নজর ফেলে অথবা কোন কৌশল প্রয়োগ করে তবে এর পরিণতিতে মানুষ সংশোধনের পথে চলা আরম্ভ করে ঠিক, কিন্তু আগে বাড়ার জন্য এবং স্থায়ীভাবে চলার জন্য নিজ হিম্মতকেই কাজে লাগাতে হবে। এ 'কৌশলসমূহ' এর দৃষ্টান্ত হল ঐ গাড়ীর মত যার ' সেলফ স্টাটার' খারাপ হয়ে গেছে। এখন এই গাড়ীকে স্টার্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু সেটা স্টার্ট হচ্ছে না। এখন এটাকে ধাক্কা লাগিয়ে স্টার্ট করতে হবে। ফলশ্রুতিতে ধাক্কা লগানোর দ্বারা এর ব্যাটারীতে সামান্য শক্তি সৃষ্টি হয়েছে আর গাড়ী চালু হয়ে গেছে। এখন সামনে সে নিজ ব্যাটারী ও ইঞ্জিনের শক্তিতে চলবে। কিন্তু যদি ব্যাটারী আর ইঞ্জিনে প্রাণই না থাকে, তবে যতই ধাক্কা দেয়া হোক না কেন; ঐ গাড়ী চলবেনা। এমনিভাবে কোন বুযুর্গের তাওয়াজ্জুহ প্রদান বা অন্য কোন বিশেষ কৌশল বাস্তবিক পক্ষে ধাক্কা লাগানো। এর ফলে মানুষের মধ্যে আমলের কিছু উদ্দীপনা ও জোশ সৃষ্টি হয়

বটে (যদ্দরুন কিছু আমলের তাওফীকও হয়ে যায়) কিন্তু ঐ আমলকে নিজেই বেগবান রাখতে হয়। শুধু 'তাওয়াজ্জুহ' দ্বারা সারা যিন্দেগী কাজ চলবেনা বরং নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

ত্রুটি ও অলসতার চিকিৎসা

মনে রাখবেন। ত্রুটি ও অলসতার চিকিৎসা হিম্মতের প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কোন কাজ করতে হয়ত অলসতা লাগছে। এর সমাধান হল দৃঢ় ইচ্ছা ও হিম্মত করে ঐ অলসতার মোকাবিলা করা। এটা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। যদি কেউ এমন চায় যে অলসতার চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থাপত্র তাকে গুলিয়ে পান করিয়ে দেয়া হবে! তবে শুনে রাখুন। এমন কোন ব্যবস্থাপত্র আজ পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি।

লোকজন জিজ্ঞেস করতে থাকে: হযরত! নামাযের ব্যাপারে দারুণ অলসতা ও ত্রুটি হয়ে যায়, এর জন্য কোন ওযীফা বাতলে দিন!

আরে ভাই! এ জন্য সবচেয়ে বড় ওযীফা হল: আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে হিম্মত দিয়েছেন, এই হিম্মত কে ব্যবহার করুন। যখন এই হিম্মতকে ব্যবহার করবেন তখন আপনাদের কার্যসিদ্ধি হবে। ঝাড় ফুঁকের দ্বারা এ কাজ হবে না। হিম্মতের দ্বারা হবে।

মানুষের হিম্মতের শক্তি

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হিম্মতের মধ্যে দারুণ শক্তি রেখেছেন। এত বেশি শক্তি রেখেছেন যে তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ তা'আলা ঐ হিম্মতের মাধ্যমে বড় বড় কাজ করিয়ে দেন যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এই হিম্মতের মাধ্যমে মানুষ চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নতুবা ইতোপূর্বে চাঁদে যাওয়াকে অসম্ভব মনে করা হত। কিন্তু যখন হিম্মত করেছে পৌঁছে গেছে। সুতরাং যখন মানুষ হিম্মত করে চাঁদে পৌঁছতে পারে, তখন স্বীয় নফসকে কেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না? যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, কাবু করতে চায়; তবে আমার একটি কবিতা আছে:

کمندیں ڈال رکھی ہیں میری ہمت نے تاروں پر
مگر اب تک دل ناداں کی نادانی نہیں جاتی

অর্থাৎ, নফস আমার অন্তরের তারের উপর জাল বিছিয়ে রেখেছে,
কিন্তু এখনো পর্যন্ত অবুঝ অন্তরের বেকুবি দূর হল না।

সুতরাং যখন মানুষ হিম্মত করে চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ ও যোহরা তারকায় পৌঁছতে পারে; তাহলে অন্তরকে কেন কাবু করতে পারবে না? কাজেই প্রত্যেকের উচিৎ মুরাকাবা করা এবং নিজ হিম্মতকে তাজা করা। এটাই পথ এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদেরকে হিম্মত দান করুন এবং আমাদের আমল-আখলাক পরিশুদ্ধ করে দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সাতাশতম মজলিস

তাসাররুফের হাকীকত

তাসাররুফের হাকীকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّا بَعْدُ

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন:

'যদি কারো মনে এ খেয়াল আসে যে, অনেক বুযুর্গের 'তাওয়াজ্জুহ' দ্বারা বড় বড় বদকারদের আপনা আপনি সংশোধন হয়ে গেছে তবে এটা এক ধরনের 'তাসাররুফ'। আর এমন তাসাররুফ ইখতিয়ারীও নয়, বুযুর্গীর জন্য জরুরীও নয়।'

(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৪)

আমি পূর্বে আরয করেছি যে, মানুষের আমল করার জন্য নিজ হিম্মত, এরাদা ও ইখতিয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, আর এই যে অনেকের ধারণা : যখন কোন শায়খের নিকট যাব, তখন তিনি আমার দিকে এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন যার ফলে আমার যিন্দেগীর কায়া পাল্টে যাবে!! এ ব্যাপারটা এত বেশি ব্যাপকতার সাথে সঠিক নয়।

হাফেয সিরাজী রহ.-এর ঘটনা

অবশ্য দিলের মধ্যে এ খেয়াল আসে, অনেক বুযুর্গের ঘটনা এমন পাওয়া যায় যে, বড় বড় বদকার মানুষ তাঁদের নিকট যাওয়ার পরে ঐ বুযুর্গের 'তাওয়াজ্জুহ' এর বরকতে সেই বদকারের সংশোধন হয়ে গেছে।

যেমন কবি হাফেয সিরাজী রহ. সাধারণত মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াতেন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা আবৃত্তির অভ্যাস ছিল। তাঁর পিতা হযরত নাজমুদ্দীন সুগরা রহ.-এর মুরীদ ছিলেন। একবার হযরত নাজমুদ্দীন সুগরা রহ. নিজ মুরীদের বাসায় আসলে, তিনি নিজের সকল সন্তানকে হযরতের সামনে পেশ করলেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ করালেন। হযরত

নাজমুদ্দীন সুগরা রহ. সকলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং সবাই কে দু'আ দিলেন।

হাফেয সিরাজী রহ. মাঠে-ময়দানে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরাফেরা করতেন। হযরত নাজমুদ্দীন সুগরা রহ. জিজ্ঞেস করলেন: তোমার তো আরেকটি ছেলে আছে সে কোথায়? তাঁর পিতা বললেন: সে তো সম্ভবত: কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বললেন: তাকেও ডেকে আনো। তাঁর পিতা একজন কে পাঠালেন, আর সত্যি সত্যিই তিনি ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এ ব্যক্তি গিয়ে তাকে পাকড়াও করলেন এবং বললেন যে, তোমার আব্বা তোমাকে ডাকছেন। সম্ভবত: এটাও বলে দিয়েছিলেন যে, একজন বুযুর্গ মানুষ এসেছেন তাঁর মাধ্যমে তোমার জন্য দু'আ করাবেন। এটা শুনে হাফেয সিরাজী রহ. ঐ লোকের সাথে বাসায় চলে আসলেন। যখন বাসায় প্রবেশ করলেন আর দেখলেন যে, শাইখ নাজমুদ্দীন সুগরা রহ. বসে আছেন তখন তাঁকে দেখে এ কবিতা পাঠ করলেন:

آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند
آیا بود کہ گوشۂ چشمے بما کنند

অর্থাৎ, ঐ মানুষ যিনি এক নজরে মাটিকে স্বর্ণে পরিণত করেন,

এমন হতে পারে কি যে তিনি চোখের কিনারা দিয়ে আমার উপর দৃষ্টিপাত করবেন?

শাইখ নাজমুদ্দীন সুগরা রহ. সেখানে বসে বসেই উত্তরে বললেন :

نظر کردم ، نظر کردم ، نظر کردم

অর্থাৎ, আমি নজর দিয়েছি, নজর দিয়েছি, নজর দিয়েছি।

ব্যাস! সামান্য এক নজর দিয়েছেন মাত্র। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা ঐ ছেলেকে, যে মাঠে-হাঁটে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াত কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন?

উঁচূ স্তরের সূফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। তাঁর সমস্ত কাব্যচর্চা তাসাওউফকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। হযরত থানভী রহ.-এর

ন্যায় বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব তাঁর 'দেওয়ানের' ব্যাখ্যা 'ইরফানে হাফেয' নামে লিখেছেন। তাঁর দেওয়ানের নাম হল 'দেওয়ানে হাফেয'।

'তাসাররুফ' ইখতিয়ারী বিষয় নয়

এখন কবি হাফেয সিরাজী রহ.-এর সাথে যা কিছু হল, যে, হযরত নাজমুদ্দীন সুগরা রহ. একটি দৃষ্টি দিলেন; যদ্দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন।

বর্তমান কালেও আমাদের অনেকের এমন আকাংখা হয় যে, যদি আমাদের উপরও কোন দৃষ্টি নিক্ষেপকারী বা তাসাররুফকারী পাওয়া যেত তবে আমাদের কাজ হয়ে যেত!

সম্পর্কে হযরত থানভী রহ. বলেন:

> 'যদি এমন খেয়াল আসে যে, কোন কোন বুযুর্গের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা বড় বড় বদকারদের আপনা আপনি সংশোধন হয়ে গেছে এটা এক ধরনের তাসাররুফ বা বিশেষ কৌশল প্রয়োগ মাত্র। আর এমন 'তাসাররুফ' ইচ্ছাধীন বিষয়ও নয় এবং বুযুর্গীর জন্য জরুরীও নয়।'

অর্থাৎ, কোন বুযুর্গের এমন ইখতিয়ার থাকে না যে, তিনি যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা 'তাসাররুফ' করবেন!! অথবা সেই তাসাররুফ এর বিশেষ কোন পদ্ধতিও নেই। এমনও নয় যে, পরিশ্রম করে এ শাস্ত্র ও যোগ্যতা অর্জন করবে। এরপরে যখন চাইবে যার উপর চাইবে তাসাররুফ করে তার হালত বদলে দিবে।

মনে রাখবেন! ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এ তাসাররুফ করা বা সেটাকে অর্জন বা প্রয়োগ করা কারো ইখতিয়ারে নেই বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ঋণ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সেটা দান করেন। আর ঐ সময়েই দান করেন যখন তাঁর কোন বিশেষ বান্দাকে নিজের দিকে টেনে নিতে চান। যেমনটি কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের দিকে টেনে নেন এবং ঐ ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন যে আল্লাহ অভিমুখী হয়।' (সূরা শূরা-১৩)

যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে নিজের দিকে টেনে নিতে চান তখন কোন বুযুর্গকে মাধ্যম বানিয়ে তাঁর নজর ও খেয়ালাত এর মধ্যে 'তা'ছীর' পয়দা করে দেন। নতুবা ঐ বুযুর্গের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই যে তিনি নিজের থেকেই নিজের মধ্যে 'তাসাররুফ' এর যোগ্যতা সৃষ্টি করবেন। এ জন্য আসলে তো 'তাসাররুফ' করনেওয়ালা হলেন আল্লাহ তা'আলা। তবে তিনি বুযুর্গদেরকে মাধ্যম এবং উপলক্ষ বানিয়ে থাকেন। এ জন্য এ 'তাসাররুফ' ইখতিয়ারী নয়।

বুযুর্গীর জন্য তাসাররুফ জরুরী নয়

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ 'তাসাররুফ' বুযুর্গীর জন্য অপরিহার্য নয়। কাজেই এমনটি ভাবা অনুচিৎ যে, বুযুর্গ হলেই বুঝি তার মধ্যে 'তাসাররুফ' করার ক্ষমতা চলে আসে। কত বুযুর্গানে দীন এমন গত হয়ে গেছেন যাঁদের তাসাররুফ করার ক্ষমতা ছিল না। এর কারণে তাঁদের বুযুর্গীর মধ্যে কোন কমতি আসেনি। আসল কৃতিত্ব হল হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণই হল সমস্ত গুণাবলী, কৃতিত্ব ও বুযুর্গীর কেন্দ্রবিন্দু ও উৎসমূল। তাসাররুফ হাসিল হল কি হল না? কোন কাশফ-কারামাত বা ইলহাম হল কি না? কোন স্বপ্ন দেখা গেল কিনা? এগুলো বুযুর্গীর কোন প্রমাণ নয়। যদি এগুলো প্রাপ্ত হয় তবে আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করবে। আর এগুলো না হলে পেরেশানী বা বুযুর্গীর স্বল্পতা আছে! এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। সুতরাং কোন বুযুর্গের মধ্যে এ গুণটি বিদ্যমান না থাকলে কেউ যেন এমন মনে না করে যে, তাঁর বুযুর্গীর মধ্যে কমতি (?) আছে। বরং আমাদের বুযুর্গানে দীনতো এ জাতীয় স্বাভাবিক নিয়ম বিরুদ্ধ ব্যাপারসমূহ থেকে দূরে থাকতেন এবং এগুলোকে পসন্দ করতেন না। তাঁদের অভিলাষ এটাই থাকে, যেন এ জাতীয় ব্যাপারগুলো তাঁদের থেকে প্রকাশই না পায়। কেননা এতে দুর্ঘটনার আশংকা

অনেক বেশি। আজ কারো 'কাশফ' হলে জানি না সে নিজেকে কী মনে করে বসবে? এবং তার মস্তিষ্কে কী খন্নাসী পয়দা হবে? এরপরে সে মানুষের মধ্যে নিজের বড়ত্বের প্রচার-প্রসার করতে থাকবে। যদ্দরূন তার মধ্যে অহংকার ও খোদ পসন্দীর মত ভয়াবহ রোগ বাসা বাঁধবে। এভাবে সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর ঘটনা : একবার খানা কম ছিল, কিন্তু মানুষ বেশি ছিল। ফলে তিনি নিজ রুমাল ঐ খানার উপর ঢেলে দেন যার বরকতে ঐ খানা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

হযরত হাফেয যামেন শহীদ রহ. যিনি হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন এবং একই খানকাহে বসতেন, তিনি যখন এ সংবাদ পেলেন তখন হাজী সাহেব রহ. কে বললেন: 'বাহ্! এখনতো আপনার রুমাল সালামতেরই দরকার। তাহলে আর পৃথিবীতে কারো কোন জিনিসের কমতি থাকবে না! যেন তিনি এর মাধ্যমে স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন: আপনি এ কাজটি ভাল করেননি। এর দ্বারাতো মানুষের আকীদা খারাপ হয়ে যাবে যে, ব্যাস! রুমাল ঢাল আর যে কোন বস্তুতে প্রবৃদ্ধি সাধন কর! হযরত হাজী সাহেব রহ. লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন: বাস্তবিক পক্ষেই আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে। আমার এমনটি করা উচিৎ হয়নি। এ জন্য আমাদের বুযুর্গানে দীন এ জাতীয় ব্যাপারসমূহ থেকে বেঁচে থাকতেন।

কাশফ ও কারামাত পথভ্রষ্টতার কোন কোন সময় কারণ হয়

যেখানেই লোকজনের মধ্যে কাশফ-কারামাত, ইলহামাতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যদিও শুরুতে সীমালংঘন হয় না কিন্তু যখন সামনে অগ্রসর হয় তখন এর পরিণামে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

پیراں نمی پرند مریداں می پرانید

অর্থাৎ, পীর সাহেব পথভ্রষ্ট না হলেও মুরীদগণ সামনে চলে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

কয়েক বছর পূর্বে জনৈক ব্যক্তির সাথে এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিক অবস্থায় খারাপ কিছু বুঝা যায়নি। কিন্তু যখন এ সব ব্যাপারে বেশি জোর দেয়া হল, তখন এর পরিণতিতে সে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হল। এ জন্য আমাদের আকাবির এ জাতীয় কাশফ ও কারামত চর্চা এবং এগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়াকে পসন্দ করেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা পাত্র অনুযায়ী দান করেন

কেউ কেউ মনে করেন যে, সম্ভবত: এ হযরতদের মধ্যে এসব জিনিসই নেই!! আর যদি কথার কথায় মেনেও নেয়া হয় যে, বর্তমান যমানার বুযুর্গদের মধ্যে এসব একেবারেই নেই, তবে এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়গুলো ইখতিয়ারী নয়।

এখন থাকল এ প্রশ্ন যে, পূর্বের যমানার আল্লাহ্ ওয়ালাগণ তো অনেক বড় কাশফ ও কারামাতওয়ালা বুযুর্গ হতেন। তাঁদের কাশফের কত ঘটনা শোনা যায়। এখন আল্লাহর কোন বান্দা এমন নজরে পড়ে না। এখন কাশফও নেই, কারামতও নেই!!

এর উত্তর কবি গালিবের কবিতায় আছে :

دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

অর্থাৎ 'পানকারীর পাত্র অনুপাতেই তাকে পানীয় দেয়া হয়।'

হতে পারে বর্তমান যুগে এমন সব 'কাইফিয়াত' এর ব্যাপক প্রকাশের মাধ্যমে বুযুর্গগণের নিজেদের তো কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এর দ্বারা সাধারণ মানুষের ক্ষতির আশংকা আছে। এ জন্যই হয়ত এসব কাইফিয়াত কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া এসব জিনিস ফযীলত, শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীর মানদন্ডও নয়। এ জন্য কোন বুযুর্গের নিকট এ সব জিনিসের প্রত্যাশায় যাওয়া ঠিক নয়।

তাসাররুফের ক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না

এরপর হযরত থানভী রহ. বলেন:

> অনেক বুযুর্গের মধ্যে কোন ধরণের তাসাররুফই হয় না। এতদ্ব্যতীত তাসাররুফের ক্রিয়া বেশিক্ষণ থাকেও না।

যেমন পূর্বে আরয করা হয়েছে যে 'তাসাররুফ' এর ক্রিয়ার ফলে সাময়িকভাবে সামান্য উষ্ণতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু ঐ ক্রিয়া বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বরং হিম্মত, ইখতিয়ার ও আমলের দ্বারাই কাজ চলে। 'তাসাররুফ' এর আমল হল গাড়ীকে ধাক্কা দেয়ার মত। 'তাসাররুফ' তো এক ধাক্কা লাগিয়ে দিল। কিন্তু সামনে চলতে হলে গাড়ীকে নিজ ইঞ্জিনের শক্তিতেই চলতে হবে।

তাসাররুফের উদাহরণ

এরপর হযরত থানভী রহ. 'তাসাররুফ' এর একটি উদাহরণ পেশ করে বলেন:

> এর উদাহরণ এরূপ: যেমন কোন ব্যক্তি চুলার পাশে বসে গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে বসা থাকবে পুরো শরীর গরম থাকবে কিন্তু সেখান থেকে উঠার পরই পুরো শরীর পূর্বের মত ঠান্ডা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে নিজ হিম্মত ও আমলের মাধ্যমে যে ক্রিয়া হয় সেটা অটুট থাকে।
>
> আর এর উদাহরণ এমন, যেমন কেউ স্বর্ণ-চূর্ণ খেয়ে নিজের মধ্যে প্রাকৃতিক উষ্ণতা পয়দা করে নিল। এখন যদি সে শিমলা পাহাড়েও চলে যায় তবুও ঐ উষ্ণতা অটুট থাকবে।
>
> (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫)

হযরত থানভী রহ. 'তাসাররুফ' এবং 'স্বীয় হিম্মত' উভয়টিকে দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ 'তাসাররুফ' এর ফলে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয় সেটা সাময়িক হয়ে থাকে। যা এক সময় শেষ হয়ে যায়। যেমন চুলার পাশে উপবেশনকারীর শরীরে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয় সেটা সাময়িক

হয়ে থাকে, এক সময় তা খতম হয়ে যায়। এ তাসাররুফের ফলে কিছুক্ষণের জন্য সামান্য উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, এরপর তা শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য স্বীয় হিম্মতের মাধ্যমেই আমল করতে হয়। মুজাহাদা, সাধনা ও নিজ হিম্মতের মাধ্যমে যে আমল করা হয় সেটাই স্থায়ী হয়। সেটা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় না।

হিম্মত এবং আমলসমূহের উদাহরণ

এটাকেও অন্য একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। যেমন কেউ স্বর্ণের চূর্ণ খেয়ে খেয়ে নিজের মধ্যে প্রাকৃতিক উষ্ণতা সৃষ্টি করেছে, এখন যদি সে শিমলা পাহাড়েও (যা মারাত্মক শীত প্রধান পাহাড়) চলে যায় তবুও তার উষ্ণতা পুরোপুরি অটুট থাকবে। এ জন্য তাসাররুফের ফিকিরেই পড়বে না। বরং সহজ সরল কথা হল: সর্বক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতসমূহের উপর আমল করা শুরু করে দাও।

কেউ একজন খুব সুন্দর বলেছেন :

بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

অর্থাৎ, 'সুন্নাতের পথে চললে পথভ্রষ্টতার কোন আশংকা নেই।'

ব্যাস! এটাকে অবলম্বন করুন।

সুন্নাতের অনুসরণের বরকতে দ্রুত পৌঁছা যায়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন : বিভিন্ন বুযুর্গ যে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের মুজাহাদা, সাধনা, অভিজ্ঞতা ও তাসাররুফাত ইখতিয়ার করেন। এসব পথে 'আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা' বিলম্বিত হয়। একটি পথ আছে: 'সুন্নাত অনুসরণের পথ'। সুন্নাত অনুসরণের মর্ম হল: হাদীসের কোন গ্রন্থ উদাহরণস্বরূপ: 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে রাখুন। এবং এতে দেখুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কী কী সুন্নাত বর্ণনা করা হয়েছে। এক একটি সুন্নাত নিন, আর আমল করতে থাকুন আর যে সুন্নাতের উপর আমলের অভ্যাস নেই সেটার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

হযরত থানভী রহ. বলেন: 'সুন্নাত অনুসরণ'-এর পথে দ্রুত আল্লাহ্ পাক পর্যন্ত পৌঁছা যায়।

সুন্নাতের অনুসরণে আছে 'মাহবূবিয়্যাত'-এর শান

অতঃপর এর কারণ হিসেবে হযরত থানভী রহ. বলেন: 'সুন্নাত অনুসরণের' বৈশিষ্ট্য হল 'মাহবূবিয়্যত' বা মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া। যেমনটি কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, 'হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকে তবে আমার অনুসরণ কর (এতে) আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

প্রথমে বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো, এরপরে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন। অতএব 'সুন্নাত অনুসরণ' এর মাঝে মাহবূবিয়্যাত এর শান পাওয়া যায়। আর সেটা মাখলূকের মাহবূবিয়্যত নয় বরং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মাহবূবিয়্যাত।

আমাদের শায়খ হযরত আরেফী রহ. বলতেন: যখন কোন মুসলমান বাথরুমে প্রবেশের মুহূর্তে সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে নিজ বাম পা প্রবেশ করাচ্ছে আর এ দু'আ পড়ছে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

['হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট দুষ্ট পুরুষ ও নারী জ্বিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।']

এ সময় ঐ মুসলমান আল্লাহ তা'আলার মাহবূব হচ্ছে। সুতরাং যে ব্যক্তিই সুন্নাত-এর অনুসরণ করে সেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হয়ে যাবে। কেমন যেন মহান আল্লাহ হলেন 'মুহিব্ব' বা প্রেমিক, আর ঐ ব্যক্তি হল 'মাহবূব' বা প্রেমাস্পদ। আর মহব্বতের বৈশিষ্ট্য হল 'জয্ব' করা। অর্থাৎ, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে নিজের দিকে টেনে নেয় আবার প্রেমাস্পদও প্রেমিককে

নিজের দিকে টেনে নেয়। এজন্য যখন মানুষ সুন্নাতের অনুসরণ করে তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার মাহবূব হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ্ পাক তাকে নিজের দিকে টেনে নেন! ফলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

বলা বাহুল্য যখন আল্লাহ্ তা'আলা টেনে নিবেন, তখন এর বদৌলতে ত্বরিত আল্লাহ্ পাক পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যদি মানুষ নিজে নিজে চলে তবে অনেক দেরীতে পৌঁছবে। এজন্য বলা হয়েছে : সুন্নাত অনুসরণের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে আল্লাহ্ পাক পর্যন্ত পৌঁছা যায়। আর অন্যান্য মাধ্যম যেগুলো সূফীয়ায়ে কেরাম অবলম্বন করেন, সেগুলোও জায়েয ও মুবাহ; কিন্তু সেগুলোর মাধ্যমে এত দ্রুত আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছা যায় না।

একটি একটি সুন্নাতের উপর আমল করুন

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন : 'আরে মিঞা! তাসাওউফের ঐ সব পরিভাষার চক্করে পড়ো না। সাদাসিধে আমল কর। আর সেটার পন্থা হল হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সে সব সুন্নাত বর্ণিত সেগুলো থেকে একটি একটি শিখতে থাক এবং তার উপর আমল করতে থাক। ইনশাআল্লাহ মনযিলে পৌঁছে যাবে।'

এ জন্যই আমাদের বুযুর্গদের তালীম-তরবিয়্যাতের সারকথা হল 'সুন্নাতের অনুসরণ'। হযরত বলতেন: উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে আমি তোমাদের জন্য একটি ডায়েরী বানিয়ে দিয়েছি এবং এতে সমস্ত সুন্নাত লিখে দিয়েছি যে, এভাবে ঘুমাতে হবে। এভাবে জাগতে হবে। এভাবে উঠা-বসা করতে হবে। এভাবে পানাহার করতে হবে। এভাবে কথা বলতে হবে ইত্যাদি।

সমস্ত সুন্নাতের উপর আমল করুন

অবশ্য আমি সকলের নিকট আরেকটি কথা আরয করতে চাই সেটা হল: সুন্নাত অনুসরণের মধ্যে কিছু আছে প্রসিদ্ধ বিষয়। উদাহরণস্বরূপ:

মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে ঢুকানো। বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করা। ডান হাতে খানা খাওয়া। খানার পূর্বে হাত ধৌত করা। বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু করা। বসে পানি পান করা। তিন শ্বাসে পানি পান করা। পানি পান করার পরে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা ইত্যাদি।

এসব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত এবং অনুসরণযোগ্য। প্রত্যেকটিরই বড় ফযীলত আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সুন্নাত শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের সাথে আমার আচরণ ও আখলাক কেমন হবে? ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, গোস্বা না করা মানুষের সাথে মার্জিত আচরণ করা ।এই সবও সুন্নাত। সুতরাং বুঝা গেল আখলাক, মুআমালাত (লেনদেন) ও মুআশারাত (সামাজিকতা) এর ব্যাপারেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত আছে। উদাহরণস্বরূপ: দাড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করার সময় পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেয়া এবং অন্যকে কিছু বেশি দেয়া, আর যদি অন্যের কাছে কোন হক থাকে তবে তার খাতিরে সামান্য হক ছেড়ে দেয়া। অন্যকে দেয়ার প্রশ্ন আসলে বেশি করে দাও। দেয়ার ক্ষেত্রে নিজের অন্তরকে প্রশস্ত রাখুন। এগুলোও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। এজন্য যেমনিভাবে ঐ সব প্রসিদ্ধ সুন্নাতের উপর আমলের ব্যাপারে উদ্যোগী দেখা যায়, তেমনিভাবে এ সুন্নাতগুলোর উপর আমলের ক্ষেত্রেও উদ্যোগী হওয়া উচিৎ।

আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও এ সুন্নাতসমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আঠাশতম মজলিস

স্বভাবজাত মন্দ প্রবণতার সংশোধন

স্বভাবজাত মন্দ প্রবণতার সংশোধন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّا بَعْدُ

প্রকৃতি স্বভাবগত:, কাজ ইখতিয়ারগত

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন:

'যদি কারো মনে এমন সংশয় জাগে যে, কারো স্বভাব তো পরিবর্তন হতে পারে না তাহলে স্বভাবজাত বদ অভ্যাসমূহের সংশোধন কীভাবে হবে? খুব বুঝে নিন! প্রকৃতি স্বভাবগত: হয় কিন্তু কাজ মানুষের ইখতিয়ারে থাকে। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রকৃতি পরিবর্তন হয় না কিন্তু সেটার আবেদনে সাড়া দেয়া বা না দেয়া মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত। এবং মানুষ এর জন্য আদিষ্টও বটে। আর বারবার ঐ আবেদনের বিরোধিতা করলে সেই প্রকৃতিও দুর্বল হয়ে যায়।' (আনফাসে ঈসা পৃ: ৫)

এ বাণী দ্বারা হযরত থানভী রহ. এটা বুঝাতে চান যে, অনেক সময় মনের মধ্যে এমন সন্দেহ দানা বাঁধে যে, মানুষের মধ্যে যেসব আত্মিক ব্যাধি থাকে কোন কোন সময় মানুষের মধ্যে ঐ মন্দ প্রবণতার মেযাজ গড়ে উঠে যদ্দরুন বলা হয় যে, এ অভ্যাসগুলো স্বভাবজাত।

রাগ মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য

উদাহরণস্বরূপ: কোন ব্যক্তির ব্যাপারে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হল যে, তার মধ্যে রাগ বেশি। এখন রাগ বেশি হওয়াটা হল স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। অনেক মানুষ এমন আছেন যাদের মধ্যে রাগ খুব কম থাকে, স্বভাব ও জন্মগতভাবে তারা নরম মেযাজের হয়। এদের রাগ খুব কম

হয়। আবার অনেকে এমনও আছেন যাদের মধ্যে প্রকৃতিগত: ও জন্মগত:ভাবে রাগ বেশি থাকে। স্বভাবগত: ভাবেই তিনি রাগী মানুষ। স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বলতে বুঝায়, এমন বৈশিষ্ট্য যা কখনো দূরীভূত হয় না। ঐ বৈশিষ্ট্য মানুষের নিজ ইখতিয়ার বহির্ভূত হয়।

এখন প্রশ্ন হল : এ বৈশিষ্ট্য কীভাবে দূর হবে? মানুষ এটাকে কীভাবে খতম করবে? হযরত থানভী রহ. এ সংশয়ের উত্তরে বলছেন: 'এ কথাটা খুব ভাল ভাবে বুঝে নিন যে, সরাসরি এ অভ্যাসগুলো নির্মূলের জন্য মানুষ আদিষ্ট নয়। বরং মানুষের জন্য নির্দেশ হল ঐ স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যেসমূহের যে নাজায়েয আগ্রহ দিলের মধ্যে পয়দা হয় সেই আগ্রহের উপর নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করবে না, আর এটা মানুষের ইখতিয়ারেও বটে।

উদাহরণস্বরূপ : যদি কারো মধ্যে 'রাগ' বেশি থাকে, তাহলে এর রাগ পুরোপুরি নির্মূল হওয়াটা তার ইখতিয়ারভুক্ত কোন ব্যাপার নয়। 'রাগ' তো একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য যা খতম হতে পারে না। সেটা তো থাকবেই। কিন্তু সেই রাগ আসার পর মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত কাজ হল নিজ হাত ও যবানের মাধ্যমে শরীয়তের বরখেলাপ কোন কিছু না করা মানুষের দায়িত্ব শুধু এতটুকুই। আর এটা মানুষের ইখতিয়ারেও বটে।

গোস্বার চাহিদার উপর আমল

এ কারণেই গোস্বা আসাটাও কোন গোনাহ নয়। আর এর চাহিদানুযায়ী আমলও সবসময় গোনাহ নয়। কিন্তু যখন গোস্বা অপাত্রে হবে তখন তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করাটা গোণাহ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ: কেউ আপনার উপর হামলা করল। এখন আপনার নিজ জান-মাল রক্ষার স্বার্থে এ হামলা প্রতিহত করা প্রয়োজন। এখন যদি এ ক্ষেত্রে মানুষ বিনয় অবলম্বন করে, তবে সেটা জায়েয হবে না। বরং এ পরিস্থিতিতে গোস্বার চাহিদার উপর সীমারেখার ভিতরে থেকে আমল করা জায়েয। কিন্তু যেখানে গোস্বার চাহিদার উপর আমল করা জায়েয নেই। অথবা জায়েয থাকলেও সমীচীন নয়। উদাহরণস্বরূপ: প্রাথমিক পর্যায়ের সালেক (আল্লাহর পথের পথিক) কে তার শায়খ এটা বলে দেন যে, তুমি

বিলকুল গোস্বা করবে না। জায়েয গোস্বাও করবে না। নাজায়েয গোস্বাও করবেনা। কেননা এখন জায়েয ক্ষেত্রসমূহে গোস্বা করলে নাজায়েয গোস্বায় পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে। কেননা এখনও গোস্বার উপর তোমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এজন্য শায়খ বলেন: তুমি এখন কোন গোস্বাই করবে না। এখন ঐ সালেকের জন্য জায়েয ক্ষেত্রে গোস্বা করা যদিও জায়েয কিন্তু গোস্বার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটাও সমীচীন নয়। এ জন্য শায়খ গোস্বা করতে নিষেধ করছেন।

এ সময় গোস্বার উপর আমল করো না

যাইহোক! গোস্বা আসাটা কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়। বরং দোষণীয় হল গোস্বা আসার পরে তার তাকাযা অনুযায়ী আমল করা। উদাহরণস্বরূপ: গোস্বা আসল আর মনে চাইল অমুককে কষে একটি থাপ্পড় মারি এবং থাপ্পড় মেরেও দিল!! অথচ মারার হক ছিল না, অথবা মারার হক ছিল কিন্তু যতটুকু মারার হক ছিল তার চেয়ে বেশি জোরে মেরে দিল। এই হল গোস্বার তাকাযার উপর নাজায়েয আমল। এটা গোনাহ্।

সুতরাং, গোস্বার ফলে অন্তরে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, ঐ উত্তেজনার উপর কোন পাকড়াও হবে না, ঐ উত্তেজনা কোন গোনাহ্ নয়। কিন্তু সে উত্তেজনার যে বহি:প্রকাশ ঘটানো হল, তথা জোরে থাপ্পড় মেরে দিল। এটা গোনাহ্ হয়ে গেল।

গোস্বার হালতে শিশুদেরকে প্রহার করা

আদব শিখানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষকের অধিকার আছে তিনি ছাত্রকে প্রহার করতে পারেন। কিন্তু তাঁর অধিকার শুধু এতটুকুই যে, তিনি আদব শিখানোর উদ্দেশ্যে অতটুকু মারতে পারেন যতটুকু মারলে ঐ ছাত্রের ব্যথা ও কষ্ট হবে না। এর চেয়ে বেশি মারা জায়েয ছিল না। কিন্তু দেখা গেল জনৈক শিক্ষক গোস্বার বশবর্তী হয়ে তার ছাত্রকে এমন বেদম প্রহার করলেন যে, ছাত্রের শরীরে নীল দাগ পড়ে গেল। অথবা ঐ ছাত্রের সীমাতিরিক্ত কষ্ট হল। তবে এটা হারাম কাজ হল। আর এটা এমনই হারাম যেটার ক্ষমাপ্রাপ্তিও সহজ

নয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ ছাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। সে মাফ করে দিলেও মাফ হবে না। তাহলে দেখা গেল গোস্বার কারণেই এত বড় গোনাহ্ প্রকাশ পেল।

এখন দেখুন! এই উত্তেজনা পয়দা হওয়াটা কোন গোনাহ ছিল না। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে শিশুকে মারাত্মক প্রহার করলো, এটা গোনাহ্ হয়ে গেল। এটা হারাম কাজ হয়ে গেল। সুতরাং ঐ উত্তেজনার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা হারাম। আর ঐ চাহিদার উপর আমল না করা ইখতিয়ারী বিষয়।

দেখুন! গোস্বা আসা না আসা মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়, কেননা সেটা স্বভাবজাত ব্যাপার। কিন্তু প্রহার করা, বা না করা, ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়।

সুতরাং এটাই পরীক্ষা। যখন গোস্বা আসল তখন ঐ গোস্বার তাকাযার উপর আমল করল কি করল না? যদি আমল করে তবে এর অর্থ হল, নফসের সামনে আপনি আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু যদি আপনি নফসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, যত গোস্বাই আসুক না কেন। প্রহার করব না। তাহলে বুঝা যাবে গোস্বা আপনার নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

গোস্বার সময় চিন্তা করবে

যদি মনের মধ্যে উত্তেজনা ও ক্রোধের সঞ্চার হয় আর দিল চায় যে তাকে খুব গালী দিব, তার পিতা-মাতা ও বংশকে গালী দিব আর সকলকে মন্দ বলব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ চিন্তা আসল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে নিষেধ করেছেন, ফলে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল, তাহলে এ জন্য সে পুরস্কার পাবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

অর্থাৎ, 'আর যারা গোস্বাকে হজম করে এবং মানুষদেরকে ক্ষমা করে।'

(সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

যাইহোক! যতগুলো স্বভাবজাত বদ অভ্যাস আছে সেগুলো নির্মূল করা যেহেতু মানুষের ইখতিয়ারে নয় এজন্য মানুষ এগুলো নির্মূলের জন্য আদিষ্টও

নয়। বরং মানুষ শুধু এতটুকু ব্যাপারে আদিষ্ট যে, ঐ স্বভাবজাত বদ অভ্যাসগুলো নিজ ইখতিয়ারে অপাত্রে ব্যবহার করবে না।

'হিংসা' একটি প্রকৃতিগত: জয্‌বা

এমনিভাবে 'হিংসা' একটি প্রকৃতিগত: ও স্বভাবগত জয্‌বা। যার অর্থ হল, কোন ব্যক্তির নিকট কোন নেয়ামত দেখে আমার অন্তরে এমন ইচ্ছা জাগছে যে, এ ব্যক্তি থেকে এ নেয়ামত দূর হয়ে যাক। সে এ নেয়ামত পেয়েছে কেন? তার বাড়ী এত সুন্দর হল কেন? সে এত পয়সার মালিক হলো কেন? তার এত খ্যাতি হল কেন? তার পদমর্যাদা এত বেশি কেন? এ পদ তার থেকে ছুটে যাক। এই সব মন্দ কামনার নামই হল 'হিংসা'।

এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন! অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ সব কামনা অন্তরে সৃষ্টি হওয়াটা গোনাহ্ নয়। যেমন, কারো মনে এমন কামনা জাগল যে, অমুক ব্যক্তি আমার থেকে আগে বেড়ে গেছে যদি সে আমার থেকে আগে না বাড়ত তবে ভাল ছিল! খুব ভালভাবে বুঝে নিন। কেননা এটা নাযুক কথা। এই যে, কামনা যেটা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছে এটা মূলত: কোন গোনাহ্ নয়। কিন্তু যখন মনের মধ্যে এ কামনা জাগল ফলে ঐ কামনাকে কার্যকরী করার জন্য কোন আমল করল, যেমন এ দু'আ করল যে, ইয়া আল্লাহ্! তার এ দৌলত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক! এটা গোনাহ্ ও হারাম কাজ হয়ে গেল; যেহেতু ঐ কামনার চাহিদার উপর আমল করে ফেলেছে। অথবা মনে করুন তার ব্যাপারে কারো নিকট অভিযোগ করল যে, অমুক ব্যক্তিকে যে তুমি কর্মচারী হিসেবে রেখেছ সে তো ভাল মানুষ নয়। তুমি তাকে চাকুরীচ্যুত করে দাও। এটা হারাম কাজ হয়ে গেল। অথবা কারো নিকট তার নিন্দাবাদ করা হল যে, সে তো এমন! অথবা কোন বাহানায় তাকে অপমান করার চেষ্টা করা হল। এটা হারাম।

সুতরাং, দিলের মধ্যে কামনা সৃষ্টি হওয়া অথবা কারো সম্পদ অর্জিত হওয়ার দরুন অন্তরে তার ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃতভাবে খারাপ ভাব সৃষ্টি হওয়াটা মূলত: হারাম নয় যতক্ষণ মানুষ সেটার চাহিদার উপর আমল না করে, সুতরাং, অন্তরে যে কামনা জাগছে এটা 'হিংসা'। কিন্তু এ হিংসা হারামের পর্যায়ে এখনো পৌছেনি।

অধিক সময় অন্তরে মন্দ কামনা থাকা

অবশ্য বেশি সময় এ কামনা মনের মধ্যে জাগরুক থাকাটা ভয়াবহ ব্যাপার। এর কারণ হল, যদি অধিক সময় এই কামনা অন্তরে থাকে, তবে সেটা কোন এক সময়ে মানুষকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করবে যা হারাম। আর এটারও প্রবল আশংকা আছে যে, ঐ সময় মানুষের এই অনুভূতিও থাকবে না যে, আমার এ কাজ আমার হিংসাত্মক জযবারই প্রতিফলন! এ জন্য এই কামনাকে খতম করাও জরুরী। কেননা এখনতো তার বিষ হয়েছে মাত্র। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে সে দংশন করবে। এ জন্য ঐ কামনার বিপরিত আমল করবে। যেমন, অন্তরে এ কামনা জাগছিল যে, কোন কোন ভাবে এ মাল-দৌলত তার হাত ছাড়া হয়ে যাক। আপনি এটা না করে হাত উঠিয়ে এ ভাবে দু'আ করুন: ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে যে দৌলত দান করেছেন, তাতে আরো বেশি বরকত দান করুন। যে সময় হিংসাকারী এ দু'আ করবে তখন তার অন্তরে করাত চলবে। কিন্তু এক্ষেত্রে করাত চালানোই কাম্য এবং এর দ্বারাই মানুষের মর্যাদা উঁচু হয়। ফলে সে উন্নতি করে এবং তাঁর আত্মিক অগ্রগতি এর দ্বারাই হয়।

মনের মন্দ কামনার বিপরীত আমল করুন

অন্তরে যে কামনা জাগছিল যখন তার বিপরিত আমল করবে না এবং ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আও করবেন তখন ফলাফল এই হবে যে, ধীরে ধীরে ঐ কামনাও দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যখন এটা দুর্বল হয়ে পড়বে তখন আর এই আশংকা থাকবে না যে, ঐ মন্দ কামনা এ ব্যক্তিকে কাবু করে ফেলবে! সমস্ত মন্দ স্বভাবের সংশোধনের এটাই হল দর্শন।

এ জন্যই বলা হয়: বদ অভ্যাসসমূহকে নির্মূল করা উদ্দেশ্য নয় যে, সে ব্যাধির জীবাণুই সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। এটা হবে না। বরং ঐ মন্দ স্বভাব কে ঘুরিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য, যেন সঠিক ক্ষেত্রে তার ব্যবহার হয়। ভুল ক্ষেত্রে সেটার ব্যবহার না হয়। অবশ্য এই 'ঘুরিয়ে দেয়া' কেই অনেক সময় রূপক অর্থে 'নির্মূল করা' বলা হয়। অর্থাৎ, যখন হিংসার চাহিদার উপর আমল করা হল না, তখন কেমন যেন হিংসাই নেই। সেটা নির্মূল হয়ে গেছে।

মন্দ স্বভাবসমূহ অনিবার্য

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে লিখেছেন: মানুষের মধ্যে যেসব মন্দ প্রবণতা আছে এসব মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের স্বার্থেই অনিবার্য। এগুলো না থাকলে মানুষের বংশধারাই অবশিষ্ট থাকত না। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন: যদি মানুষের স্বভাবে গোস্বা একেবারেই না থাকে, তবে সে মারা যাবে। কেননা যখন কোন হিংস্র প্রাণী তার উপর আক্রমণ করবে, তখন তার গোস্বাই আসবে না। বাঘ-সাপ-বিচ্ছু তার উপর আক্রমণ করবে আর সে নিজ আসনে বসে থাকবে! ফলশ্রুতিতে তার মৃত্যু হবে। অথবা শত্রুবাহিনী আক্রমণ করল কিন্তু তার গোস্বাই আসছে না। তার মনে হচ্ছে এরা মানুষ নয় বরং পাথর!! এর ফলাফল এটাই হবে যে, শত্রুপক্ষ তাকে খতম করে ফেলবে, এ জন্য নিজ আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গোস্বা জরুরী জিনিস।

কামবাসনা অপরিহার্য

এমনিভাবে তিনি বলেন: 'কামভাবও' অবধারিত। এটা ছাড়া মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যদি যথাস্থানে কামভাব না হয়, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি কামভাব অনুভব না করে, তবে কি মানব বংশ আর বিস্তৃত হবে? এজন্য মানব জাতির অস্তিত্বের সার্থেই এগুলো থাকা জরুরী। সমস্যা হল তখনই, যখন এগুলোকে ভুল স্থানে প্রয়োগ করা হয়, যেমন, গোস্বা বা কামভাবকে ভুল স্থানে ব্যবহার করা হল।

এজন্য আসল কথা হল, এই স্বভাবগুলো নির্মূল করা উদ্দেশ্য নয় বরং এগুলোকে ঘুরিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য। নিয়ন্ত্রণে রাখা উদ্দেশ্য। যাতে সঠিক ক্ষেত্রে সেটার ব্যবহার হয়।

এজন্য এমনটি বুঝা উচিৎ নয় যে, অমুকের মধ্যে গোস্বা বেশি। সে ঐ গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কীভাবে? অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে। কেননা গোস্বা নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত কাজ। গোস্বা আসাটা ইখতিয়ারী নয়। কাজেই গোস্বা আসলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার দু'টি পদ্ধতি আছে যা কুরআন-হাদীসে আছে।

হাদীস শরীফে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যদি গোস্বার সময় তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় থাক, তবে বসে পড়া। বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়। কেননা গোস্বা হল আগুনের স্বভাব, আর আগুনের বৈশিষ্ট্য হল সে উর্ধ্বমুখী। এ জন্য যখন মানুষের গোস্বা আসে তখন যদি সে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বসে যাবে। আর বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়বে। যাতে ঐ গোস্বা ঠান্ডা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতি হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে বয়ান করেছেন সেটা হল ঠান্ডা পানি পান কর। এটাও গোস্বার চিকিৎসা।

গোস্বা কমানোর চিকিৎসা

গোস্বা কমানো বা খতম করার আরেকটি পদ্ধতি হল: ঐ সময় এ কথা চিন্তা করা যে, এ ব্যক্তির উপর আমার ঐ পরিমাণ ক্ষমতা নেই যতটুকু ক্ষমতা আমার উপর আল্লাহ তা'আলার আছে।

এ নসীহতটিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কে করেছিলেন যখন তিনি স্বীয় গোলামকে প্রহার করছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন-

لَلّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তার থেকে বেশি ক্ষমতাবান যতটুকু ক্ষমতা তোমার এর উপর আছে।' তুমি এর উপর এত গোস্বা করছ কেন? যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর এত বেশি গোস্বা করেন তবে তোমার কী হাশর হবে?

এ জন্য গোস্বা এসে গেলে উল্লেখিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ফলে যখন ঐ গোস্বা আসল তখন তো সেটা ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয় ছিল কিন্তু যেহেতু সেটার চাহিদা অনুযায়ী আমল হয়নি এ জন্য আপনি এর অনিষ্টতা থেকে বেঁচে গেলেন। আর গোস্বাও নিজ সঠিক পাত্রে স্থির থাকল।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর উপর আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উনত্রিশতম মজলিস

শাইখের প্রয়োজনীয়তা এবং শাইখের দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ-এর হাকীকত

শাইখের প্রয়োজনীয়তা এবং শাইখের দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ-এর হাকীকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ

হযরত থানভী রহ. বলেন,

'সংশোধনের ক্ষেত্রে শায়খের দু'আ এবং বরকতেরও বিরাট ভূমিকা আছে। কিন্তু এটা শুধু সহযোগী মাত্র, এটাই যথেষ্ট নয়। যেমন পুদিনারস জোলাফের সহযোগী মাত্র, একমাত্র নিয়ামক নয়। অথবা ডাক্তার এবং রোগীর মতো, যদি রোগী ঔষধ পান না করে তাহলে শুধুমাত্র ডাক্তারের স্নেহ ও মনোযোগের দ্বারা সে সুস্থ হবে না। অথবা উস্তাদ এবং ছাত্রের মতো। শুধুমাত্র উস্তাদের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা সবক মুখস্ত হবে না, বরং ছাত্রের মুখস্ত করার মাধ্যমেই সেটা মুখস্ত হবে। শায়খের আসল কাজ হল রাস্তা বাতানো আর ঐ রাস্তা অতিক্রম করা 'সালেক'-এরই কাজ। যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে শুধু রাস্তা বাতলে দেয়া হয়, কোলে উঠিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় না। ঐ রাস্তা তো তাকে নিজে হেটেই পার হতে হয়।'

(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৬)

লোকজনের একটি ভ্রান্তি

অনেকে মনে করেন কোন শায়খের হাতে হাত রাখলে, কোন পীরের আঁচল ধরলে বা কারো হাতে বাইআত হলেই কাজ হয়ে যাবে! এখন এর পরে আর কেন কিছুর প্রয়োজন নেই। বরং এমনি এমনিই আমাদের সংশোধনও হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যও হাসিল হবে! এবং সোজা জান্নাতে চলে যাব!!

শায়খের তাওয়াজ্জুহ এবং দু'আর স্তর

হযরত থানভী রহ. এই বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য এটা বলতে চান যে, প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেটাকে সীমার মধ্যে রাখা জরুরী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে মুরীদের জন্য শায়খের তাওয়াজ্জুহ ও দু'আয় বিরাট বরকত রয়েছে এবং এটাকে অনর্থক মনে করাও অনুচিৎ। এ ব্যাপারে অবজ্ঞা বা উদাসীনতাও কাম্য নয়। কারণ শায়খের দু'আ পাওয়া এবং তাঁর তাওয়াজ্জুহ নসীব হওয়াও অনেক বড় নেয়ামত।

কিন্তু হযরত থানভী রহ. দু'টি শব্দে এর হাকীকত বয়ান করে দিয়েছেন। 'কিন্তু এটা শুধু সহযোগী মাত্র এটাই যথেষ্ট নয়।' অর্থাৎ, কাজতো নিজেই করতে হবে। কিন্তু শায়খের দু'আ-তাওয়াজ্জুহ ও দিকনির্দেশনা ঐ কাজের জন্য সহযোগী হয়ে যায়। এর দ্বারা মনোবল ও হিম্মত শক্তিশালী হয়। কিন্তু কাজ নিজেকেই করতে হবে। রাস্তা নিজেকেই অতিক্রম করতে হবে।

ডাক্তারের মনোযোগ ও স্নেহ চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট নয়

এরপর হযরত থানভী রহ.-এর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, একজন ডাক্তার। আপনি তার নিকট চিকিৎসা করানোর জন্য গেলেন। এখন ঐ ডাক্তার সাহেব আপনাকে যত স্নেহ ও মহব্বতই করুন না কেন, যতই তাওয়াজ্জুহ দিন না কেন এর দ্বারা আপনার রোগ দূর হবে না। বরং রোগ তখনই সারবে যখন আপনি তাঁর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন করবেন।

যদি কেউ বলেন, যে আমার ডাক্তার দারুণ পারদর্শী ও স্নেহপরায়ন। এ জন্য আমার কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি ডাক্তারের নিকট গিয়ে নিজের অবস্থা জানালেন এবং ঘরে ফিরে বসে থাকলেন, ডাক্তার সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত ঔষধ পান করলেন না! এমন ব্যক্তি সারা জীবনেও সুস্থ হবে না, বরং সুস্থ তখনই হবে যখন ঐ ডাক্তার সাহেবের স্নেহ মিশ্রিত ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করবে। ডাক্তার সাহেব নির্দেশিত ঔষধ-পত্র নিজে গিয়ে বাজার থেকে কিনে আনবেন। হ্যাঁ! এটা হতে পারে যে, ডাক্তার সাহেব স্নেহপরায়ন হয়ে নিজের পক্ষ থেকেই ঔষধ দিয়ে দিলেন যদ্দরুন তাকে আর

ঔষধ ক্রয় করতে হল না। কিন্তু ঐ ঔষধ তাকেতো অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঔষধ ব্যবহার না করবে ততক্ষণ শুধু ডাক্তারের স্নেহের দ্বারা ফায়দা হবেনা।

পথ নিজেকেই অতিক্রম করতে হবে

শায়খ হলেন রূহানী চিকিৎসক। তিনি 'রূহ' এর ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা করেন। আত্মিকব্যাধিসমূহ শনাক্ত করে তদনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেন। এখন এই শায়খ আপনার প্রতি যতই দয়ালু ও স্নেহপরায়ন হন না কেন, যতই আপনাকে মহব্বত করুন না কেন, শুধু ঐ স্নেহ আর মহব্বতে কাজ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজে কদম না বাড়াবেন, এবং তাঁর বাতলানো চিকিৎসাপত্র অনুযায়ী কাজ না করবেন। এ জন্য প্রত্যেক মানুষকে নিজের পথ নিজেই চলতে হয়, নিজে নিজেই আমল করতে হয়। আর আখেরাতের পুরস্কার বা শাস্তিও মানুষের নিজ আমল অনুসারেই হবে। অবশ্য শায়খ পথ দেখান। পথ নির্ধারিত করেন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি বাতলে দেন। কিন্তু সে পথে নিজেকেই চলতে হয়। এজন্য শায়খের তাওয়াজ্জুহ ও দু'আকে একদম বেকার মনে করবেন না যে, সব কিছু তো আমিই করছি! শায়খ তো কিছুই করছেন না! ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। কেননা শায়খের দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা সালেকের হিম্মতে শক্তি দান করেন এবং নেক আমলের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেন।

নেক আমলকে শায়খের তাওয়াজ্জুহ-এর ক্রিয়া মনে করুন

আল্লাহ তা'আলা শায়খের মাধ্যম এ জন্যও রেখেছেন যে, এ সম্পর্কের নিসবতের কারণে নফসের অনেক চক্রান্তের চিকিৎসা হয়ে যায়। যেমন, নিজের কোন আমল ভাল মনে হল, মনের মধ্যে আসল: আজ আমি অমুক ভাল কাজ করেছি, অমুক ইবাদত আঞ্জাম দিয়েছি, এভাবে শয়তান তার অন্তরে বড়ত্বের কুমন্ত্রণা দেয়: তুমিতো আজ দারুণ কাজ করেছ! তুমি তো বড় বড় ওলীর মতো অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছ! ফলে এ ব্যক্তি খোদপসন্দী ও অহংকার এর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিজ আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এ সকল মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা শায়খের সাথে ঐ সম্পর্ক কে

নফসের এ ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার মাধ্যম বানিয়ে দেন। সেটা এভাবে যে, মানুষ এ নেক আমলকে নিজ শায়খের দিকে নিসবত করে বলবে: আলহামদুলিল্লাহ। নেক আমলের যে তাওফীক আমার লাভ হল সেটা আমার শায়খের বরকত হল, আমার শায়খের তাওয়াজ্জুহ ও দু'আর দ্বারা হল। অর্থাৎ, আমার শায়খের তাওয়াজ্জুহ ও দু'আর বরকতে আমার হিম্মতের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হয়েছে আর ঐ শক্তির বদৌলতে এ আমলের তাওফীক হয়েছে। সুতরাং যখন শায়খের সাথে সম্পর্ক হবে তখন ঐ নেক আমলকে শায়খের দিকে নিসবত করে দিবেন। ফল এই হবে যে নফসের চক্রান্ত সেখানেই খতম হয়ে যাবে।

এসব হাজী ছাহেবের ফয়েয

আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন : হযরত থানভী রহ. কে বেশ কয়েকবার– কখনো আম ওয়াযের মজলিসে, আবার কখনো খাস ওয়াযের মজলিসে দেখেছি– বয়ানের মাঝে যখন অতি সূক্ষ্ম অথবা উচ্চতত্ত্বপূর্ণ কোন কথা বলতেন যা শুনে শ্রোতাবৃন্দও শিহরিত হতেন, তখন এরপর সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠতেন: এ সব হল আমার হাজী ছাহেব রহ. এর ফয়েয। এ সব হল আমার হাজী ছাহেব রহ. এর ফয়েয।

আর আবেগময় ভঙ্গিতে এ কথাটা বারবার দোহরাতেন এবং-এর মাধ্যমে নিজের চিকিৎসা করতেন। যাতে ঐ সূক্ষ্ম কথা বলার পরে মনের মধ্যে এমন খেয়াল না আসে যে, আজ আমি দারুণ সুন্দর ও চমৎকার কথা বলেছি, এই খেয়ালের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করতেন।

যাইহোক! আল্লাহ তা'আলা শায়খকে নফসের ষড়যন্ত্রসমূহ থেকে বাঁচার এক মাধ্যম বানিয়েছেন। এ জন্য যখনই নিজের কোন আমল ভাল মনে হবে,সেটাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে নিজ শায়খের দিকে সম্বন্ধ করবে। আর বলবে: 'এই সব হল আমার শায়খের ফয়েয।'

আমল নিজে করে শায়খের দিকে নিসবত করুন

আমাদের শায়খ হযরত আরেফী রহ. বলেন: একবার হযরত থানভী রহ. ওয়ায করছিলেন। ওয়ায চলাকালীন তাঁকে একটি বিশেষ অবস্থা আচ্ছাদিত

করে ফেলল। আর তিনি জোশের সাথে জোরে জোরে এটা বলতে লাগলেন: 'এটা ঐ হাজী ছাহেবের ফয়েয। এটা ঐ হাজী ছাহেবের ফয়েয।' এজন্য ভালভাবে বুঝে নিন। শায়খের মাধ্যমকে এ কথা বলে অবজ্ঞা করবেন না যে, শায়খ তো কিছুই করছেন না। সব কিছু আমি একাই করছি! আবার এটাও মনে করবেন না যে, যা করার শায়খই করবেন। আমার কিছুই করতে হবে না! হাতের উপর হাত রেখে বসে গেলেন।

এ উভয় প্রকার মানসিকতাই চরম পর্যায়ের ভুল। আর সঠিক অবস্থান হল এই উভয় মানসিকতার মাঝা-মাঝি। আমল নিজে করুন। নিজ ইখতিয়ার প্রয়োগ করুন। স্বীয় হিম্মতকে ব্যবহার করুন। আর ঐ হিম্মতকে শক্তিশালী করার জন্য শায়খের বরকত ও দু'আকে সহযোগী মনে করুন।

তোমার এমনই মনে করা উচিৎ

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর এক মুরীদ ছিলেন। তিনি একদিন হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর নিকট এসে নিজের ভাল ভাল হালত বয়ান করলেন। আর বললেন যে: 'হযরত! এ সব হল আপনার ফয়েয।' হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : ' তোমার এমনই মনে করা উচিৎ।' অবশ্য আমি এর হাকীকত তোমাকে বলছি, হাকীকত বা বাস্তব কথা হল: এ ভাল গুণগুলো তোমার মধ্যে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। আমার দিকনির্দেশনার ফলে এখন সেটা প্রকাশ পেয়েছে। তবে তোমার এটাই মনে করা উচিৎ যে, এটা হাজী ছাহেবের ফয়েয। অতঃপর একটি ঘটনা শুনালেন।

একটি ঘটনা

সেটা এই যে, একবার জনৈকা মহিলা আগুন আনার জন্য প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেলেন। আগের যমানায় লাকড়ী ও কয়লা জ্বালানো হত। চুলা ঠান্ডা থাকলে সেটাকে গরম করতে অনেক সময় লাগত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি প্রতিবেশী কোন মহিলার চুলায় আগুন থাকত তাহলে প্রতিবেশীর চুলা থেকে একটি জ্বলন্ত কয়লার খণ্ড উঠিয়ে নিয়ে আসত। এতে চুলা জ্বালাতে সুবিধা হত। এ মহিলাও নিজ প্রতিবেশী মহিলার ঘরে গিয়ে বললেন : আপা! আমার ঘরে আগুন নেই। অনুমতি পেলে আপনার চুলা থেকে আগুন নিয়ে

নিব। ঐ প্রতিবেশী মহিলা বললেন : আমার চুলা তো ঠান্ডা। এর মধ্যে তো আগুনই নেই। এ মহিলা বললেন, বোন যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি চুলায় খুঁজে দেখি? হতে পারে কোন স্ফুলিঙ্গ মিলে যাবে। প্রতিবেশী ঐ মহিলা বললেন : ঠিক আছে খুঁজে দেখে নাও। অতএব এ মহিলা খুনতি দ্বারা চুলায় নড়াচড়া দিলো, তখন ভিতর থেকে একটি ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে আসল। এ মহিলা বললেন: আমার কাজ হয়ে গেছে। তারপর সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে ফিরে গেলেন।

এ কাহিনী শুনানোর পর হযরত হাজী ছাহেব রহ. বলেন : অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার চুলায় বিদ্যমান ছিল। যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ না থাকত তবে এ মহিলা সহস্রবারখুনতি চালালেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হত না। কেননা অগ্নিস্ফুলিঙ্গতো পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার খুনতি চালানোর দ্বারা বের হল। যদি এ খুনতি না চালাত তবে সেই স্ফুলিঙ্গও ধীরে ধীরে নিভে নিঃশেষ হয়ে যেত।

শায়খ হলেন খুনতি চালানেওয়ালা

বাস্তবিকপক্ষে শায়খ হলেন চুলার মধ্যে খুনতি চালানেওয়ালা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গতো স্বয়ং মুরীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যদি শায়খ তার মধ্যে খুনতি না চালাতেন তবে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেখানে পড়ে থেকেই শেষ হয়ে যেত। তার দ্বারা কোন উপকার গ্রহণ করা যেত না। কিন্তু শায়খ খুনতি চালিয়ে তাকে উপকারী বানিয়ে দেন। এ জন্য শায়খ একদম বেকারও নন, যেহেতু খুনতি তিনিই চালাচ্ছেন। আবার শায়খ মূল কর্তাও নন। কেননা অগ্নিস্ফুলিঙ্গতো পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। শায়খ শুধু তাকে বের করে তার দ্বারা কাজ নিয়েছেন।

হযরত হাজী সাহেব রহ. কত সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে এ ব্যাপারটি বুঝালেন।

শায়খকে বড় নেয়ামত মনে করবে

আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর নিকট হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান সাহেব অমৃতসরী রহ.-এর ব্যাপারে একাধিকবার শুনেছি, তিনি হযরত থানভী রহ. এর খলীফা ও তাঁর আশেক

ছিলেন। একদিন হযরত মুফতী সাহেব হযরত থানভী রহ. কে বলতে লাগলেন: 'হযরত! এ 'খানকার' সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার নেয়ামতের উপর শোকর আদায়ের জন্য যদি সারা জীবন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে সেজদায় পড়ে থাকি, তবুও শোকর আদায় হবে না।' হযরত থানভী রহ. তাঁর এ কথা শুনে সেটা খণ্ডন করেননি। বরং বললেন: 'হ্যাঁ ভাই! আপনার এমনই মনে করা উচিৎ। কেননা তালিবের ফায়েদা এর মধ্যেই নিহিত যে, সে নিজেকে শায়খের অনুগত মনে করবে ও শায়খের নিকট নিজেকে ঋণী ভাববে এবং এটা বুঝবে যে এই শায়খ আমার জন্য বিরাট নেয়ামত।'

যাইহোক! এটার নামই হল 'ভারসাম্য'। মানুষ এদিকেও ঝুঁকবে না, ও দিকেও ঝুঁকবে না। আর এটার নামই হল সুন্নাত-শরীয়ত ও তরীকতের মিশ্রণ। যাতে প্রতিটি জিনিস তার সীমারেখার মধ্যে থাকবে। ঐ সীমারেখা থেকে আগে বাড়বে না। এটাই তরীকতের সারকথা।

শরীয়ত, সুন্নাত এবং তরীকত

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. খুব সুন্দর কথা বলতেন : যা মনে রাখার মত। সেটা এই যে, 'দেখ! শরীয়ত হল হুকূকের নাম, কার হুকূক? আল্লাহর হুকূক ও বান্দার হুকূক। আর পুরো শরীয়ত এ দুটি বিষয়ের মাঝেই আবর্তিত। 'সুন্নাত' হল সীমারেখাসমূহের নাম। অর্থাৎ এ হকগুলো কীভাবে আদায় করা হবে? এবং কোন্ সীমারেখার মধ্যে থেকে আদায় করা হবে? এটা সুন্নাত দ্বারা জানা যায়। আর 'তরীকত' এর অর্থ হল 'সীমারেখাসমূহ সংরক্ষণ'। অর্থাৎ, ঐ 'হুকূক' বা হকসমূহের যে 'হুদূদ' বা সীমারেখা আছে, সেগুলো কীভাবে হেফাযত করবে? এক কদম আগেও বাড়বে না পিছেও হটবে না। ব্যস, ঐ সীমারেখায় গিয়ে মানুষ থেমে যাবে। এই সীমারেখা হেফাযত 'তরীকত' এর মাধ্যমে আঞ্জাম দেয়া হয়। অর্থাৎ, শায়খের নিকট গিয়ে মানুষের মন-মানসিকতা এমনভাবে গড়ে উঠে যে, ঐ সীমারেখা হেফাযতের যোগ্যতা তার মধ্যে পয়দা হয়।

যাইহোক! তিনি তিনটি বাক্যে এভাবে বলতেন–

শরীয়ত– হুকূকের নাম।

সুন্নাত– হুদূদের নাম।

তরীকত– হুদূদের হেফাযতের নাম।

এ জন্য পীর-মুরীদীর যত কার্যক্রম আছে তথা শায়খের নিকট যাওয়া, নিজ আত্মশুদ্ধি করানো। এসবের উদ্দেশ্য হল, হুদূদের হেফাযত। অর্থাৎ, আমি কতটুকু কাজ করব? কোথায় গিয়ে থেমে যাব? এর থেকে আগে বাড়ব না, ইত্যাদি। এটা এমন একটা জিনিস, যেটাকে একটা দুটো করে নির্ধারিতভাবে বলা মুশকিল; যতক্ষণ পর্যন্ত এর বাস্তব প্রশিক্ষণ, এর মশক ও অভ্যাস গড়ে তোলা না হবে।

শায়খকে তাঁর মাকামে রাখুন

শায়খের মাকামও এটাই। আল্লাহ্ না করুন যদি শায়খের না-কদরী হয়ে যায়, তবে অনেক বড় বিপদের কথা। আর যদি শায়খকে তাঁর মাকাম থেকে আগে বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তাঁকে 'খোদা' বানিয়ে দেয়া হয়!! আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচান। এটা হল শিরকের মাকাম। এ সীমানাদ্বয়ের মাঝে থেকে কীভাবে চলবে? এটাও শায়খই বাতলে দিবেন। যেমনটি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রহ. বাতলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এর বুঝ দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ত্রিশতম মজলিস

হিম্মত এবং ইখলাস

হিম্মত এবং ইখলাস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّابَعْدُ

উপস্থিতির ধ্যান ও হিম্মত সংশোধনের জন্য মহৌষধ

হযরত থানভী রহ. বলেন:

‘ইখলাস ও হিম্মত হল তাসাওউফের সারনির্যাস। এ দু’টি জিনিসের মধ্যেও আসল হল হিম্মত। কেননা ইখলাস সৃষ্টির জন্যও হিম্মতেরই প্রয়োজন হবে। আর ‘হিম্মত’-এর জন্য ‘ইস্‌তিহযার’ বা উপস্থিতির ধ্যান সহযোগী হয়ে থাকে। ইসতিহযারের বিভিন্ন সূরত আছে। শাইখ যে সূরত নির্ধারণ করে দেন তদনুযায়ী আমল করবে। যেমন, (শায়খ বললেন) প্রত্যেক অন্যায়ের কারণে জরিমানা স্বরূপ দশ রাকাত বা তার থেকে কম-বেশি আদায় করা, যাতে পরবর্তী অন্যায়ের মুহূর্তে জরিমানার ভয়ে ‘ইসতিহযার’ এর কাইফিয়ত পয়দা হয়ে যায়। আর যখন ইসতিহযার হবে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই হিম্মতের মাধ্যমে কাজ করবে এবং নফসের তাকাযাকে দমন করবে যদি ‘ইসতিহযার’ এবং ‘হিম্মত’ এর সাথে কাজ করতে পারে তাহলে ইনশাআল্লাহ ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং ধীরে ধীরে ইসলাহ নসীব হবে। আর প্রত্যহ ‘নুযহাতুল বাসাতীন’ অধ্যয়নের দ্বারাও ইসতিহযার ও হিম্মত শক্তিশালী হয়। এ জন্য ইসতিহযার ও হিম্মত উম্মতের সংশোধনকল্পে সরাসরি অব্যর্থ মহৌষধ।’ (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৫)

ইখলাসের গুরুত্ব

এ বাণীটিতে হযরত থানভী রহ. যে দু'টি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা পুরো 'তাসাওউফ ও তরীকত'-এর সারনির্যাস। এ পথে যেটা অর্জন করতে হয়। আর আমরা যেটাকে 'তাসাওউফ ও তরীকত' বলি বাস্তবিক পক্ষে সেটা দীনের পথ। যেন দীনের পথে চলার জন্য দু'টি জিনিস খুব জরুরী। এ দু'টি জিনিস ব্যতীত দীনের রাস্তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একটি হল 'ইখলাস'। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি আমল একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করবে। ঐ আমলের মধ্যে রিয়া, প্রসিদ্ধি, পদের মহব্বত ইত্যাদির নাম গন্ধও থাকবে না। আর এই ইখলাসই হল সমস্ত আমলের রূহ। যদি ইখলাস হাসিল না হয়, নাউযুবিল্লাহ তবে সমস্ত আমল বেকার। যেমন, নামায পড়ছে কিন্তু উদ্দেশ্যে হল, লোক দেখানো। অথবা, রোযা রাখছে, কিন্তু তার উদ্দশ্য হল এর দ্বারা মানুষের প্রশংসা অর্জন করা। অথবা কুরআন তিলাওয়াত করছে কিন্তু তার নিয়্যত হল পদ মর্যাদা লাভ করা। সুতরাং এসব আমল বেকার ও অর্থহীন। এসব আমলের সামান্য কোন মূল্যও নেই।

দ্বিতীয় জিনিস 'হিম্মত'

দ্বিতীয় জিনিস হল 'হিম্মত'। 'ইখলাস' এর সাথে সাথে নেক আমল, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং গোনাহসমূহ থেকে বাঁচার হিম্মত করতে হবে। পুরো তাসাওউফ ও তরীকতের সারকথা এটাই যে, নিজ আমলের মধ্যে 'ইখলাস' ও 'হিম্মত' সৃষ্টি করতে হবে। এ দু'টি জিনিস হাসিল হয়ে গেলে বুঝবেন বিজয় হয়ে গেছে। মন্যিলে পৌঁছে গেছেন।

এ কথাটা হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলছেন। যিনি এই তাসাওউফ ময়দানের মাটি বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজের পুরো যিন্দেগীর অভিজ্ঞতা, ইলম ও মা'রেফাত, সাধনা ও মুজাহাদার সারনির্যাস বাতলে দিয়েছেন। যে, দু'টি জিনিস অর্জন করতে হবে। একটি 'ইখলাস' আর অপরটি 'হিম্মত'।

সততা ও ইখলাস

এ কথাটি অন্যভাবেও ব্যক্ত করা যায়। আর সেটা হল 'সততা' এবং 'ইখলাস' উভয়টিই কাম্য। 'ইখলাস'-এর অর্থ হল নিয়্যত আল্লাহ তা'আলার জন্য খালেস হবে। আর 'সততা' র অর্থ হল ঐ আমলটা সহীহ-শুদ্ধ এবং শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে। অর্থাৎ, সুন্নাত মোতাবেক হবে। যেমন, নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন, তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠালেন এবং ঐভাবে হাত উঠালেন যেভাবে হাত উঠানো সুন্নাত এবং সুন্নাত অনুযায়ী কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি করলেন। এটার নামই হল 'সততা' আর এই নামাযের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা ও তাঁর দাসত্ব করা। রিয়াকারী বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য নয়। এটার নামই 'ইখলাস'। এ দু'টি জিনিস হাসিল হলে আমলের মধ্যে জান পয়দা হয়। যদি 'ইখলাস' না থাকে শুধু 'সততা' থাকে যেমন, খুব খুশূ-খুযূর সাথে নামায আদায় করল এবং প্রত্যেকটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী আঞ্জাম দিল, তাহলে, (বলা হবে) এ আমলে সততা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু নিয়্যত ঠিক না থাকার কারণে ইখলাস থাকল না, এ জন্য ঐ আমল অর্থহীন হবে।

'সততা'ও জরুরী

আর যদি 'ইখলাস' থাকে কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট আমলের পদ্ধতি ভুল হয় অর্থাৎ, সেটা সুন্নাত অনুযায়ী না হয়। যেমন: নামায খুব দ্রুতগতিতে আদায় করা হল। যেভাবে তা'দীলে আরকান করা দরকার ছিল সেভাবে করল না। তবে এই নামাযের মধ্যে 'ইখলাস' তো ছিল, কিন্তু সেটা সুন্নাত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে কবূল হবে না। এমন নামাযীর ব্যাপারে হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

অর্থাৎ, 'তুমি দাঁড়িয়ে পুনরায় নামায পড়, কেননা তুমি তো নামাযই পড়নি।'

এ জন্য শুধু নিয়্যত ঠিক থাকাও যথেষ্ট নয়। আবার শুধু আমল ঠিক থাকাও যথেষ্ট নয়। বরং যখন উভয়টি শুদ্ধ হবে; তখনই কেবল সেটা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন: যত 'বিদআত' আছে। তার প্রত্যেকটির মধ্যে 'ইখলাস' পাওয়া যায়। কেননা সাধারণত: যারা বিদআতী কর্মকাণ্ড করে। তারা সেটাকে নেক কাজ মনে করেই করে। এবং আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ঐ আমল করে। কিন্তু পদ্ধতি সঠিক না হওয়ার কারণে ঐ আমলটি বেকার হয়ে যায়।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

অর্থাৎ, আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে সব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয় অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে!! (সূরা কাহ্‌ফ-১০৩-১০৪)

এ আমলকারীদের নিয়্যত সঠিক ছিল। কিন্তু পদ্ধতি যেহেতু সঠিক ছিল না। এ জন্য ঐ আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যাইহোক! 'ইখলাস' ও 'সততা' উভয়টিই জরুরী।

সততা এবং ইখলাস অর্জনের মাধ্যম

এ দু'টি গুণ অর্জন করার জন্য হিম্মতের প্রয়োজন হয়। আর 'হিম্মত'-এর মর্ম হল: যদি মানুষের নফস তাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে চায় আর সেই তাকাযার বিরোধিতা করে মানুষ সঠিক পথে চলে, সঠিক আমল করে এটার নামই হল 'হিম্মত'। যেমন, দিলের মধ্যে প্রচণ্ড তাকাযা হচ্ছে: আমার দৃষ্টি এমন স্থানে ফেলব যার দ্বারা স্বাদ অনুভূত হয়। নফসের এই চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা হল, তার বিরোধিতা করা হল। এ বিরোধিতার নামই 'হিম্মত'। কেননা এ বিরোধিতা হিম্মতের দ্বারা হয়। কারণীয় কিংবা বর্জণীয় যত ধরনের আমলই হোক না কেন প্রত্যেকটি আমলে হিম্মত ব্যবহার করা প্রয়োজন। হিম্মতের সাথে কাজ করলে ঐ কাজ হবে নতুবা ঐ কাজ হবে না। যেমন, রোযা রাখার জন্য এবং সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতে হবে। কিন্তু খুব ঘুম

আসছে। শীত লাগছে, উঠা মুশকিল হচ্ছে। উঠতে মন চাচ্ছে না। কিন্তু হিম্মত করে উঠে গেল এবং চিন্তা করল যে, এখন না উঠলে সাহ্রীর সময় শেষ হয়ে যাবে। ফলে হয়তো রোযাই ছুটে যাবে অথবা অবর্ণনীয় কষ্ট হবে। এটা চিন্তা করে সে উঠে গেল এবং নফসের চাহিদাকে পিষে ফেলল। ফলে ঘুম থেকে উঠে সাহ্রী খেয়ে রোযা রাখল। এটারই নাম হল 'হিম্মত'। এমনিভাবে পুরো দ্বীনের উপর আমল করার জন্যও হিম্মতের প্রয়োজন হয়।

'হিম্মত'ই আসল

এ জন্য হযরতও থানভী রহ. বলেন: সমস্ত আমলের সারকথা হল, ইখলাস ও হিম্মত। অতঃপর হযরত আরো বলেন: এ দু'টি জিনিসের মধ্যে 'হিম্মত' ই আসল। কেননা ইখলাস সৃষ্টি করার জন্যও 'হিম্মত'-এর প্রয়োজন হয়। ইখলাসও 'হিম্মত' ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। যেমন কোন মানুষ যখন নামায পড়ার জন্য যায়, তখন নফস ও শয়তান তার অন্তরে এমন কুমন্ত্রণা দেয় যে, আজ যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াবে এবং লোকজন তোমাকে দেখবে তখন তোমাকে মুত্তাকী-পরহেযগার এবং বড় আবেদ ও যাহেদ মনে করবে। ফলে সে নিজেও মানুষদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজ নামাযের মধ্যে আরো বেশি খুশূ-খুযূ পয়দা করবে।

এখন শয়তান এবং নফস মানুষদেরকে দেখানোর জন্য অন্তরে যে কুমন্ত্রণা দেয়, এ থেকে মুক্তি লাভের জন্যও 'হিম্মত'-এর প্রয়োজন। আর সেই 'হিম্মত' হল: মনে মনে এটা চিন্তা করবে: ঐ মাখলূকের চিন্তা বাদ দাও। কেননা মাখলূকের সুনাম বা বদনামে কী আসে যায়? খুশী হলেই কি আর নাখোশ হলেই বা কি? এভাবে চিন্তা করে অন্তর থেকে প্রদর্শনীর যে খেয়াল এসেছিল সেটা বের করে দিবে। কিন্তু এ জন্যও 'হিম্মত' জরুরী। নতুবা নফসের চাহিদা তো এটাই থাকে যে, লোকজনের প্রশংসা করার দ্বারা মজা উপভোগ কর। এ চাহিদাকে দিল থেকে বের করার জন্য হিম্মত করতে হয়।

প্রশংসার দ্বারা অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়

লোকজন যখন কারো প্রশংসা করে। কখনো হয়ত তার জ্ঞানের প্রশংসা করল, কখনো তার আমলের প্রশংসা করল, কখনো তার চরিত্রের প্রশংসা করল, এভাবে যার প্রশংসা করা হয় তার খুব আনন্দ লাগে, সেভাবে এত

এত মানুষ আমার জ্ঞানের প্রশংসা করছে! এ প্রশংসার ফলে ধীরে ধীরে অন্তরে এই অহংকার সৃষ্টি হয় যে, এত মানুষ তো আর বিনা কারণে প্রশংসা করছে না! নিশ্চয়ই আমার মধ্যে ইলম ও জ্ঞান আছে! এজন্যই তো এরা আমার প্রশংসা করছে। কাজেই এ প্রশংসার মাধ্যমে মানুষ অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য এ প্রশংসা খুবই খারাপ জিনিস। এর চিকিৎসা করা না হলে এটা মানুষকে নষ্ট করে ফেলে। এ জন্যই বলা হয়েছে–

اُحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ

অর্থাৎ,'প্রশংসাকারীদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ কর।'

অন্তরে সৃষ্ট অহংকারের চিকিৎসা

এ জন্য যদি কেউ তোমার প্রশংসা করে। যদ্দরুন অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হতে থাকে তবে সেটার চিকিৎসা করবে। চিকিৎসা এই যে, সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে এ ধ্যাণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তির কাছে আমার গুণাবলী প্রকাশ করে দিয়েছেন। যদি আমার খারাপ অভ্যাসসমূহ তার সামনে প্রকাশ হয়ে যেত, তবে এ ব্যক্তি আমাকে ঘৃণা করত। আর সাথে সাথে এটাও চিন্তা করবে যে, এ প্রশংসা দ্বারা আমার কী লাভ হবে? একবার যখন তিনি প্রশংসা করলেন তখন শুনে বড় মজা লাগল। কিন্তু সেই মজাতো শোনার পরেই শেষ হয়ে গেল। এ জন্য ঐ মজা ধরে রাখার জন্য ঐ প্রশংসাকারী ব্যক্তিকে বলুন! আপনি আরেকবার আমার প্রশংসা করুন! তার নিকট এ দরখাস্ত করতে পারবেন কি? করতে পারবেন না।

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. প্রশংসা জ্ঞাপনের ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি কবিতা শুনাতেন। যদি মানুষ সেটাকে মনের মধ্যে গেথে রাখে,তবে প্রশংসার ফেতনা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়ে যাবে। হযরত আরেফী রহ. বলেন:

سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد

اک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد

অর্থাৎ, যখন কোন ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করছে আর বলছে: আপনার অনেক জ্ঞান, আপনিতো অনেক বড় মুফতী, অনলবর্ষী বক্তা, ভাল লেখক,

অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ লিখেছেন, আপনিতো দারুণ সুন্দর দরস দিয়েছেন। চমৎকার ওয়ায করেছেন! এ সময় আপনি চিন্তা করবেন হে দিল! অতঃপর? অর্থাৎ, এ প্রশংসার পর কী হবে? কিছুই হবে না। যে প্রশংসা সে করল সেটা বাতাসে উড়ে গেল।

মজা তো হবে ঐ সময়

আরে মজা তো হবে ঐ সময় যখন আল্লাহ তাআলা বলবেন:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

অর্থাৎ,'হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' (সূরা আল ফজর-২৭-২৮-২৯-৩০)

মজাতো হবে ঐ সময়। এটা ভাব এবং চিন্তা কর, এটা কেমন কথা যে, অন্যের প্রশংসায় খুশী হয়ে গেলে? অমুক আমাকে ভাল বলেছে। অমুক আমার প্রশংসা করেছে। কিন্তু যেহেতু মানুষের নফস তাড়াহুড়া প্রিয়, এ জন্য সে নগদ প্রশংসার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ আকর্ষণের ফলে সে চায় যে, আমি আরো ভাল ভাল কাজ করব যাতে আমার আরো প্রশংসা শুনতে পাই। এখন নফস দ্বিতীয়বার প্রশংসা করানোর জন্য ঐ কাজ করাচ্ছে। এ জন্য নফসকে এ খেয়াল থেকে হটানোর জন্য এবং তাকে সোজা পথে আনার জন্য 'হিম্মত' এর প্রয়োজন পড়ে।

এ জন্যই হযরত থানভী রহ. বলেন: 'হিম্মত'ই হল আসল। যেহেতু ইখলাস অর্জনের জন্য 'হিম্মত' জরুরী। হিম্মত হাসিল না হলে ইখলাসও হাসিল হবে না।

অতএব সারকথা এটাই যে, 'হিম্মত' অর্জনের ফিকির করুন এবং সেটাকে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন।

'হিম্মত'-এর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি আছে

দেখুন! আল্লাহ তা'আলা মানুষের 'হিম্মত'-এর মধ্যে প্রচন্ড শক্তি রেখেছেন। এটাই 'হিম্মত'। যা মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে। একশত

বছর পূর্বে কেউ তো চাঁদে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারত না। ঐ সময় যদি বলা হত: চাঁদে চলে যাও, তাহলে শ্রোতা এ উত্তরই দিত: 'তুমি দেখছি উম্মাদ হয়ে গেছ, তোমার মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গেছে'। ঐ যুগে মানুষের বাতাসে উড়াটাকেও অসম্ভব মনে করা হত।

বাতাসে উড়ার একটি ঘটনা

আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ 'সিহাহ'-এর লেখক হলেন ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ জাওহারী, তাঁকে আরবী অভিধানের 'ইমাম' মনে করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে 'পাগলা বুদ্ধিজীবী' হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, তিনি খুব বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও দারুণ আহমকীর একটি কাজ করেছেন!

তাঁর মনে একবার এ খেয়াল চাপল যে আমি বাতাসে উড়ব। ফলে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে বাতাসে উড়ার সাধনা ও অনুশীলন করলেন। কিছু দিন মশক করার পর একদিন তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, আজ আমি জামে মসজিদের মিনারের উপর থেকে লোকজনকে উড়ে দেখাব! ফলে ঘোষণা শুনে হাজার হাজার মানুষ সেখানে জমা হয়ে গেল। তিনি মিনারে উঠে নিজ উড়ার দৃশ্য প্রদর্শন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন! এই প্রদর্শনীর সময় ধড়াম করে নিচে পড়ে গেলেন। আর সাথে সাথেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল!! এজন্যই লোকজন তাকে 'পাগলা বুদ্ধিজীবী বলে।

যাইহোক! ঐ যুগে উড়ার প্রচেষ্টাকে আহমকীর কাজ মনে করা হত। কিন্তু এই হিম্মত উন্নতি করল। উন্নতি করতে করতে মানুষ উড়তে আরম্ভ করলো।

বাতাসে সর্বপ্রথম উড়ন্ত মানুষ মুসলমান ছিল

সর্বপ্রথম মানুষ যিনি বাতাসে উড়েছিলেন তিনি তুরস্কের একজন মুসলমান ছিলেন। লোকজন এ ভুল কথাটি প্রসিদ্ধ করে রেখেছে যে, সর্ব প্রথম রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্লেন আবিষ্কার করেছেন!! কিন্তু সহীহ কথা হল: পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথম উড়ার প্রদর্শনী করেছেন তিনি হলেন, উসমানী খেলাফতের সময়ের জনৈক তুর্কী মুসলমান। আজও তাঁর সেই পাখা ইস্তাম্বুলের 'বুরুজ গালাতায়' লটকানো আছে। যে পাখার মাধ্যমে তিনি উড়ে দেখিয়েছিলেন। তিনি সে পাখার মাধ্যমে ৮ মাইল দূরত্ব অতিক্রম

করেছিলেন। বুরুজ গালাতা থেকে উড্ডয়ন করে 'বসফরাস প্রণালী' পাড়ি দিয়েছেন। ৮ মাইল উড়ার পরে নিচে অবতরণ করেছেন! তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম উড়নেওয়ালা মানুষ ছিলেন।

'হিম্মত' কোথায় পৌঁছে দিয়েছে?

তিনি কিভাবে উড়েছেন? হিম্মতের মাধ্যমে। এরপরে যখন ঐ হিম্মত আরো উন্নতি করল, তখন প্লেনের আকৃতি ধারণ করল। প্রাথমিক পর্যায়ে প্লেন এমন হত যাতে বসাও মুশকিল ছিল। ঐ হিম্মতই যখন আরো উন্নতি লাভ করল তখন পাখার জাহাজ আবিস্কৃত হল। এরপরে যখন সেই হিম্মত আরো তরক্কী করল তখন 'জেট' বিমান আবিষ্কৃত হল। এরপরে সেই হিম্মতের উন্নতির ফলে 'কনকর্ড' বিমান তৈরী হল। এরপরে হিম্মতের মধ্যে আরো অগ্রগতি হয়ে মানুষ মহাশূন্যে পৌঁছে গেল।

যাইহোক! আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিম্মতের মধ্যে দারুণ শক্তি রেখেছেন। এখন এটা মানুষের দায়িত্ব, সে চাইলে এ হিম্মতকে ভাল কাজেও লাগাতে পারে। আবার চাইলে মন্দ কাজেও লাগাতে পারে।

'হিম্মত' কারিশমা দেখাবে

এ জন্য আপনারা এ 'হিম্মত'কে ভাল কাজে ব্যয় করুন। এবং এ 'হিম্মত'-এর মাধ্যমে স্বীয় কুপ্রবৃত্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করুন। নাজায়েয উপায়ে উত্থিত চাহিদাগুলো দাবিয়ে রাখার জন্য এ 'হিম্মত' কে ব্যবহার করুন। এরপরে দেখুন! এ 'হিম্মত' আপনাকে কী কী কারিশমা দেখায়!!

হিম্মত কীভাবে সৃষ্টি হবে?

এই হিম্মত সৃষ্টি করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। একটি পন্থা হল, হিম্মত ওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বন করা। তাঁদের সাথে উঠা বসা করা। এভাবে ধীরে ধীরে আপনার মধ্যেও তাঁদের 'হিম্মত' স্থানান্তরিত হবে।

দ্বিতীয় পন্থা হল, হিম্মতওয়ালাদের জীবনী ও অবস্থাসমূহ পাঠ করুন। এর মাধ্যমেও তাঁদের হিম্মত আপনার মধ্যে আসবে।

তৃতীয় পন্থা হল, হিম্মতের 'ইসতিহযার' করুন। অর্থাৎ, কোন ইবাদতে ক্রটি হয়ে গেলে নিজের জন্য কিছু শাস্তি নির্ধারণ করুন। যেমন আমি অমুক

গোনাহ্ করি এবং হিম্মত করে সে গোনাহ থেকে বিরত না থাকি তাহলে এত রাকাত নফল নামায পড়ব। অথবা এত পয়সা সদকা করব। অবশ্য এ শাস্তি এত বেশি হওয়া অনুচিৎ যে, মানুষ সেই শাস্তির উপর আমলই করতে পারে না। আবার এত সামান্য হওয়াও ঠিক নয় যে, সেটার গুরুত্বই বুঝা গেল না। বরং প্রত্যেক গোনাহের কারণে চার অথবা ছয় রাকাত নির্ধারণ করে নিন। এর ফলাফল এই হবে যে, যখন নফস ঐ গোনাহের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা দিবে, তখন মনের মধ্যে এই খেয়াল আসবে যে, যদি আমি এ গোনাহ্ করি তবে আমাকে ছয় রাকাত পড়তে হবে। ফলে সে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার হিম্মতের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে।

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু প্রত্যেক মানুষের 'হিম্মত'কে বাড়ানো এবং তার দ্বারা কাজ নেয়ার পন্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। একই ব্যবস্থাপত্র সবাইকে দেয়া যায় না। এ জন্য শায়খ এই ফয়সালা করেন যে, ঐ মানুষের হিম্মতকে কাজে লাগানোর জন্য কোন্ পন্থা উপযোগী হবে? নিজ মতানুসারে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার আশংকা থাকে। পক্ষান্তরে কোন শায়খের সাথে সম্পর্ক থাকলে তিনি আপনার অবস্থা অনুযায়ী যে ব্যবস্থাপত্র দিবেন, সেটা আপনার হিম্মতকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সমীচীন হবে।

সারকথা

আজকের আলোচনার সারকথা এটাই হল যে, পুরো দ্বীনের উপর আমল করার জন্য সব থেকে বুনিয়াদী জিনিস হল 'হিম্মত'। আর এই 'হিম্মত'কে শক্তিশালী করার জন্য হিম্মতওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বন করতে হবে এবং তাঁদের জীবনী ও বাণীসমূহ পাঠ করতে হবে, এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে আপনা আপনিই 'হিম্মত' পয়দা হয়ে যায়। অবশ্য এসব কাজ কোন শায়খের তত্ত্বাবধানেই করা উচিৎ, এটা ছাড়া অনেকসময় ভুল হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমতে ও অনুগ্রহে আমাদের সকলকে হিম্মত দান করুন। আমীন।

একত্রিশতম মজলিস

আমলের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করুন

আমলের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ - أَمَّا بَعْدُ

অবস্থা দু' প্রকার

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন:

'তাসাওউফ' শাস্ত্রে ইখতিয়ারভুক্ত আমলসমূহের মধ্যে দৃঢ়তা কাম্য। আর যুক্তিগত মহব্বতই কাম্য, প্রকৃতিগত মহব্বত নয়। 'হালের' দুটি অর্থ। একটি হল ইখতিয়ার বহির্ভূত কাইফিয়াত বা বিশেষ অবস্থা, আর অপরটি হল ইখতিয়ারভুক্ত আমলসমূহের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অর্জন করা, দ্বিতীয় অর্থে 'হাল' এর উপস্থিতি কাম্য, যেহেতু সেটার প্রতিশ্রুতি হাদীসে পাকে এভাবে দেয়া হয়েছে–

كَذٰلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَهُ بَشَاشَةُ الْقُلُوْبِ

অর্থাৎ 'ঈমানের এ সূরতই হয় যখন তার তৃপ্তি অন্তরে বসে যায়।' (সহীহ বুখারী-ওহীর সূচনা অধ্যায়)

আর কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

অর্থাৎ, 'যাঁকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দিতে চান তাঁর সীনা কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।'

(সূরা আনআম আয়াত-১২৫)

আর তাসাওউফে এ অবস্থাটাই কাম্য। যখন কোন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেক আমল অবলম্বন করে তখন ধীরে ধীরে ঐ

আমলগুলো সহজ হতে তাঁকে এবং একটি মযবূত কাইফিয়াত দিলের মধ্যে পয়দা হয়। আর যদিও সরাসরি এ কাইফিয়াতের দৃঢ়তা ইখতিয়ারবহির্ভূত ব্যাপার কিন্তু তারপরও এটা এ অর্থে ইখতিয়ারভুক্ত; যেহেতু এর উপকরণসমূহ ইখতিয়ারভুক্ত অর্থাৎ, নেক আমলসমূহ।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহব্বত সৃষ্টি করা ওয়াজিব। যেহেতু কুরআন-হাদীসে সেটা অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শওক-যওক বা উৎসাহ ও উদ্দিপনা এগুলো অর্জনের ব্যাপারে কোথাও কোন নির্দেশ নেই।

যে মহব্বত অর্জনের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটা হল যুক্তিগত মহব্বত। আর যুক্তিগত মহব্বত ইখতিয়ারী বিষয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতিগত মহব্বত সেটা ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। এজন্য সেটার নির্দেশও দেয়া হয়নি।' (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৬)

গাইরে ইখতিয়ারী কাজের ব্যাপারে কোন ধর পাকড় নেই

হযরত থানভী রহ. এই বাণীটিতে দু'টি বিষয় বয়ান করেছেন।, একটি হল: এটি একটি মূলনীতি যে মানুষ শুধুমাত্র ঐসব কাজের ব্যাপারেই আদিষ্ট যা তার ইখতিয়ারে আছে। পক্ষান্তরে যে কাজ মানুষের ইখতিয়ারের বাইরে। সেটার ব্যাপারে মানুষকে কোন যিম্মাদারীও দেয়া হয়নি।

কুরআনে কারীমে পরিস্কার ভাষায় ইরশাদ হয়েছে:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা কাউকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দেন না যা তার সাধ্যের বাইরে।' (সূরা বাকারা-২৮৬)

মানুষ শুধুমাত্র ইখতিয়ারী ব্যাপারে আদিষ্ট। গায়রে ইখতিয়ারী ব্যাপারে মানুষ আদিষ্ট নয়। এ জন্য কোন গায়রে ইখতিয়ারী কাজ যদি মানুষ করতে না পারে, তবে এর উপর মানুষকে পাকড়াও করা হবে না যে, তুমি এ কাজ কেন করনি? কেননা ঐ কাজটি তার সাধ্যের বহির্ভূত ছিল।

'হাল'-এর প্রথম প্রকার: গাইরে ইখতিয়ারী কাইফিয়াত

যিকির ও শোগলের প্রভাবে সৃষ্ট বিশেষ অবস্থাকে সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় 'হাল' বলে। যেমন বলা হয়, অমুক জিনিস হল তার 'হাল'।

হযরত থানভী রহ. বলেন : এ 'হাল' দু' প্রকার। (১) গাইরে ইখতিয়ারী কোন কাইফিয়াত সৃষ্টি হওয়া। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শোনামাত্রই বে ইখতিয়ার কান্না চলে আসে। আল্লাহর এমন অনেক বান্দাও আছেন, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনামাত্রই যাঁদের চোখ থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়। এটা একটা হাল ও কাইফিয়াত। কিন্তু এটা গাইরে ইখতিয়ারী কাইফিয়াত। কেননা যখন তখন কান্নাকাটি করা বা চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া থেমে যাওয়া, মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। সাধারণত: এগুলো মানুষের ইখতিয়ারে থাকে না।

অথবা আল্লাহ পাকের কোন কোন বান্দার উপর বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে 'ওয়াজদ' (অন্তরে অনিয়ন্ত্রিত ভাব) প্রকাশ পায়। এটাকেও গাইরে ইখতিয়ারী 'হাল' বলে।

'হাল' এর দ্বিতীয় প্রকার: আমলের মধ্যে দৃঢ়তা

(২) হালের দ্বিতীয় প্রকার হল : নেক আমলের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া। এটাকেও সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় 'হাল' বলে। তবে এটা দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে 'হাল'। অর্থাৎ ,কোন নেক আমলের ক্ষেত্রে এমন দৃঢ়তা সৃষ্টি হল যে, ঐ নেক আমলটি মানুষের দ্বিতীয় তবিয়ত (সাধারণ অভ্যাস) বনে গেল।

যেমন, নামায, ছেলেবেলায় যখন সেটা পড়া আরম্ভ করেছিল তখন খুব কষ্টকর মনে হত। পড়তে মনে চাইত না। কখনো পড়ত, কখনো পড়ত না। কিন্তু পিতা-মাতা ও শিক্ষকবৃন্দ জোর করে নামায পড়ায় লাগিয়ে দিলেন। ফলে এখন ধীরে ধীরে নামাযের অভ্যাস গড়ে উঠেছে এবং এতে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়েছে। এমন দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়েছে যে, এখন যদি কেউ তাকে বলে যে, এই নাও এক লক্ষ টাকা এর বিনিময়ে নামায ছেড়ে দাও! তাহলে

(নিয়মিত) ইনশাআল্লাহ্ নামাযী মানুষ নামায ছাড়বে না। তাকে যত লোভই দেখানো হোক না কেন। অথবা তার গলায় তরবারী ধরা হোক না কেন। এটাকেই দৃঢ়তা বলে। এবং এটাকেই দ্বিতীয় অর্থের 'হাল' বলে। অর্থাৎ, নামায তার 'হাল' বনে গেছে। দ্বিতীয় তবিয়ত (সাধারণ অভ্যাস) হয়ে গেছে। এখন আর সেটা ছুটবে না।

'হাল'-এর প্রথম প্রকার উদ্দেশ্য নয়

হযরত থানভী রহ. বলেন, 'হাল'-এর প্রথম প্রকার– অর্থাৎ, গাইরে ইখতিয়ারী বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ পাওয়া। যেমন, কান্না প্রকাশ পাওয়া, অন্তর উথলে আসা, আনন্দ ও স্বাদ অনুভূত হওয়া। এ জিনিসগুলো– সরাসরি কাম্যও নয় এবং এগুলোর ব্যাপারে আখেরাতে কোন প্রশ্নও করা হবে না যে, আমার নাম (মনে) আসা সত্ত্বেও তুমি কেন ক্রন্দন করনি? তোমার চোখের অশ্রু কেন প্রবাহিত হয়নি? এ জাতীয় প্রশ্ন আখেরাতে হবে না। কেননা এসব হল গাইরে ইখতিয়ারী কাইফিয়াতের হাল।

এমনিভাবে যদি কারো নামাযের মধ্যে মজা না লাগে, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। কেননা সেই মজাতো কাম্যই নয়। যদি সারা জীবনও নামায-এর মধ্যে আপনার মজা না লাগে তারপরও সুন্নাত তরীকায় নামায অব্যাহত রাখেন, তাহলে এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না । কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এটা জিজ্ঞেস করবেন না যে, নামাযের মধ্যে তোমার মজা লাগেনি কেন? আর যেহেতু নামাযের মধ্যে তোমার মজা লাগেনি, এজন্য আমি তোমাকে জাহান্নামে প্রেরণ করছি! আল্লাহ্ তা'আলা এমনটি করবেন না। কেননা মজা লাগা বা না লাগাটা হল গাইরে ইখতিয়ারী কাজ। আর গাইরে ইখতিয়ারী কাজে কৈফিয়ত চাওয়া হবে না। এ জন্য এটা অর্জনের নিমিত্ত বেশি ফিকির করাও অনুচিৎ।

বিভিন্ন হালত প্রশংসিত, উদ্দেশ্য নয়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এ মাসআলাটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। নতুবা তাসাওউফের সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর ভেতরে-এর হাকীকত ঢুকে গিয়েছিল, আর লোকজনও

কাইফিয়াত ও হালাতকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিল। আর এটা মনে করা হচ্ছিল যে, তাসাওউফের উদ্দেশ্যই হল এসব হালত আর কাইফিয়াত!

ইবাদতে স্বাদ অনুভূত হওয়া, কান্না প্রকাশ পাওয়া, অশ্রু প্রবাহিত হওয়া, দিল জারী হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আসল মাকসূদ বানিয়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু হযরত থানভী রহ. দুধকে দুধ এবং পানিকে পানি হিসেবে পৃথক করে দিয়েছেন। এবং মাত্র দু'টি শব্দে কথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যাতে বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি না থাকে। হযরত থানভী রহ. বলেছেন : এসব হালত মৌলিক উদ্দেশ্য নয়। যদিও প্রশংসিত। অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে এমন হালত দান করেন তবে সেটা কোন খারাপ কথা নয়। ভাল কথা। এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করবে। কিন্তু এটাই মকসূদ বা উদ্দেশ্য নয়। এ জন্য এর পিছনে পড়ো না। যদি হাসিল হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করবে। আর হাসিল না হলেও আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে যে, আলহামদু লিল্লাহ্ আমলের তাওফীক তো হল।

নামাযের মধ্যে মজা তালাশ করো না

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ.-এর নিকট লিখলেন: হযরত! নামায পড়তে পড়তে সারা জীবন পার হয়ে গেল। কিন্তু নামাযে মজা আসল না। কোন চিকিৎসা বাতলে দিন!

এর উত্তরে হযরত লিখলেন :নামাযের মধ্যে মজা পাওয়া কোন জরুরী বিষয় নয়। তুমি কি মজা পাওয়ার জন্য নামায পড়ছ নাকি আল্লাহ্ তা'আলার বন্দিগীর খাতিরে নামায পড়ছ? যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ এ জন্য নামায পড়ছি। আরে! যদি মজার উদ্দেশ্যেই নামায হয়, তবে সেটা কেমন নামায হল? প্রকৃত নামায তো সেটাই, যা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর বন্দিগীর খাতিরে পড়া হয়। চাই এ নামাযে মজা লাগুক বা না লাগুক। যত কষ্টই হোক না কেন।

আমি ঐ ব্যক্তিকে মুবারকবাদ জানাই

এ জন্যই হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন : যে ব্যক্তি সারা জীবন কখনো নামাযে মজা পায়নি, স্বাদ পায়নি এবং তার উপর কখনো

বিশেষ অবস্থাও জারি হয়নি, এমন ব্যক্তিকে আমি মুবারকবাদ দেই। কেন? কেননা যদি নামাযের মধ্যে তার মজা লাগত বা বিশেষ কাইফিয়াত হাসিল হত তবে এটাকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করে বসার আশংকা ছিল এবং এটাকেই নামাযের সারনির্যাস ভাবার আশংকা ছিল! ফলে সে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হত। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ অবস্থাসমূহ থেকে দূরে রেখে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

যাইহোক! ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে এ সব আনন্দ ও বিশেষ অবস্থার পিছনে ছুটবেন না। এসব অবস্থার কারণে হয়ত খোদপসন্দী ও অহংকার সৃষ্টি হয় অথবা সেটাকে আসল মাকসূদ মনে করার কারণে কোন সময় সেটাতে স্বল্পতা দেখা দিলে নিজেকে অকৃতকার্য ও বঞ্চিত মনে করে বসে। এউভয় অবস্থাতেই ক্ষতি। এ জন্য বিশেষ কাইফিয়াত প্রত্যেকের জন্য উপযোগীও নয়। বিধায় এটার ফিকিরই করবে না।

কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতসমূহের উপর পুরোপুরি আমল করতে থাকুন। কান্না আসল কি আসল না! দিল জারী হল কি হল না!! মজা লাগলো কি লাগলো না! এ সবের চিন্তায় থাকার প্রয়োজন নেই।

নফসানিয়ত ও রূহানিয়তের পার্থক্য

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. একদিন আশ্চর্যজনক একটি কথা বললেন : তিনি বললেন: 'নফসানিয়াত' ও 'রূহানিয়াত'-এর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আর এটা চিনা (এবং বুঝাও) মুশকিল যে, কোন্ জিনিসটি নফসানিয়াত আর কোন্ জিনিসটি রূহানিয়াত?

অতঃপর উভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝানোর জন্য আমাদেরকে একটি প্রশ্ন করলেন। এক ব্যক্তি অবসর জীবন যাপন করছে। তার ছেলে যুবক বয়সী, কামাই রোজগার করছে, খাচ্ছে, মেয়েদের বিবাহও দিয়ে দিয়েছে। এখন আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। পেনশন পাচ্ছে। খুব সুন্দরভাবে জীবন কাটছে। কোন চিন্তা নেই, কর্মব্যস্ততা নেই। তাঁর অভ্যাস হল আযানেরও পূর্বে

নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে উযু করে তাহিয়্যাতুল উযু আদায় করেন। আর আযান শোনার সাথে সাথেই মসজিদে চলে আসেন। এরপর নিশ্চিন্ত মনে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ছেন, সুন্নাত পড়ছেন। তারপর জামাআতের অপেক্ষায় বসে থাকছেন। এভাবে যখন নামাযের জামাআতের সময় হয়ে যায় তখন তিনি খুশূ-খুযূর সাথে, ধীর-স্থীরভাবে ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করেন, এ নামাযে তাঁর দারুণ মজা লাগে। আশ্চর্য নূরানিয়ত, আনন্দ ও সুকূন অনুভূত হয়। এই হল একটি অবস্থা।

ফেরীওয়ালার নামায

অপর দিকে আরেক ব্যক্তি যিনি (বিভিন্ন প্রকার জিনিষ) ফেরী করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আওয়াজ করে করে নিজ জিনিষ-পত্র বিক্রি করেন এবং নিজ স্ত্রী সন্তানের ভরণ পোষনের ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে হালাল রুজি উপার্জন করেন। কিন্তু যখনই আযানের আওয়াজ কানে আসে তখন তার নামাযের ফিকির শুরু হয়ে যায়। তিনি চান দ্রুত গ্রাহকদের বিদায় করে নামাযে শরীক হতে। তাই কখনো একে কোন জিনিষ দিচ্ছেন আবার কখনো অন্য আরেকজনকে কোন জিনিষ দিচ্ছেন। এমনকি নামাযের মুহূর্ত একদম নিকটবর্তী হয়ে যায়। তখন তিনি গ্রাহকদেরকে বলেন: আমি এখনই নামায পড়ে আসছি, এ কথা বলে তিনি তাড়াতাড়ি সামান এক পাশে রেখে তার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন এবং উর্ধ্বশ্বাসে মসজিদে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি উযু করে কাতারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন আর অনুভূতিশূন্য অবস্থায় 'আল্লাহু আকবার' বলে নিয়্যত বেঁধে নিচ্ছেন। নামাযে দাঁড়ানোর পর দিল তার একদিকে, দেমাগ আরেক দিকে। মনের মধ্যে নানা খেয়াল আসছে; কেউ আবার আমার ঐ জিনিষ-পত্র চুরি করবে না তো? গ্রাহক চলে যাবে না তো? ইত্যাদি। এভাবে সে নামাযও পড়ছে। জামাআত শেষে দ্রুততার সাথে সে সুন্নাত আদায় করে পুনরায় গিয়ে ঐ জিনিষ-পত্র সাজিয়ে দোকান লাগাচ্ছেন। এই হল আরেকটি অবস্থা।

কোনটার মধ্যে রূহানিয়াত বেশি?

এরপর হযরত রহ. জিজ্ঞেস করেন: আচ্ছা তোমরা বলতো, কার মধ্যে রূহানিয়াত বেশি? ঐ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামাযের মধ্যে রূহানিয়াত বেশি? নাকি সেই ফেরীওয়ালার নামাযে রূহানিয়াত বেশি? বাহ্যিকভাবে তো মনে হয় প্রথম ব্যক্তির নামাযে রূহানিয়াত বেশি আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নামাযে রূহানিয়াত কম। কিন্তু হযরত হলেন: আমি সত্য কথা বলছি: 'ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির নামাযে প্রথম ব্যক্তির নামায অপেক্ষা রূহানিয়াত অনেক অনেক বেশি!! আর এই প্রথম ব্যক্তির নামাযে যেসব কাইফিয়াত অর্জন হচ্ছে, বাস্তবিক পক্ষে এগুলো হল 'নফসানী কাইফিয়াত' যদিও এটা জায়েয ও প্রশংসনীয়, কিন্তু রূহানিয়াত তো কেবলমাত্র আমলের দ্বারা হাসিল হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। কিন্তু ফেরীওয়ালা ব্যক্তির মর্যাদা প্রথম ব্যক্তি থেকে বেশি হবে। কেননা তিনি তার ব্যস্ততা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন। চাই তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যই আসুন না কেন। কিন্তু আল্লাহপাকের হুকুম পালনের জন্য এসেছেন। এ জন্য তার নামাযে রূহানিয়াত বেশি।

দ্বিতীয় ব্যক্তির আমলে দৃঢ়তা আছে

যাইহোক! প্রথম ব্যক্তি নামাযে যে স্বাদ পাচ্ছিলেন সেটা হল প্রথম অর্থের 'হাল', এই 'হাল' উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তির আমলের মধ্যে দৃঢ়তা পাওয়া যায়। তার নিজ আমলের মধ্যে এত দৃঢ়তা হাসিল হয়ে গেছে যে, সে নিজের শত ব্যস্ততা ও কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও এসব কিছু ছেড়ে নামায আদায় করছে। এটাও 'হাল', তবে দ্বিতীয় অর্থে। এটা উদ্দেশ্য এবং এটার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এটা হাসিল করর চেষ্টা করুন, প্রথম জিনিসটা হাসিল হোক বা না হোক, সেটা উদ্দেশ্য নয়। এটা অর্জন হলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে। না হলেও কোন পরোয়া করবে না।

আমলের দ্বারা দৃঢ়তা হাসিল হয়

এখন এই দ্বিতীয় অবস্থা কীভাবে হাসিল হতে পারে? এ ব্যাপারে হযরত থানভী রহ. বলেন: এই দ্বিতীয় জিনিসটি অর্থাৎ 'দৃঢ়তা' মূলত: ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। কিন্তু যেহেতু এর উপকরণসমূহ ইচ্ছাধীন। সে হিসেবে

এটাও ইখতিয়ারী। এজন্য মানুষ যখন কোন আমল আরম্ভ করে এবং নিয়মিতভাবে সেটা করতে থাকে তখন ঐ আমলের মধ্যে তাঁর 'দৃঢ়তা' হাসিল হয়। যেমন, আমি উপরে নামাযের উদাহরণ দিয়েছি যে, নামায পড়তে পড়তে দৃঢ়তা হাসিল হয়ে যায়। অথবা মনে করুন: রোযা রাখা বড় মুশকিল ছিল, কিন্তু রোযা রাখতে রাখতে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন যদি আপনি কোন রোযাদারকে তাঁর রোযা ভাঙ্গতে বলেন তবে সে প্রস্তুত হবে না। কেননা এখন 'দৃঢ়তা ' পয়দা হয়ে গেছে।

আমল করা আরম্ভ করে দিন

এই দৃঢ়তা সৃষ্টি করার নিয়ম হল: আমল আরম্ভ করে দিন। চাই মন লাগুক বা না লাগুক। চাই সে আমলটা করার সময় অন্তর যেখানেই থাকুক না কেন। কিন্তু তারপরও লেগে থাকুন। এই চিন্তায় করবেন না যে, আমার দিল বা মস্তিষ্ক কোথায়? আরে ভাই! দিল ও দেমাগ যেখানে যেতে চায় যেতে দিন, কিন্তু আমল করতে থাকুন। আমল ছাড়বেন না। যেমন, নামাযের জন্য মসজিদে আসছেন, এমতাবস্থায় দিল একদিকে, মস্তিষ্ক আরেক দিকে! তারপরও মসজিদে আসুন, আসা বন্ধ করবেন না। এমনিভাবে যত নেক আমল আছে, সব আরম্ভ করে দিন। চাই সেটা করার সময় মনের উপর যত চাপই পড়ুক, চাই কোন স্বাদ-মজা বা জোশ্ না থাকুক, কিন্তু এ সব কিছু সত্ত্বেও এ আমলগুলো করবেন। করতে থাকবেন। দেখবেন: কয়েকদিন পরেই এসব আমলে দৃঢ়তা পয়দা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থের 'হাল' সৃষ্টি হয়েছে। সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় যার অপর নাম হল 'মাকাম'।

আর যখন কোন ব্যক্তির কোন আমলের মধ্যে 'দৃঢ়তা' হাসিল হয়ে যায়, তখন এ কথা বলা যায় যে, এ ব্যক্তির এ আমলে 'মাকাম' হাসিল হয়ে গেছে। যে, অমুকের 'সবর' বা 'তাওয়াক্কুল' অথবা 'শোকর'-এর মাকাম হাসিল হয়ে গেছে। যেমন: কোন ভাল ব্যাপার সামনে আসার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলেন এবং বার বার এমনটি করতে থাকলেন। এমনকি শোকরের মধ্যে তার দৃঢ়তা পয়দা হয়ে গেল এবং শোকর করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল।

এ মালফূযে একটি কথা তো হযরত থানভী রহ. এটা বলেছেন, (যে আলোচনা করা হলো।)

আল্লাহ তাআলার মহব্বত গাইরে ইখতিয়ারী হওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেন?

দ্বিতীয় মালফূযে হযরত থানভী রহ্. একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, প্রশ্ন হল, আপনি তো এ নীতিমালা বয়ান করেছেন যে, ইখতিয়ারী বিষয়ে মানুষ আদিষ্ট, আর গাইরে ইখতিয়ারী বিষয়ের ব্যাপারে মানুষ আদিষ্ট নয়। এখন দিলের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত পয়দা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতও অন্তরে সৃষ্টি করার আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তানাদি এবং সমস্ত মানুষ থেকে বেশি প্রিয় না হব।' (সহীহ বুখারী-কিতাবুল ঈমান)

এখন প্রশ্ন হল, যখন মহব্বত গাইরে ইখতিয়ারী বিষয়: তখন সেটাকে জোরপূর্বক নিজের অন্তরে কীভাবে সৃষ্টি করবে?

যৌক্তিক মহব্বতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সহজাত মহব্বতের নয়

এর উত্তরে হযরত থানভী রহ. বলেন: যে 'মহব্বত' এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটা সহজাত মহব্বত নয় বরং যৌক্তিক মহব্বত। অর্থাৎ, যখন সে তার বিবেক দ্বারা চিন্তা করবে যে, এ বিশ্বজগতে সবচেয়ে বেশি মহব্বতের উপযুক্ত কে হতে পারেন? তখন তার আকল ও বিবেক তাকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে, এ জগতে সবচেয়ে বেশি মহব্বত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হওয়া উচিৎ। যদিও দিলের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে পিতা-মাতা ও সন্তানাদির জন্য যে রকম মহব্বত উথলে

উঠে; আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তেমনটি অনুভূত হয় না।

কারো এমন অবস্থা হলে সে যেন নিজেকে কাফের মনে করে না বসে। বরং সে চিন্তা করবে যে, আলহামদু লিল্লাহ! আমার আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যৌক্তিক মহব্বত আছে। যদিও স্বভাবগত মহব্বত ঐ পরিমাণ নেই।

জনৈক সাহাবীর রাযি. ঘটনা

বর্ণিত আছে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত হাদীসটি শুনালেন :

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা (মাতা) তার সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে বেশি প্রিয় না হব'। (সহীহ বুখারী)

তখন একজন সাহাবী আরয করলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সকল জিনিস অপেক্ষা বেশি মহব্বত করি তবে আমার সন্দেহ হয় সম্ভবত: আমি আপনাকে আমার জান থেকে বেশি মহব্বত করি না। এ জন্য আমি মুমিন আছি কি নেই?' এটা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ হাদীসটিই দ্বিতীয়বার ইরশাদ করলেন এবং ঐ সাহাবীর রাযি. বুকে হাত মারলেন। তখন সেই সাহাবী বললেন- اَلْآنَ اَلْآنَ এখন এখন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন হয়েছে।

'এখন' কথাটার ব্যাখ্যা

উলামায়ে কেরাম এ সাহাবীর রাযি. উল্লেখিত কথাটার বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণত: যে ব্যাখ্যাটি করা হয় সেটা হল: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে হাত মারার পূর্বে ঐ মহব্বত হাসিল ছিল না কিন্তু হাত মারার পর সেই মহব্বত হাসিল হয়ে গেছে। এ জন্য তিনি বলেছেন : 'এখন' আমার ঐ মহব্বত হাসিল হয়ে গেছে।

উত্তম ব্যাখ্যা

কিন্তু আমাদের হযরত থানভী রহ.-এর একটি আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা এই যে, এমন নয় যে, হাত মারার পূর্বে ঐ সাহাবী রাযি. কাফের ছিলেন নাউযুবিল্লাহ! আর হাত মারার পরে মুসলমান হয়ে গেছেন, বা হাত মারার পূর্বে মহব্বতের দরজা হাসিল ছিল না এখন হাসিল হয়েছে, অথবা আগে মুমিন ছিলেন না এখন মুমিন হয়েছেন। ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। বরং আসল কথা হল: এ হাদীসে পাকের দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হল এ কথা বুঝানো যে, একজন ঈমানদারে যৌক্তিক মহব্বত থাকা ওয়াজিব। আর ঈমানতো সেই যুক্তিগত মহব্বতের উপরই নির্ভরশীল। প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য এটা বয়ান করা ছিল না যে, সহজাত মহব্বতের উপর ঈমান নির্ভরশীল। আর ঐ সাহাবীর রাযি. মনে যে প্রশ্ন জেগেছে সেটার কারণ হল, তিনি মহব্বত বলতে সহজাত মহব্বতকে বুঝেছেন, অথচ তাঁর সে পরিমাণ সহজাত মহব্বত হাসিল ছিল না।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে হাত মেরে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার হাদীসের সহীহ মর্ম বুঝতে পারনি, কেননা আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমার প্রতি সহজাত মহব্বত সব জিনিসের থেকে বেশি হতে হবে। বরং আমার উদ্দেশ্য হল: যৌক্তিক মহব্বত বেশি হওয়া উচিৎ। এর উত্তরে ঐ সাহাবী রাযি. বলেছেন : اَلْآنَ অর্থাৎ, এখন আমার কথা বুঝে এসেছে যে, কোন ধরনের মহব্বত কাম্য। সুতরাং اَلْآنَ -এর মর্ম এমন নয় যে, মহব্বতের এ পর্যায় পূর্বে অর্জিত ছিল না, এখন অর্জিত হয়েছে। কেননা এ ক্ষেত্রে এটাও মানতে হবে যে, ইতোপূর্বে ঐ সাহাবী রাযি. মুসলমান ছিলেন না। এখন মুসলমান হয়েছেন!! এটা তো সাংঘাতিক কথা! এ জন্য হযরত থানভী রহ. বলেন: اَلْآنَ -এর অর্থ হচ্ছে: এখন আমি হাদীসের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ, 'মহব্বত' দ্বারা সহজাত মহব্বত উদ্দেশ্য নয় বরং যৌক্তিক মহব্বত উদ্দেশ্য।

যৌক্তিক মহব্বত মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত

যৌক্তিক মহব্বত মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে সহজাত মহব্বত মানুষের ইখতিয়ার বর্হিভূত বিষয়। এ জন্য এই সহজাত মহব্বত এর নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং ঈমান এর উপর নির্ভরশীলও নয়। বরং যৌক্তিক মহব্বতের নির্দেশই দেয়া হয়েছে।

মহব্বত অর্জন করার সহজ পথ

হযরত থানভী রহ. 'নাশরুত ত্বীব' গ্রন্থে-এর পথ বাতলে দিয়েছেন। সেটা এই যে, মানুষ প্রথমে দেখবে এ জগতে একে অপরকে মহব্বত করার কী কী কারণ আছে? যেমন মহব্বতের কারণ হয়ত 'সম্পদ' হয়, অথবা 'সৌন্দর্য' কিংবা 'গুণ' বা 'অনুগ্রহ'। মানুষ কাউকে হয়তো সৌন্দর্যের কারণে মহব্বত করে, অথবা তার মধ্যে ইলম বা আমলের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কাউকে মানুষ এজন্যও মহব্বত করে যে, সে অত্যন্ত দানশীল। এসকল বিষয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, যেমনটি জগতে অন্য কারো মধ্যে নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৌন্দর্য বলেন কিংবা গুণ, তাঁর দান বলেন বা অনুগ্রহ এতো উচ্চ মাত্রায় ছিলো যে, যখন মানুষ এসব ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবে তখন অবশ্যই তাঁর সাথে যৌক্তিক মহব্বত সৃষ্টি হবে। চাই সহজাত মহব্বত ঐ পর্যায়ের সৃষ্টি না হোক। অথবা হলেও অনুভূত না হোক।

ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের পিছনে পড়বেন না

যাইহোক! এ মালফূযটির সারকথা এটাই যে, ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের পিছনে পড়বেন না। আর ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করবেন না। নেক আমলের সময় এলে সেটা বর্জন করবেন না, আমলের মধ্যে লেগে থাকবেন। সারা জীবনও যদি কোন 'হাল' বা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমলে লেগে থাকবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত 'দৃঢ়তা' অর্জন না হয়। এই দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বই কাম্য।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বত্রিশতম মজলিস

নিস্‌বত হাসিল করার পদ্ধতি

নিস্‌বত হাসিল করার পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ -أَمَّا بَعْدُ

নিস্‌বত অর্জনের পদ্ধতি ও বাস্তবতা

হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন:

'নিস্‌বত অর্জনের পদ্ধতি ও বাস্তবতা হল, এই যে, প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক জাহেরী ও বাতেনী আমলসমূহ সংশোধন করবে। যখন জাহেরী ও বাতেনী আমলসমূহের উপর একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত সার্বক্ষণিকতা বজায় রাখবে, তখন ধীরে ধীরে এসব আমল সহজ হতে থাকবে, এবং একটি বদ্ধমূল (স্থায়ী) কাইফিয়াত সৃষ্টি হবে। এটাকে সহজ করার জন্য যাবতীয় মুরাকাবা, রিয়াযত, মুজাহাদা, যিকির ও শোগলের ব্যবস্থা হয়েছে। নতুবা আসল জিনিস হল জাহেরী ও বাতেনী আমলসমূহের সংশোধন। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত নিসবত হাসিল হয়।

যখন বান্দা জাহেরী ও বাতেনী নেক আমলসমূহ লাগাতার করতে থাকে, তখন তার সাথে আল্লাহ তা'আলার সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এটাই 'আল্লাহর সাথে নিসবত'-এর হাকীকত। পক্ষান্তরে সার্বক্ষণিক স্মরণ, স্থায়ী উপস্থিতি যাকে 'মালাকায়ে ইয়াদদাশ্‌ত' বলে: এগুলো নিসবতের হাকীকত নয়। অবশ্য নিসবত হাসিল হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সহযোগী। কেননা যে ব্যক্তির সব সময় আল্লাহ তা'আলার ধ্যান থাকে, তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী

হওয়া দুষ্কর। এটাই নিসবতের হাকীকত।

বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সন্তুষ্টির সম্পর্ক হয়ে যাওয়া, যার বৈশিষ্ট্য হল, বিশেষ ধরনের আকর্ষণ অনুভূত হওয়া। যার অনিবার্য ফলাফল এই হয় যে, আনুগত্য সহজ হয়ে যায় এবং সার্বক্ষণিক উপস্থিতির ধ্যান থাকে। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস। কেননা কোন নেক আমলের মধ্যে এমন যোগ্যতা নেই যে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। যদিও আল্লাহ তা'আলার অভ্যাস হল : তিনি শুধুই নিজ অনুগ্রহে নেক আমলের উপর স্বীয় সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। যেমনটি হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: 'কোন ব্যক্তি নিজ আমলের দ্বারা জান্নাতে যেতে পারবে না বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দ্বারা যেতে পারবে।'

আল্লাহ তা'আলার সাথে এই নিসবত সাধারণত: কখনো অপসৃত হয় না। যেমন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বয়:প্রাপ্তির গুণ কখনো অপসৃত হয় না।

এ মাসআলাটাকেই সূফীয়ায়ে কেরাম 'ফানা' শব্দে ব্যক্ত করে এভাবে বলেন: اَلْفَانِىْ لَا يُرَدُّ অর্থাৎ ,ফানাহোনেওয়ালা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা ব্যক্তি কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না।

যদি কারো মনে এমন সন্দেহ হয় যে, নিসবত হাসিল হওয়ার পরও তো দেখি অনেক সময় গোনাহ হয়ে যায়। তাহলে সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি আর কোথায় থাকল?

তাহলে বুঝে নিন! গভীর বন্ধুত্বের পরে এটা জরুরী নয় যে, কখনো পরস্পরে মনোমালিন্যও হবে না!! বরং কখনো কখনো মনোমালিন্য হতেও পারে। কিন্তু আপসরফার পরে সেই পূর্বের সম্পর্কঃ হয়ে যায়। বরং বাস্তবিক পক্ষে এই অসন্তুষ্টির সময়েও বন্ধুত্বমূলক মূল সর্ম্পক যথারীতি বহাল থাকে, সেটা

দূরীভূত হয় না। মনোমালিন্য হলে সেটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

যেমন কারো পূর্ণ সুস্থতা লাভ হওয়ার পর এটা জরুরী নয় যে, এ অবস্থায় কখনো সর্দি হবে না। কেননা কখনো যদি সে সংযমহীন হয়ে পড়ে যেমন 'গুড়' খেলে কোন ক্ষতি হবে না ঠিক, কিন্তু সংযমহীনতার দরূন ক্ষতি অবশ্যই হবে। অবশ্য শুধুমাত্র সাময়িক চিকিৎসার পরে পুনরায় সুস্থতার সেই প্রবল হালত ফিরে আসবে। অথবা মনে করুন: দরসিয়াত (শ্রেণী ভিত্তিক পড়াশোনা–অনুবাদক) থেকে ফারেগ হওয়ার পরে এটা জরুরী নয় যে, কখনো কোন স্থানে আটকাবেই না! বরং ফারেগ হওয়ার পরও কদাচিৎ আটকে যেতে পারে। কিন্তু সামান্য মনোযোগের দ্বারাই আবার সামনে চলতে পারবে।'

(আনফাসে ঈসা পৃ: ১৭)

এটা হযরত থানভী রহ. এর একটি দীর্ঘ মালফূয। এবং পুরো তাসাওউফ ও তরীকতের যেটা আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে 'নিসবত হাসিল হওয়া' এ মালফূযে হযরত থানভী রহ. সেই 'নিসবত' এর মর্ম ও হাকীকত এবং সেটা অর্জন করার পদ্ধতি বয়ান করেছেন।

আপনারা নিশ্চয়ই এ জাতীয় কথাবার্তা শুনে থাকবেন। অমুক ব্যক্তি 'সাহেবে নিসবত' বুযুর্গ, অথবা বড় 'সাহেবে নিসবত' আল্লাহর ওলী। অমুকের 'নিসবত' হাসিল হয়ে গেছে, অথবা যেমনটি আপনি সূফীয়ায়ে কেরামের আলোচনায় শুনে থাকবেন যে, এক বুযুর্গের যখন অপর বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত হল, তখন একে অপরের 'নিসবত' বুঝার চেষ্টা করলেন যে, তাঁর 'নিসবত' কোন্ পর্যায়ের? ইত্যাদি।

'নিস্‌বত' হাসিল হওয়ার মর্ম

হযরত থানভী রহ. এই 'নিসবত'-এর হাকীকত বয়ান করছেন। বাস্তবিকপক্ষে 'নিসবত' হাসিল হওয়ার অর্থ হল: আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যপূর্ণ কাজগুলো কবূল করছেন।

এবং সমষ্টিগতভাবে তিনি এই বান্দার আমলসমূহকে পসন্দ করেন। যখন এই কাইফিয়াত হাসিল হবে, তখন বলা যাবে যে, তাঁর 'আল্লাহর সাথে নিসবত' হাসিল হয়ে গেছে।

'নিসবত' হাসিল হওয়ার দু'টি আলামত

কিন্তু এটা কীভাবে বুঝা যাবে যে, অমুক বান্দার 'নিসবত' হাসিল হয়ে গেছে? বা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট? নিসবত হাসিল হওয়া এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়ার দু'টি আলামত। একটি হল: 'অধিক পরিমাণে যিকির'। অপরটি হল 'সার্বক্ষণিক আনুগত্য'। সার্বক্ষণিক আনুগত্যের অর্থ হল: শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত যে সব ফরয-ওয়াজিব আছে, সেগুলোকে পাবন্দীর সাথে সময় মত আঞ্জাম দেয়া হবে। আর যেসব বিষয়ে শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা আছে, সর্বাবস্থায় সেগুলো থেকে বিরত থাকা। জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকারের গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। এই হল 'নিসবত'-এর একটি আলামত। আর দ্বিতীয় জিনিস হল 'বেশি বেশি যিকির করা।' 'বেশি বেশি যিকির' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: তাঁর যবান ও তাঁর দিল অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ থাকে। তাঁর মনের মধ্যে সব সময় আল্লাহর কথা স্মরণ। তাঁর চিন্তাই হল আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। তাঁর যবানে কখনো শোকর-এর কালিমা, আবার কখনো সবর-এর কালিমা। কখনো ইসতিগফার আবার কখনো ইসতি'আযা। মোটকথা! সব সময় কোন বাহানায় আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক জুড়ে আছে। যখনই দেখবে হয়ত সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ প্রার্থনা করছে। অথবা চলতে ফিরতে তাঁর অন্তর আল্লাহর প্রতিই নিবদ্ধ। আর তাঁর মনের অবস্থা হল دل بیار دست بکار অর্থাৎ, 'দিল বন্ধুর সাথে, আর হাত কাজের সাথে'।

লোকেরা মনে করছে ইনি দুনিয়ার কাজে লেগে আছেন, অথচ তাঁর অন্তর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে লেগে আছে। এটা উচ্চ পর্যায়ের কাইফিয়াত।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এ কাইফিয়াত নসীব করুন। আমীন।

সার্বক্ষণিক ধ্যানের এ 'কাইফিয়াত'কেই সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় 'মালাকায়ে ইয়াদদাশত'ও বলা হয়। যেহেতু মনের মধ্যে সব সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর ধ্যান জমে থাকে।

এই দিল একই সত্ত্বার জ্যোতির স্থল

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন : আল্লাহ্ তাআলা এই দিল নিজের জন্য বানিয়েছেন। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমরা দুনিয়ার কাজে লাগাও। কিন্তু এই দিলতো শুধু একই সত্ত্বার জ্যোতিস্থল। কেবলমাত্র ঐ মহান সত্ত্বাকেই এই দিলে স্থান দিতে হবে। অন্য কাউকে এখানে স্থান দেয়া যাবে না। এ জন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا لَاتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا

অর্থাৎ 'যদি আমি দুনিয়াতে সঠিক অর্থে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, তবে আবু বকর রাযি. কেই বানাতাম।'

কিন্তু যেহেতু দুনিয়াতে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতে নেই, অর্থাৎ, এমন 'বন্ধু' যে অন্যান্যদের কথা ভুলিয়ে দেয়, সব সময় মনের মধ্যে যার খেয়াল জমে থাকে। এমন বন্ধু আমি দুনিয়াতে কাউকেই বানাতে চাই না। এমন বন্ধু তো শুধু সেই একই সত্ত্বা (আল্লাহ্ তা'আলা) যিনি আমার দিলে সব সময় আছেন। বুঝা গেল যে, এই 'দিল' একমাত্র তাঁরই জন্য। এই দিল তাঁরই 'তাজাল্লীগাহ'। এতে তিনি অন্য কাউকে বরদাশত করতে পারেন না।

আপনি দুনিয়ার জীবনে মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখুন। দুনিয়াবী প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করুন। নিজে বৈধ সীমারেখার মধ্যে থেকে নিজ কামনা-বাসনা পূর্ণ করুন। কিন্তু এই দিলের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ব্যতীত অন্য কাউকে স্থান দিবেন না।

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এ দৌলত দান করুন। আমীন।

সুন্দর দু'আ সুন্দর কবিতা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِيْ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আপনি আপনার মহব্বতকে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু বানিয়ে দিন এবং আপনার ভয়কে আমার নিকট সবচেয়ে ভয়ংকর বস্তু বানিয়ে দিন।'

আমি নিজেই কোন এক সময় কবিতা লিখেছিলাম:

آ سی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کے
قسمت سے اس گھر پہ دل اس دلربا کا ہے

অর্থাৎ, এই দিলে তো তাঁর দিল এসে গেছে। এ জন্য এটা কে খুব সামলে চল। এটা এদিক-সেদিকে নিক্ষেপ করার জিনিস নয়।

এটা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আলামত

যাইহোক! যদি 'যিকিরের আধিক্য' অর্জিত হয়ে যায়, যার নাম 'মালাকায়ে ইয়াদদাশত' তবে এটা 'নিসবত' হাসিল হওয়ার একটি আলামত। আর যখন এ দু'টি জিনিস অর্থাৎ, সার্বক্ষণিক আনুগত্য ও যিকিরের আধিক্য হাসিল হবে, তখন বুঝতে হবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল হয়ে গেছে। আর যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল হয়ে গেছে তখন আর কী চাই? কেননা এ জগতে এটাই সবচেয়ে বড় মাকসূদ এবং সবচেয়ে বড় পুরস্কার যে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। এই হল 'নিসবত' হাসিল হওয়ার হাকীকত। যেটাকে সংক্ষেপে এভাবে বুঝা যেতে পারে যে, 'নিসবত' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। যার লক্ষণ হল সার্বক্ষণিক আনুগত্য।

'নিসবত' অর্জন করার পদ্ধতি

এই 'নিসবত' হাসিল করার পদ্ধতি হল: সমস্ত নেক আমল, যার মধ্যে বাহ্যিক নেক আমলসমূহও অন্তর্ভূক্ত যেমন : নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত

ইত্যাদি। এবং অভ্যন্তরীণ নেক আমলসমূহও অন্তর্ভূক্ত। যেমন : কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য, তাওয়াক্কুল, বিনয় ইত্যাদি। এ সমস্ত আমল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে কষ্টের সাথে করতে থাকবে। অর্থাৎ, এগুলো আঞ্জাম দিতে যদিও কষ্ট হচ্ছে, মনে চাচ্ছে না; কিন্তু তারপরও মনের চাহিদাকে দমন করে দিলের উপর চাপ দিয়ে এ আমলগুলো করতে থাকবে। এভাবে আমল করতে থাকলে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল অবস্থা সৃষ্টি হবে। আর ঐ বদ্ধমূল অবস্থার উপর সার্বক্ষণিক স্মরণের দৌলত নসীব হয়। অতঃপর এই সার্বক্ষণিক স্মরণের উপরই 'নিসবত' লাভ হয়ে থাকে।

এ পথের সোনালী নীতিমালা

এ জন্য 'নিসবত' অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম কাজ হল মানুষ জোর করে হলেও নেক আমল করতে থাকবে। আর এ পথের সোনালী নীতিমালা হল: যে নেক কাজে অলসতা অনুভূত হয় ঐ নেক কাজটাই আঞ্জাম দিবেন। আর যে গোনাহ থেকে বাঁচতে অলসতা লাগে সে গোনাহ থেকে জোর জবরদস্তীর সাথে বেঁচে থাকার ইহতিমাম করুন। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন: এ গোনাহ আর করব না, চাই দিলের উপর করাত চলুক।

ব্যাস! যেদিন এ কাজ শুরু করবে, ঐ দিন থেকেই সফলতার পথে চলা শুরু হবে।

নফস ও শয়তান দুর্বল

মনে রাখবেন! বাহ্যিকভাবে শয়তানের চক্রান্তকে খুব শক্তিশালী মনে হয়। কিন্তু কুরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

অর্থাৎ, 'নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল'।(সূরা নিসা:৭৬)

অনুরূপভাবে নফসের চক্রান্তও দুর্বল। দুর্বল হওয়ার মর্ম হল: যে ব্যক্তি এই নফস ও শয়তানের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তাঁর সামনে নফস ও শয়তান গলে যাবে।

এই নফস ও শয়তান দুর্বলদের উপর বাঘ। যে ব্যক্তি এদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে, তার উপর এরা আরোহন করে আর বলে: এই তো আমার শিকার। এরপর তাকে পদচ্যুত করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের সামনে বুক চিতিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে যে, আমি নফস ও শয়তানের কথা মানব না! তাঁর সামনে নফস ও শয়তান কাবু হয়ে যায়।

যাইহোক! আসল কাজ হল এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলে কিছু মেহনত ও কষ্ট অবশ্য হবে। কিন্তু একবার আল্লাহ তা'আলার খাতিরে প্রতিরোধ করে দেখুন। নিজ কামনা বাসনাগুলো নিষ্পেষিত করে দেখুন। বাসনাগুলো নিষ্পেষিত করতে গিয়ে আপনার যে কষ্ট হবে সেই কষ্টই আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির উপলক্ষ হবে। আর এ মুজাহাদা আপনাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিবে।

'নফস' হল দুগ্ধপানকারী শিশুর ন্যায়

আল্লামা বূসীরী রহ. 'কাসীদায়ে বুরদাহ' গ্রন্থে নফসের কত সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন!! তিনি বলেন :

اَلنَّفْسُ كَا لطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى

حُبِّ الرَّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

অর্থাৎ, নফস হল দুগ্ধপানকারী শিশুর ন্যায়, যদি তুমি তাকে সুযোগ দাও তবে দুগ্ধ পানের মহব্বতের উপর সে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি তাকে ছাড়িয়ে দাও তবে সে ছেড়ে দিবে।

যেমনিভাবে পিতা-মাতা বাচ্চাকে দুধ ছাড়িয়ে দিতে চাইলে সে কান্নাকাটি করে, চিৎকার করে, তার কষ্ট হয়। মা তার দুধ ছাড়ানোর জন্য স্তনের বোঁটায় নিম ইত্যাদি তিক্ত জিনিস লাগিয়ে নেন, যাতে বাচ্চার সেটার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এখন যদি পিতা-মাতা তার চিৎকার ও চেঁচামেচির দরুন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন আর ভাবতে থাকেন যে, বাচ্চাটি খুব কান্নাকাটি করছে, নিজেও ঘুমায়না আমাদেরকেও ঘুমাতে দেয় না!! সুতরাং একে দুধ ছাড়ানোর প্রয়োজন নেই! একে দুধ পান করতে দাও!! তবে

এভাবে ঐ শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে তবুও দুগ্ধপান করা পরিত্যাগ করবে না। কিন্তু যদি পিতা-মাতা পাক্কা সংকল্প করেন যে, একে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে চাই সে চিৎকার করুক, কান্নাকাটি করুক অথবা অন্য যা কিছু করুক। আমরা আর তাকে বুকের দুধ খাওয়াব না। তিন দিন এভাবে দুধ না দিলে চতুর্থ দিন তার দুধের নেশা ছুটে যাবে।

নফসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

মানুষের নফসের ব্যাপারটিও অনুরূপ। যদি আপনি তাকে তার কামনা-বাসনা পূর্ণ করার ব্যাপারে ছাড় দিতে থাকেন, তবে সে আপনাকে তার চক্করে লিপ্ত রাখবে। কিন্তু যেদিন আপনি তার বিরুদ্ধে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যাবেন যে, আমাকে ওর কামনাগুলো ছুটাতেই হবে। সে দিন সে এসব ছেড়েই দিবে। আর যখন নফস কুপ্রবৃত্তিসমূহ পিষে ফেলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং এর দ্বারা মনের মধ্যে ব্যথা অনুভুত হবে, তখন না জানি এই ব্যথা আপনাকে কোন্ স্তরে পৌঁছে দিবে? কিন্তু একবার ওর বিরুদ্ধে মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সুতরাং, এসব মুজাহাদা ও মুরাকাবার উদ্দেশ্য হল: মানুষ যেন স্বীয় নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর যখনই মানুষ নিজ অসৎ কামনা-বাসনার উপর আঘাত হানে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৈকট্যের মাকাম দান করতে থাকেন।

মনের কুপ্রবৃত্তিগুলো তাকওয়ার জন্য জ্বালানি স্বরূপ

মাওলানা রূমী রহ. বলেন :

شہوت دنیا مثال گلخن است

کہ ازو حمام تقوی روشن است

অর্থাৎ, দুনিয়ার এ প্রবৃত্তিগুলো জ্বালানি সদৃশ। এ জন্য দিলের মধ্যে যে প্রবৃত্তিগুলো দানা বাঁধে সেগুলোকে বেকার মনে করবে না, খারাপ মনে করবে না। এগুলো বড় কাজের জিনিস। কেননা এগুলোই 'তাকওয়ার' জ্বালানি

স্বরূপ, যতই এগুলোকে প্রজ্বলিত করবে ততই তাকওয়ার হাম্মাম আলোকিত হবে। আপনার দিলে তাকওয়ার রৌশনী সৃষ্টি হবে। এজন্য এ প্রবৃত্তিগুলোকে অনর্থক মনে করবে না। বরং অন্তরে যে প্রবৃত্তিগুলো আন্দোলিত হচ্ছে সেগুলোর দ্বারা আমি এই কাজ করব সেই কাজ করব। কুদৃষ্টি, পরনিন্দা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে আপনি বেকার ভাববেন না।

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں

অর্থাৎ, নয়তো বেকার কোন জিনিস কোন যমানায়, নয়তো খারাপ কোন কিছুই কুদরতের কারখানায়।

এগুলোকেও আল্লাহ তা'আলা নিজ হেকমত ও বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেটা এই যে, এগুলোকে প্রজ্বলিত করুন। এগুলোকে প্রজ্বলিত করলে আপনার দিলে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। এ কামনা-বাসনাগুলো দমন করতে গিয়ে যদি দিলের উপর চোট লাগে তবে লাগতে দিন। কষ্ট ও ব্যথা হয় তবে হতে দিন।

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئنہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অর্থাৎ, যতই এই দিল ভাংবে ততই বানানেওয়ালার দৃষ্টিতে সেটা প্রিয় হবে। এ কাজ করে দেখুন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা এমন মধুরতা দান করবেন যেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এবং যার সামনে গোনাহের মজা ও স্বাদ কিছুই নয়।

'নিসবত' হাসিল হওয়ার পরে নষ্ট হয় না

যাইহোক! কষ্ট কাজে হলেও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেক আমলসমূহ আ াম দিতে থাকলে সেই আমল মানুষকে 'যিকিরের আধিক্য' ও 'সার্বক্ষণিক আনুগত্যের' দিকে নিয়ে যায়। আর এ দু'টি জিনিস 'আল্লাহর সাথে নিসবত' হাসিল হওয়ার আলামত।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এই 'নিসবত' আমাদের সকলকে দান করুন। আমীন।

যখন এই 'নিসবত' একবার হাসিল হয়ে যায় তখন আর দূরীভূত হয় না। অবশ্য অনেক সময় কিছু ধুলি, কিছু বালু মাঝে এসে পড়ে। যেমন: কিছু ভুল হয়ে গেল, কোন গোনাহ্ হয়ে গেল। তখন সাময়িক ক্লেশ ও যাতনা হয় বটে, কিন্তু কিছু দিন পর তাওবা-ইসতিগফার-এর বদৌলতে এই ক্লেশ-যাতনাও খতম হয়ে যায়। দেখুন! কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর যত বড় ওলীই হন না কেন, তিনি নিষ্পাপ নন। তাঁর দ্বারাও কোন ভুল সংঘটিত হতে পারে। সেই ভুল সংঘটিত হওয়ার দরূন অন্তরে সাময়িক ক্লেদাক্ততা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাওবা-ইসতিগফার করে নেয়, তখন সেই ক্লেদ সাফ হয়ে যায়।

মোটকথা! এ বাণীতে হযরত থানভী রহ. 'নিস্‌বত' এর হাকীকত, নিসবতের আলামত এবং নিসবত হাসিল করার পদ্ধতি ও ফলাফল বর্ণনা করেছেন।

'নিস্‌বত' লাভ হওয়ার জন্য পূর্ণ সন্তুষ্টি শর্ত

হযরত থানভী রহ. বলেন: 'নিস্‌বত' লাভ হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি পূর্বশর্ত। আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ সন্তুষ্টি যথেষ্ট নয়। কেননা যে কোন নেক কাজ করলেই তো আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন। কাজেই যদি কেউ ব্যভিচার করে এবং অতঃপর নামাযও পড়ে তবে ব্যভিচার এর দরূন অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাবে। কিন্তু নামায পড়ার দরূন সন্তুষ্টিও প্রকাশ পাবে। খারাপ ও ভাল কাজসমূহের উপর স্বস্ব স্থানে যথারীতি অসন্তুষ্টি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু 'নিস্‌বত' প্রাপ্তির জন্য পূর্ণ সন্তুষ্টি শর্ত। (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৮)

অর্থাৎ, এমনটি হলে চলবে না যে, কিছু গোনাহ্ করলাম! আর কিছু গোনাহ ছাড়লাম!! কিছু ওয়াজিব আমল আঞ্জাম দিলাম! আর কিছু পরিত্যাগ করলাম!! এর উপর 'নিসবত' হাসিল হয় না। যদিও নেক আমলের দরূন

আল্লাহ পাক অবশ্যই সন্তুষ্ট হন কিন্তু এর পাশাপাশি যেহেতু সে গোনাহের কাজও করছে; এজন্য আল্লাহ পাকের পূর্ণ সন্তুষ্টি তার অর্জিত হবে না। আর যখন পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জিত হয়নি, তখন এর উপর 'নিস্‌বত' প্রাপ্তিও নসীব হবে না। কেননা 'নিস্‌বত' প্রাপ্তির জন্য পূর্ণ সন্তুষ্টি শর্ত।

অসম্পূর্ণ সন্তুষ্টির উদাহরণ

> হযরত থানভী রহ.-এরপর বলেন: 'অসম্পূর্ণ সন্তুষ্টির উদাহরণ ঠিক এরূপ : যেমন অসুস্থাবস্থায় সাময়িক সুস্থতা লাভ হল। এটাও ক্ষেত্র বিশেষে গনীমত হয়ে থাকে।'
>
> (আনফাসে ঈসা পৃ: ১৮)

অসুস্থাবস্থায় সাময়িকভাবে কিছুটা সুস্থতা লাভ হলে সেই সুস্থতাও অসুস্থতা অপেক্ষা ভাল। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অনবরত গোনাহ করে চলেছে, কোন নেকীর কাজই সে করে না, তার তুলনায় ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভাল যে গোনাহও করে নেকীর কাজও করে।

این ہم کن آں ہم کن تا غلبہ کرا باشد

এটা কর আর ওটা কর, দেখার বিষয় হল প্রাধান্য কার?

এজন্য আসল ব্যাপার হল : সব ধরনের গোনাহ থেকে বিরত থাকা। যে কোন কাজ করবে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে। এটাই হল পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টি। এটা ছাড়া 'নিস্‌বত' অর্জন হয় না।

নেক আমলে লেগে থাকুন

যাইহোক! এসব তো হল তরীকতের পরিভাষামূলক শব্দ। এগুলো শুধু জানলেই চলবে না।

এ জন্যই আমাদের শায়খ হযরত আরেফী রহ. বলতেন: 'মিঞা! সুলূকের পরিভাষা সমূহের পিছনে পড়োনা। সাদাসিধাভাবে কাজ করতে থাক'। যার সারকথা হল: নেক আমলে লেগে থাকুন। জাহেরী ও বাতেনী তথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে থাকুন।

গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহ পাকের আনুগত্য করতে থাকুন। এভাবেই কাজে লেগে থাকুন। অলসতা অনুভূত হলে মোকাবেলা করুন। কষ্ট হলে সহ্য করুন। যখন এভাবে কাজ করতে থাকবেন তখন ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে মন্‌যিল পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। এবং আল্লাহর সাথে 'নিস্‌বত' হাসিল হবে।

ফলাফলের চিন্তায় পড়বেন না

পরিণাম ও ফলাফলের চিন্তায় বেশি পরবেন না যে, সব সময় শুধু চিন্তা করতে থাকলেন: এখন আমি কোথায় পৌঁছলাম? বরং কাজ করতে থাকুন। এক পর্যায়ে আপনা আপনি কাংখিত লক্ষ্য হাসিল হবে। চাই আপনি বুঝতে পারুন বা না পারুন যে, 'নিসবত' হাসিল হয়েছে কি না? আরে আম খাওয়া উদ্দেশ্য নাকি বৃক্ষ গণনা করা? যদি আপনার বুঝে নাও আসে যে, নিসবত হাসিল হয়েছে কি না? কিন্তু সেটা হাসিল হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ।

শিশু কীভাবে বালেগ হয়ে যায়?

আমাদের শায়খ আরেফী হযরত রহ. উদাহরণ দিয়ে বলতেন : দেখো! শিশু দৈনিক বড় হচ্ছে। এখন যদি কেউ নিজ শিশু কে দৈনিক স্কেল দিয়ে মাপে যে, দেখি আজ কতটুকু বড় হল? কালকে কতটুকু বড় হল? এর ফলাফল এটাই হবে যে, ঐ ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়বে আর বলবে: আমার সন্তান তো বড়ই হচ্ছে না। কেননা শিশুর বৃদ্ধির বিষয়টি এমনই অনুভবহীন ও এতই ধীরগতিসম্পন্ন যে, সেটা স্কেলে আসেই না। কিন্তু তাই বলে কেউ একথা বলে না যে, শিশু বড় হচ্ছে না। দৈনিক সে বড় হচ্ছে। যদিও তার বৃদ্ধির গতি কম। কিন্তু সে বাড়ছে। এবং বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একদিন সে 'বালেগ' হয়ে যাবে। আর সেই শিশু বুঝতেও পারবে না যে, আমি বালেগ হয়ে গেছি। কেননা সাধারণত: শিশুদের 'বালেগ' হওয়ার পরিভাষা ও সংজ্ঞা জানা থাকে না। এজন্য সে একথা বলে না যে, আমি আজকে বালেগ হয়ে গেছি। কেননা সাধারণত: কারো জানা থাকে না যে আমি অমুক তারিখে

বালেগ হয়েছিলাম। কেননা তার জানাই নেই 'বালেগ' কি আর 'না বালেগ' কি?

তাহলে দেখুন! পরিভাষা জানা না থাকা সত্ত্বেও সে ধীরে ধীরে 'বালেগ' হয়ে গেল।

এমনিভাবে বলা হচ্ছে: নেক আমল করতে থাকুন এবং সেটাতেই লেগে থাকুন। ইনশাআল্লাহ একদিন 'নিস্‌বত' হাসিল হবে। চাই আপনি বুঝতে পারুন বা না পারুন। আর যেদিন আল্লাহ তা'আলা এই 'নিসবত' ও তাঁর সাথে সম্পর্কের দৌলত দান করবেন, সেদিনই বেড়া পার হয়ে যাবে।

সারকথা

অবশ্য হযরত থানভী রহ.-এর বাণী দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেবলমাত্র সার্বক্ষণিক যিকিরের যোগ্যতা হাসিল হলেই নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা উচিৎ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর পাশাপাশি সার্বক্ষনিক আনুগত্য সৃষ্টি না হবে। অনেক মানুষ এ কারণেই ধোঁকায় পড়েছেন। অনবরত গোনাহ করতে থাকলে আল্লাহর সাথে 'নিস্‌বত' কায়েম হয় না। যেমনিভাবে শুধু (অন্তরের) সাময়িক উপস্থিতির কাইফিয়াতের দ্বারাও নিস্‌বত কায়েম হয় না।

সারকথা এটাই যে, আমলে লেগে থাকুন। আর এ চিন্তায় পড়বেন না যে, পরিণাম কী? বা ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে? বরং এই ফিকির করবেন যে, যেই আমল আপনি করছেন সেটা যেন সঠিক হয়, সঠিক পথে হয় এবং সুন্নাত অনুযায়ী হয়। সেটাতে লেগে থাকুন। ইনশাআল্লাহু তা'আলা সবকিছু হাসিল হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত আরো কয়েকটি গ্রন্থ
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর নির্বাচিত
এগারখানা কিতাবের সমষ্টি
ইসলাহী নেসাব
ও জিহাদ